সাধারণ বিকারতত্ত্ব (১)

ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

সাধারণ বিকারতত্ত্ব

(প্রথম খণ্ড)

ডা. জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
বি.এ., এম.বি. (কলি.), এম.এস. (ওয়াশিংটন)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

SADHARAN BIKARTATTWA (Ist Part)
[General Pathology]
Dr. Jyotirmoy Chattopadhyaa

প্রকাশকাল :
নভেম্বর, ১৯৮৭

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যান্‌সন্, নবম তল
৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস
৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

প্রচ্ছদ : প্রদীপ সাহা

মূল্য : পঁচিশ টাকা

Published by Dr. Ladlimohan Roychowdhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Books and Literature in regional languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

ভূমিকা

রোগ হতে হলেই দেহের কোন কোন না অংশে কোন বিকৃতি থাকবে। বিকৃতির সেই তাত্ত্বিক দিকটিকে বলা হয় বিকারতত্ত্ব। এর মধ্যে আবার বহুভাগ ঃ যেমন ক্লিনিক্যাল, অথবা শয্যাপার্শিক, যাতে রোগীর মল, মূত্র, রক্ত ইত্যাদির বিকারজনিত পরিবর্তন পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়া বিশেষ বিকার-তত্ত্ব, (Special Pathology) যেখানে দেহের বিশেষ কলা ও ইন্দ্রিয়ের বিকার অণুবীক্ষণে লক্ষ্য করা হয়। এই হিসাবে এর একটি হিষ্টোলজি (histology) বা টিস্যুতত্ত্ব আর সাইটোলজি (cytology) বা কোষতত্ত্ব নামে, স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে। বিশেষ বিকারতত্ত্বকে বাদ দিলে থাকে সাধারণ বিকারতত্ত্ব (General Pathology)। সাধারণ বিকারতত্ত্বকে বলা যায় বিকারতত্ত্বের থিয়োরির দিক। এর গুরুত্ব অসাধারণ। কারণ বিকারতত্ত্বকে থিয়োরির দার্শনিক পর্যায়ে নিয়ে যাবার ফলেই, শুধু বিকারতত্ত্বের কেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও বর্তমান উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পাস্তুর, মেশনিকফ কি আরলিখ বা কক্ যাঁদেরই নাম করা হ্‌ক, সবাই ছিলেন মানস প্রকৃতিতে দার্শনিক।

ইংরাজিতে ফ্লুরি বা পেলিং রাইটের, সাধারণ বিকারতত্ত্বের ভাল ভাল বই আছে। এ ছাড়াও ওয়ালটার ও ইজরায়েলসের বইখানি বড় ও খুবই সমৃদ্ধ ও তথ্যপূর্ণ। বর্তমান লেখকের প্রধান অবলম্বন ছিল সেই বইখানি। তবে কেবল অবলম্বনই, মোটেই অনুবাদ নয়। তবে আবার এ কথায় মনে না করা হয় যে, এই প্রামাণ্য বইটি রইল একদিকে আর আমার বইটি চলল আর এক দিকে। এই লেখকদ্বয়ের প্রতি আনুগত্য রয়েছে অধ্যায় বিভক্তিতে। তারপর লেখার সময় প্রতিটি বিষয় ওই বই থেকে পড়ে নিয়ে তবেই লেখা হয়েছে। আমার কর্মপন্থার সম্পর্কে এত কথা বলার কারণ হল লেখকের পদ্ধতিরও মাধ্যমে যেন পাঠকও তাঁর পঠনভঙ্গীর উন্নতিসূচক পরিবর্তন করে নিজেই উপকৃত হতে পারেন। ছাত্রদের পাঠপদ্ধতি জানা প্রয়োজন।

বর্তমান লেখকের জীবনের ত্রিশ-চল্লিশ বছর কেটেছে বিকারতত্ত্বের চর্চা অধ্যাপনা ও গবেষণায়। শেষ জীবনে বিকারতত্ত্বের থিয়োরির দিকে

একখানি বই লেখার যে ইচ্ছা ছিল, তাতে সার্থক সুযোগ মিলল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের কল্যাণে। এর জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ দিতে হয় প্রাক্তন পর্ষদ-আধিকারিক অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতাকে। তারপর অনেকের কথাই মনে আসে, যেমন ডঃ সমর রায়চৌধুরী, ডাঃ লাবণ্যকুমার গাঙ্গুলী। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা যাঁর, আমারও শিক্ষককল্প ডাঃ গাঙ্গুলী প্রতিটি শব্দ বিশ্লেষণী, গঠনমূলক দৃষ্টিতে দেখেন। তার ফলে, আমার এই পরিণত বয়সেও অনেক কিছু শিখতে পেরে আমি ধন্য। তাঁর কথা অনুসারে, আমার বিন্যাস-ভঙ্গীকে আরো সহজ করার চেষ্টা করেছি। কেন না, বলাটা যত সহজ হবে, পাঠক বুঝবে তত ভাল করে।

অবশ্য বইটির সর্বত্র এই সারল্য ও প্রাঞ্জলতা হয়ত সমান রাখতে পারি নি। সেটা আমার ত্রুটি। তাই পাঠকদের, এমনকি তাঁরা যদি ছাত্রও হন, তাঁদের কাছ থেকে মতামত প্রার্থনা করি। কারণ, এর ভিত্তিতে দ্বিতীয় খণ্ড খানির সংস্করণ সম্ভব হলে, বর্তমান খণ্ডেরও উন্নতিবিধান করা সম্ভব হবে।

লেখা সুরু করবার সময় পরিভাষা সম্পর্কে আমি ছিলাম দুঃসাহসিক। নতুন নতুন শব্দ নিজেই সৃষ্টি করে লেখায় ঢোকানোর একটা প্রচেষ্টা তখন ছিল। কিন্তু পাণ্ডুলিপি সংশোধনের সেগুলি বেশী দুঃসাহসিক বলে মনে হল। তাই বাদ দিলাম।

84 রসা রোড
ইষ্ট সেকেণ্ড লেন
কলিকাতা 700 033

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

আর্ট প্লেটের সূচী

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

সাধারণ বিকারতত্ত্ব

1 বিকারতত্ত্বে বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহের পরিচয়

রোগে শরীরের বিক্রিয়ামূলক পরিবর্তনের বিজ্ঞানকে বলা হয় বিকার-তত্ত্ব। ইংরাজিতে একে বলা হয় প্যাথলজি (Pathology)। বাংলায় এ বিজ্ঞানকে নিদান তত্ত্বও বলা হয়েছে।

রোগে শরীরের বিবিধ ইন্দ্রিয় ও কলাগুলিতে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে, তা খ্রীষ্টপূর্ব তিরিশ দশকে সেলসাস দেখে লিপিবদ্ধ করেন। সে দেখা অবশ্যই ছিল খালিচোখে যেটুকু দেখা যায় সেটুকু। তারপর জার্মানদের হাতে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহারের প্রভূত উন্নতি হল। তারই পরবর্তী যুগে ভিরকোর নেতৃত্বে (Virchow) 1821—1905, শতকে খালিচোখে দেখা, কলা ও ইন্দ্রিয়গুলির স্থূল পর্যায় থেকে বিকারতত্ত্ব কোষের পর্যায়ে পৌঁছে গেল।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রকেই ব্যবহার করে, ফরাসী দেশে পাস্তুর (Pasteur) বীজাণুতত্ত্বের (Bacteriology) প্রতিষ্ঠা করলেন। এরই ফলে বিবিধ রঞ্জক-পদার্থের সাহায্যে কক (Koch), আরলিখ (Erlich), ডমাক (Domagk) একে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে এলেন, রাসায়নিক আরোগ্যতত্ত্বের যুগে (Age of Chemotherapy) যেখানে আমরা আজ উপনীত হলাম। আবার অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডে জেনার (Jenner) প্রতিষেধ তত্ত্বকে (Immunisation) প্রতিষ্ঠিত করলেন টিকা দেবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে।

বিকারতত্ত্বে বিভিন্ন পদ্ধতি

স্মরণাতীত কাল থেকেই শরীর ব্যবচ্ছেদ করে, বিভিন্ন কলায় ও দেহযন্ত্রে কি ধরনের বিকারগত পরিবর্তন হয়েছে, তা দেখা হত। বর্তমানে সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদে অতি সূক্ষ্ম নালিকা কোষে অণুবীক্ষণের সাহায্যে প্রবেশ করিয়ে, কোষের ভিতরের বিভিন্ন বস্তু সংগ্রহ করেও তার রাসায়নিক পরীক্ষা সম্ভব হয়েছে। লেসার রশ্মি (Light Amplification by Stimulated Emmision of Radiation) প্রয়োগ করে, একটি কোষের সামান্য একটি অংশকেও এখন আঘাত করা যায়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

সাধারণ অণুবীক্ষণে দেখার জন্য আলোক তরঙ্গকে ব্যবহার করা হয়। এর একটু অসুবিধা আছে। দ্রষ্টব্য বস্তুটি যদি খুবই ছোট হয়, মানে এত ছোট যে অলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি, তখন তা সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণের বিশ্লেষণ ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। সে অবস্থাটাকে, ঠিক পড়তে পারা যাচ্ছে না, এমন দূরত্বে রাখা বইয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যেখানে বইটা কোন ভাষায় লেখা বুঝতে পারছি, কিন্তু অক্ষরগুলো ঠিক ঠিক পড়া যাচ্ছে না। এইটা হল অণুবীক্ষণের বিশ্লেষণ ক্ষমতার (Resolution) সীমান্ত।

জীবন্ত কলা মোটামুটি স্বচ্ছ। তাই অণুবীক্ষণে দেখলে এক জায়গা, অন্য জায়গার মতই দেখায়। তাই কোষের ভিতরের প্রত্যঙ্গগুলি আলাদাভাবে দেখতে হলে কোষ ও কলাকে বিশেষভাবে রক্ষা বা আরক্ষণ (Fixation) করে, রঞ্জক পদার্থে রঞ্জিত করে নিতে হয়। কোষের বিভিন্ন অংশের রাসায়নিক সংগঠন ভিন্ন বলে, তা ভিন্ন ভিন্ন রঞ্জক পদার্থে রঙিন হয়। রঞ্জক-পদার্থগুলিও ভিন্ন রংয়ের। তাই রঞ্জিত করে অণুবীক্ষণে দেখলে, কোষের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের দেখায়।

জীবন্ত কোষকে লক্ষ্য করার জন্য অণুবীক্ষণের তিনটি রকমফের ব্যবহার করাহয়। (১) অন্ধকার ক্ষেত্রালোক (Dark Ground Illumination), (২) ফেজ বৈপরীত্য (Phase Contrast) (৩) ইনটারফিয়ারেন্স (Interferencs) এই তিন রকমের অণুবীক্ষণেই কোন রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার না করেই কোষ ও কলার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি আলাদা আলাদা দেখা যায়। তার মধ্যে ফেজ কনট্রাষ্ট অণুবীক্ষণে আলোর আপেক্ষিক প্রতিসরণের সাহায্য নেবার ফলে, একটি কোষের উপাঙ্গগুলির কোনটি বেশী স্বচ্ছ, কোনটি কম স্বচ্ছ দেখানোর জন্য কোষ প্রত্যঙ্গগুলি খুব ভাল দেখা যায়। ইণ্টারফিয়ারেন্স অণুবীক্ষণেও এই রকম দেখা যায় ও তার উপরে স্বচ্ছতার তারতম্যের পরিমাপটাও এতে মাপ করা যায়। সেইজন্য কোষের ভিতর কোন রাসায়নিক বস্তু, পরিমাণগতভাবে কতটা আছে তাও হিসাব করা যায়।

রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগে সংরক্ষিত কলাসমূহ পরীক্ষারও পদ্ধতি আছে। এই পরীক্ষাই আগে থেকে চলে আসছিল।

সংরক্ষিত কলার পরীক্ষা

শরীরের কোন কলার পরীক্ষার জন্য, খুব ছোট একটি অংশ কেটে তা, ভিতর অবধি প্রবেশ করতে পারে এমন একটি বিশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থে ভিজিয়ে রাখা হয়; যেমন, দ্রবীভূত ফর্মালিন। তারপর সুরাসারের (alcohol) বিবিধ পর্যায়ে রেখে তার ভিতরের জল নিষ্কাষণ করা হয়। তারপর গালানো মোমে রেখে, তার ভিতরে মোম প্রবেশ করার পর, তা খুব পাতলা করে কেটে তারপর অন্য পদ্ধতিতে রঙিন করে অণুবীক্ষণে দেখা যায়। একে বলে প্যারাফিন বা মোম নিষিক্ত পদ্ধতি।

এ ছাড়া আর একটি পদ্ধতিতে, কলার অংশটি $-30°$ সেন্টিগ্রেডে ঠাণ্ডা করে শক্ত করে নেয়া সেই শক্ত অবস্থায় পাতলা করে কেটে নিয়ে রঞ্জকের সাহায্যে রং করে দেখা হয়।

এ ছাড়াও বিবিধ রঞ্জকে বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুকে কোষের ভিতরেই রং করা সম্ভব। যেমন সুডান—3% ও অসমিক এ্যাসিডে চর্বিজাতীয় পদার্থকে রঞ্জন করা সম্ভব। এই রঞ্জন মোমের পদ্ধতির পক্ষে উপযুক্ত নয়। এই রঞ্জনের জন্য কলা ঠাণ্ডায় জমিয়ে কাটতে হয়।

কিভাবে বিভিন্ন কলা রং নেয়? অর্থাৎ, আমরা যে তাদের রং করে দেখি, কোন বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটছে বলে। একটি কোষের বিভিন্ন জায়গা ভিন্ন ভিন্ন রংও নিতে পারে এ জন্য।

ধনাত্মক আধান (charge) যুক্ত যে স্থান বা বস্তুগুলি কোন কলায় যে আছে, তার জন্য দায়ী $-NH_3^+$ অংশটুকু। সেই কলা ইয়োসিন, পিকড়িক এ্যাসিড, এ্যাসিড ফুকসিন, ইত্যাদি বস্তুতে রঞ্জিত হয়।

ঋণাত্মক আধান যুক্ত কলার অংশ বিশেষে থাকে $-PO_4^-$ কি $-SO_4^-$ অথবা $-COO^-$ ইত্যাদি র‍্যাডিক্যাল বা অংশ। হিমাটক্সিলিন, প্রমুখ রং এই অংশগুলি নিতে পারে। এই রঞ্জক পদার্থটি উদ্ভিদজাত। এ্যালুমিনিয়াম, ক্রোমিয়াম ও লৌহের কোন কোন যৌগিক লবণে এই রং গভীরতর হয়।

এছাড়াও বহুল ব্যবহৃত কিছু কিছু রঞ্জকের ব্যবহার বিকারতত্ত্বে হয়ে থাকে। এগুলি হচ্ছে পি. এ. বা পার আয়োডিক এ্যাসিড সিফ ষ্টেন: এই রঞ্জনে শর্করাজাতীয় দ্রব্য লাল রঙ নেয়।

ফয়েলগেন নামে একটি রঞ্জক আছে। এতে নিউক্লিয়াসের ভিতরের ডেসক্সিরাইবো-নিউক্লিক এ্যাসিড ম্যাজেন্টা রং নেয়।

কিছু কিছু জৈবিক অনুঘটককেও রং করা যায়ঃ যেমন এ্যালক্যালাইন ফসফাটেজ। এই ধরনের রঞ্জনকে হিষ্টোকেমিকেল রঞ্জন (histochemical stain) বা কলাভ্যন্তরীণ রাসায়নিক রঞ্জন বলে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ

এই অণুবীক্ষণে আলোর বদলে পর্যবেক্ষণের জন্য ইলেকট্রন রশ্মি ব্যবহার করা হয়। আর এর লেন্সও কাঁচের লেন্সের পরিবর্তে হতে হয় চুম্বকের লেন্স। কারণ তা ছাড়া ইলেকট্রন রশ্মির প্রতিসরণ সম্ভব হয় না। এর ফলে বিশ্লেষণ ক্ষমতা এতটা বেড়ে যায় যে এর সাহায্যে, কোন প্রোটিনের অণু তো বটেই, এমনকি গ্লুকোজের অণুর কাছাকাছি দৃষ্টি চলে যায়।

দেখানোর জন্য ইলেকট্রন রশ্মির গতিপথ শুন্য (Vacuum) স্থানের মধ্যে হওয়া চাই। পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত কলাকে এত পাতলা করে কাটতে হয়, যে তার জন্য ষ্টিল বা ইস্পাতের ছুরিকার বদলে কাঁচ বা হীরকের প্রয়োজন। কলার স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের কাজে অসমিক এ্যাসিড ব্যবহার করতে হয়। তা ছাড়া কাটার জন্য এ ক্ষেত্রে মোমও অনুপযুক্ত। তার বদলে ব্যবহার করা হয় মেথক্রিলেট, যা এক ধরনের প্লাষ্টিক। অন্য প্লাষ্টিক, যেমন এ্যারেলডাইড, ইপন, ইত্যাদিও ব্যবহার হয়। তুলনামূলক স্বচ্ছতার তারতম্যের জন্য, যে সব জিনিস ইলেকট্রন অস্বচ্ছ, যেমন ফসফোটাংষ্টিক এ্যাসিড, ব্যবহার করা হয় ক্ষেত্রে বৈপরীত্য সৃষ্টির জন্য। একে negative staining বা বিপরীত রঞ্জন বলা হয়।

মহাঘূর্ণক (ultracentrifuge) আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ

অল্পশক্তির ঘূর্ণক যন্ত্র বহুকাল থেকে রসায়ন, জীববিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহার হয়ে আসছে। এর কাজ ছিল অপেক্ষাকৃত ভারী বস্তু, হালকা বস্তু থেকে আলাদা করা। যেমন করা হয় রক্তের কণিকাগুলি রক্তের জলীয় পদার্থ সেরাম বা রক্তরস থেকে আলাদা করতে। এখানে এই অতি দ্রুত ঘোরার ফলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে এত বাড়ানো যায় যে অণু পর্যায়ের বস্তুও ভার অনুসারে নিচে পড়ে যায়। এতে কোষগুলিকে পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলে, তার বিভিন্ন অংশ পর্যায়ক্রমে তলিয়ে নিতে পারা যায় ঐগুলির পরিমাপ আবিষ্কারক সেডবার্গের নামের (suedberg) এককে প্রকাশ করা

হয়। এটি যখন চালু, সেই অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি কোনটি কত আছে, তার পরিমাণগত ছবিও তোলা যায়।

ইলেকট্রোফোরেসিস

মিশ্র প্রোটিনকে বিশেষ pH-এ যদি এক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে দ্রবিত অবস্থায় রাখা হয়, তাহলে এই প্রোটিনগুলি, তাদের অণুর গুরুত্ব ও বিদ্যুৎ শক্তির তারতম্য অনুসারে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ঋণাত্মক বা ধনাত্মক দিকে চলাচল করে। এই চলাচল খুব সহজেই ফিলটার কাগজের উপরে করে, তারপর কাগজটি শুকিয়ে নিয়ে, বিশেষ রঞ্জক পদার্থ দিয়ে রং করে নিলে বিভিন্ন প্রোটিন আলাদা করে দেখানো যায়।

পরিমাণগতভাবেও কোন্ প্রোটিন কতটা আছে, তার পরিমাপ এ পদ্ধতিতে করা সম্ভব।

কাগজের বদলে, জল থেকে সুরু করে আগারের জেলি, সেলুলোজ এ্যাসিটেট ইত্যাদি অনেক বস্তুই এ কাজে ব্যবহার করে সাফল্য লাভ হয়েছে। বিভিন্ন রোগে রক্তরস বা সেরামে বিভিন্ন প্রোটিনের তারতম্য এতে বোঝা যায়।

ক্রোমাটোগ্রাফি

অতি সহজ এই প্রক্রিয়াটি থেকে বহু তথ্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন মিশ্র বা যৌগিক পদার্থে, অংশগুলিকে আলাদা করার একটি পদ্ধতি এটি। এতে স্থিতিশীল ও চলমান এই দুই পর্যায় (phase) থাকে। চলমান পর্যায়ে থাকে কোন তরল বা বায়বিয় পদার্থ। আর এর চলাচল করানো হয়, মাধ্যাকর্ষণে, চাপে বা কৈশিক চাপে। এই পদার্থগুলি যত দ্রুত চলাচল করতে পারে, এতে নিষিক্ত অনুগুলি, তাদের বড় ছোট, বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদির তারতম্য অনুসারে, কম বেশী চলাচল করে। এর ফলে একটি প্রোটিনের বিভিন্ন এ্যামাইনো এ্যাসিডের আণবিক অংশগুলি পর্যন্ত আলাদা আলাদা হয়ে যায় ও গেলে, তাদের রঞ্জক পদার্থে রং করে বোঝা যায়।

প্রধানতঃ বিভিন্ন এ্যামাইনো এ্যাসিড ও শর্করা, আছে কি না ও কত পরিমাণে, এই পদ্ধতিতে তা জানা যায়। এদের কোনটি, নির্দিষ্ট সময়ে

কতটা যাবে, তারও একটা মূল্যমান আছে। একে বলে R_f value। এটি হল

$$R_f = \frac{\text{বস্তুটি কতদূর গেছে}}{\text{দ্রাবক কতদূর গেছে}}$$

ফিলটার কাগজখানি শুকনো করে নিয়ে, এ্যামাইনো এ্যাসিডের ক্ষেত্রে, নিনহাইড্রিন ছিটোলে, নীলাভ রং হয়। কোন্ জায়গায় কোন্ দাগটির অবস্থিতি, তাই দেখে সেটি কি বস্তু সঠিক বলা যায়। আর পরিমাণটাও এলাকার আয়তন মেপে বোঝা যায়।

প্রতিপ্রভা (Fluorescent Technique)

কিছু কিছু বস্তু আছে, যা বেগুনি পারের অদৃশ্য আলোকে, দৃশ্য আলোয় পরিণত করতে পারে। ঠিক তেমনিই, এক বর্ণের রঞ্জক বস্তু থেকে বিশেষ বর্ণের আলোক প্রভা প্রতিপ্রভা হিসাবে বার হয়ে আসে।

বিশেষ বিশেষ রঞ্জক পদার্থকে কোষের বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করে। প্রতিপ্রভার সাহায্যে এদের কোষের বিশিষ্ট স্থানে দেখা যায় ও কোষ কোন বিশেষ প্রত্যঙ্গে তা তৈরি হচ্ছে, তাও দেখা যায়।

অনক্রম্যতা বিজ্ঞানে (Immunology), এই পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রভূত সুফল পাওয়া গেছে।

বিকিরক আইসোটোপ

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে রকম বিকিরণধর্মী আইসোটোপ ব্যবহার করে বহু আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে তেমনি বিকারতত্ত্বেও তা হয়েছে। বিপাক ক্রিয়ায় যেমন শরীর একটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থকে গ্রহণ করে, ঠিক অনুরূপভাবে, আইসোটোপটি পেলে তাও গ্রহণ করে। আর সেটি বিকিরণধর্মী বলে, শরীরের কোথায় যাচ্ছে টের পাওয়া যায়। এইভাবে, বিপাককার্যের বৈকল্য ও বিকারের সঠিক সন্ধান পাওয়া যায়।

টিস্যু কালচার

শরীরের কোষ শরীরের বাইরে বাঁচিয়ে রাখা, ও শুধু বাঁচিয়ে রাখাই নয়, তার বংশানুক্রমিক বিভাজন হয়ে ক্রমবর্ধমান অবস্থায় তাকে অনির্দিষ্ট কাল

বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। কোষগুলি কাঁচ কি প্লাষ্টিকের তল অবলম্বন করে বা আঁকড়ে বেঁচে থাকে। সুস্থ কলাই হক, অথবা টিউমারের সামান্য একটু অংশই হক, তা কেটে নিয়ে, ট্রিপসিনের সাহায্যে এর কোষগুলির প্রত্যেকটিকে বিচ্ছিন্ন করে, আলাদা আলাদা করে নেয়া হয়। তারপর এই কোষগুলিকে, উপযুক্ত পুষ্টি অক্সিজেন আছে, এমন এক মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা ও বাড়তে দেয়া হয়। মাধ্যমে রক্তরস বা সিরাম ও প্রয়োজনীয় রাসায়নিক লবণসমূহ থাকে।

বহুবিধ পরীক্ষা এই টিস্যু কালচার কোষে করা যায়। কোষের বংশানুক্রমিক চরিত্রসমূহ যে জিনের মাধ্যমে বাহিত হয়, সেগুলি থাকে কোষ নিউক্লিয়াসের ভিতরের সূত্র-সদৃশ ক্রোমোসোমগুলিতে। কোষের ক্রোমোসোমে কোন ক্রটি আছে কি না, তাও এই উপায়ে দেখা সম্ভব।

তাছাড়া কোষের বংশপরম্পরা বাহক ডি-এন-এর মধ্যে কোন ইতরবিশেষ বা কোন ক্রটি আছে কি না, তাও এই পদ্ধতির সাহায্যে জানা যেতে পারে।

বিকারতত্ত্বে আর একটি কাজে টিস্যু কালচারের প্রচুর ব্যবহার, তা হল ভাইরাসের কাজে। ভাইরাস বিশেষ, কতটা মারাত্মক, তার ছাপও এই কোষের উপরে পড়ে। তা ছাড়া বিশেষ ভাইরাস, তার ডি-এন-এ বা আর-এন-এ টিস্যু কালচার কোষে ঢুকিয়ে সঙ্কর জাতের নিউক্লিক এ্যাসিড তৈরি করে কোষকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। এই পদ্ধতিতে তাও দেখা যায়।

2

কোষ

বাড়ি যখন ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়, চটা ওঠে, ফাটল ধরে, তখন বাড়ির ইট কাঠগুলির কোনটা কতটা ভেঙ্গেছে, তা দেখে নিয়ে মেরামত বা বদল করতে হয়। বাড়ির ক্ষেত্রে যেমন এক একখানা ইট হল তার সৃজন-বস্তুর একক, শরীরের ক্ষেত্রে সেইরকম একক হল কোষ। তার মানে সহজ কথায়, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কোষ দিয়েই, উদ্ভিদ হক, প্রাণী হক, মানুষ হক, সবাইয়ের শরীর গড়া।

শরীরের কোন রোগ বা বিকার দেখা দিলে, তার অনুসন্ধান এই কোষেই তা হলে করা দরকার। কিন্তু এ কথাটাও সবার প্রথম বললেন ভিরকো, (Virchow) তাঁর বই Cellular Pathology-র মাধ্যমে। বলা যায়, সেই থেকে বিকারতত্ত্বের একটা নতুন যুগের স্থচনা হল, আজ থেকে একশো বছরেরও আগে।

কোষ একক হলেও, তারা একসঙ্গে দল বেঁধে এক একটি বিশেষ ধরনের কলা বা টিস্থ (Tissue) তৈরি করেছে। এদের প্রধানতঃ দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে (১) আচ্ছাদক (Epithelial) ও (২) যোগাযোগকারী (Conncetive)।

আচ্ছাদক যে কোষ, তারা যেখানে আছে সেই অনুযায়ী কাজ করে। যেমন চামড়ায় দিচ্ছে আচ্ছাদন, মুখ, খাদ্যনালি ইত্যাদি জায়গায় শুকিয়ে না ওঠার জন্য, মিউসিন জাতীয় তরল বস্তু নিষিক্ত করে। আবার যেখানে গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডের (gland) আকার নিয়েছে, সেখানে বিশিষ্ট ধরনের হর্মোন নিঃসরণের কাজ করে।

যোগাযোগকারী কোষ, নানা প্রকার। তা-পেশী হয়েছে। কোন গাঁট বা জোড়ের (joint) জায়গায় তা অস্থি-বন্ধনী (tendon)। রক্তে পরিবহনের কাজের জন্য তা শ্বেত ও লোহিত রক্ত কণিকা। আবার যোগাযোগ কাজের বিশেষত্ব আরো বেশী যেখানে, সেখানে স্নায়ু।

দেখা যাচ্ছে, বিশেষ কলার, এক একটি ভূমিকা রয়েছে যা বিশেষজ্ঞের (Specialist) মত। যার যে কাজটি, সে শুধু সেই কাজটিই, বিবর্তনের

অগ্রগতির ফলে করবে। বিকারের কারণে, অন্য কাজ ও চেহারা নিলে তাকে রূপান্তরিত বা metaptaplastic বলে। রূপান্তরণ ও প্রাথমিক রূপ গ্রহণ, বিকারতত্ত্বে ক্যানসার সমস্যাকে বুঝতে সাহায্য করে।

কোষের গঠন

কাজকর্মে ও গঠনে এক ধরনের কোষ অন্য ধরনের কোষ থেকে ভিন্নতর হতে পারে। তবু গড়নের দিক থেকে সব কোষেরই মিল আছে। এটা জানলেই মোটামুটি সব কোষেরই মূল গঠনতত্ত্ব জানা হয়।

প্রত্যেকটি কোষের চাই খাদ্য, শ্বাসের অক্সিজেন। আবার তাকে প্রশ্বাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও শরীরের প্রয়োজনে লাগবে না, এমন যদি কিছু বিপাক ক্রিয়ায় তৈরি হয়ে থাকে, তার অপসারনের কাজ ও কোষ বিধৌত করা হচ্ছে রক্ত চলাচলের মাধ্যমে।

প্রতিটি কোষের একটি দেয়াল থাকে, যাতে একটি কোষ আর একটি কোষ থেকে আলাদা থাকতে পারে। তবু আবার তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ, আদানপ্রদানও খুব বেশী। কোষের ভিতরের যে তরল পদার্থ, তাকে বলে সাইটোপ্লাজম। কোষের অভ্যন্তরে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে নিউক্লিয়াস। কোষ বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য কোষে নিউক্লিয়াস না থাকলেই চলে না। কোন কোন বিশেষ অবস্থায় একটি কোন কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকতে পারে, এদের বলে জায়ান্ট (Giant) বা রাক্ষস কোষ। (১) পেশীতে (২) টিউমারে (৩) টিউবার-কুলোসিস বা যক্ষা রোগে এই ধরনের কোষ দেখা যায়। নিউক্লিয়াস না থাকলে কোষের আয়ু বেশীদিন নয়। অবশ্য সাইটোপ্লাজমের রাইবোনিউক্লিক এ্যাসিড, তা কিছুটা কাজ চালিয়ে নিতে পারে। শরীরে নিউক্লিয়াস শুন্য কোষ হল লোহিতকণিকা ও রক্তের প্লেটলেট (Platelet) বা অনুচক্রিকা।

কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যেটায় বহু রকমের কোষের প্রত্যঙ্গ থাকে। এর কতকগুলি সাধারণ অণুবীক্ষণে দেখা যায়, আর কতকগুলি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ ভিন্ন দেখা যায় না। ছবি দেয়া হচ্ছে তাই শুধু নামগুলি উল্লেখ করা হল, যেমনঃ সিলিয়া, লাইসোজোম, মাইটোকণ্ড্রিয়া ইত্যাদি।

কোষের যে দেয়াল বা আবরণ আছে, তাও স্থির নয়। গতিশীলভাবে কণিকাতুল্য, নিকটস্থ কোন তরল পদার্থের চারিধারে, দু হাত বাড়ানোর

মতন করে কোষ তার দেয়াল বা পর্দাটি বাড়িয়ে সেই কণিকাকে গিলে বা গ্রাস করে নিতে পারে (pinocytosis)
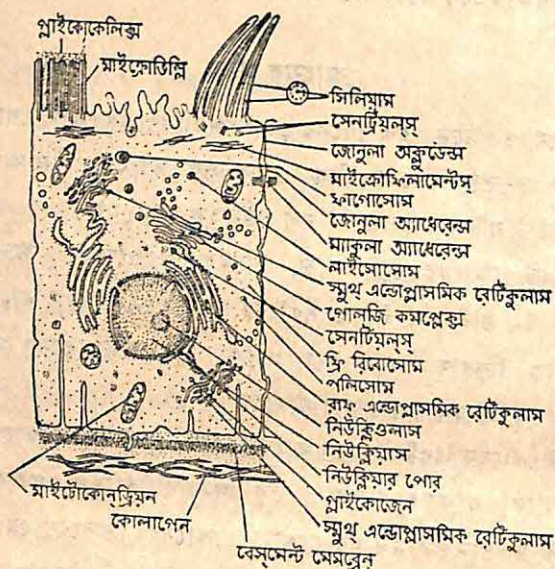
চিত্র 1

কোষেরা তাদের দেয়ালে বিশেষ এ্যান্টিজেন বা বস্তুর সাহায্যে আত্ম-পর চেনে ও বস্তুটি নিজের না হলে তাকে আক্রমণ করে।

সোডিয়াম, পটাসিয়াম, জল ইত্যাদি ছোট আকারের অণু যে সব বস্তুর, ও বিশেষ বিদ্যুৎ বাহনের সাহায্যে পুষ্ট বেশ কিছু সংখ্যক অণু কোষের দেয়াল পারাপার করতে পারে। এদের চলাচল, এনজাইম বা জৈব অনু-ঘটকের উপর নির্ভর করে। বলা যায়, তারাই ঠিক করে কোন জিনিস বাইরে যাবে ও কোন জিনিস ভিতরে থাকবে।

কোষের মধ্যে নির্বাচন করা বিভিন্ন পদার্থের অনু ভিতরে প্রবেশ করবে না বাইরে থাকবে, এটা নির্ভর করে কোষের দেয়ালের সূক্ষ্ম গঠনের উপরে। আজ ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এ বিষয়ে আমাদের কিছু জ্ঞান হয়েছে।

আগে যেমন ধরে নেওয়া হয়েছিল যে কোষের দেয়ালে অতি সূক্ষ্ম পর্যায়ের স্থিতিশীল ফাঁক আছে। কিন্তু পরে বোঝা গেল এগুলির পরিবর্তন

হয় ও এগুলি গতিশীল। এ থেকেই বোঝা যায় যে গঠনেরও আমাদের আগেকার যে ধারণা ছিল, ড্যানিয়েলি ও ডেভিডসনের, যে দু সার তৈল-জাতীয় (lipid) মুখোমুখি থাকে। জলে আসক্তি আছে এমন অণু (hydrophilic), আর জলে আতঙ্কের (hydrophobic আছে এমন অণু মুখোমুখি থাকে। সেই দিক দুটির মধ্যে থাকে এক সার করে প্রোটিনের অণু। কাজেই একেবারে বাইরে থেকে ভিতরে আসতে কোষপ্রাচীর বা

চিত্র 2
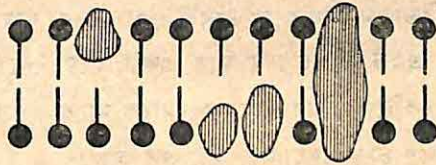
পর্দায় থাকে প্রোটিন-তৈল-তৈল-প্রোটিন। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় এ ধারণারও পরিবর্তন ঘটালেন লেনার্ড ও সিঙ্গার। তাঁরা দেখালেন যে তৈলাক্ত বস্তুর জলাসক্তি থাকা অণুর কিছু অংশ বাইরে থাকে। ঠিক তেমনি আবার আলফা ঘূর্ণনে ঘূর্ণিত প্রোটিন (বাম-আবর্তিত), তৈলবস্তুর মাঝখানে নলের মত হয়ে কোন কোন জায়গায় ঢুকে থাকে। এতে জলে দ্রবিত হয় এমন পদার্থ কোষের ভিতরে ঢুকতে পারে।

কোষের দেয়ালগুলি সর্বদা কাজে ব্যস্ত। এটা সহজে বোঝা যায় এ-টি-পিয়েজ (**A. T. Pase**) নামে এ-টি-পির (**Adenosine-tri-phosphate**) মত শক্তি উৎপাদক বস্তু ভাঙ্গার অনুঘটকের উপস্থিতিতে। শক্তির লেনদেন হয় কাজের জন্য। এ কাজ এখানে সর্বদাই হচ্ছে। কাজের শক্তি আসছে এ-টি-পি ভেঙ্গে। শ্বেত কণিকার এ্যামিবা সুলভ গতিপ্রকৃতি থেকে কর্ম-ব্যস্ততার এই ধারণা পরিষ্কার হয়।

ভাইরাসের আক্রমণই হক, আর বিশেষ ওষুধই হক, তা গ্রহণ করবার জন্য কোষের দেয়ালে বিশেষ বিশেষ জায়গা বা গ্রহণী (receptor) আছে। বর্ণিত কর্মপদ্ধতিতে এটাও বুঝতে সুবিধা হয়।

তা ছাড়াও খাদ্যনলী থেকে যে বিভিন্ন অণু, যেমন এ্যামাইনো এ্যাসিড গ্রহণ করা হয়, তাও অনুরূপ পদ্ধতিতেই সম্ভব করেছে।

কোষের পর্দা থেকে কতকগুলি প্রত্যঙ্গ বার হয়ে আসে যেমন শ্বাসনলীর রোম (cilia)। এই রোম বিভিন্ন কোষে ভিন্ন চেহারা নেয়। যেমন শুক্রকীটে এই রোম লম্বা ও চঞ্চল প্রকৃতির। যার ফলে শুক্রকীট এত সচল।

নিউক্লিয়াস—কোষের যে নিউক্লিয়াস আছে, তাকে ঘিরেও একটি পর্দা বা দেয়াল আছে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দেখা যায় যে এর আবার দুটি স্তর আছে। বাইরের সঙ্গেই থাকে রাইবোসোম, (ribosome) এণ্ডোপ্লাসমিক রেটিকুলাম (endoplasmic reticulum) ইত্যাদি কোষের ভিতরের প্রত্যঙ্গ-গুলি। কোষ বিভাজন শেষ হলে তবেই এগুলি দেখা যায়। নিউক্লিয়াসের পর্দার দুটি অংশ, একটি অংশই যেন আর একটি হয়ে গেছে। একটিই যেন ভাঁজ হয়ে আর একটিতে পরিণত হয়েছে, মাঝে মাঝে গর্তের মত ফাঁক, যা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখা যায় না, এত সূক্ষ্ম।

ক্রোমাটিন ঃ ক্রোমাটিন বলতে বোঝায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে এ্যাসিড জাতের যে রাসায়নিক বস্তু আছে তাকেই। এ বস্তুগুলি এলকেলি বা ক্ষার জাতীয় রঞ্জক পদার্থে, যেমন মেথিলিন ব্লু কি হিমাটক্সিলিন, এই সব রঞ্জক পদার্থের রং নেয়। যখন কোষ বিভাজনের সময়ে, ক্রোমাটিন বস্তুর সবটাই আলাদা আলাদা সুতোর মত ক্রোমোসোমে পরিণত হয়, তখন দেখা যায় যে এই ক্রোমোসোমগুলি খুব গভীর রং নেয় ও নিউক্লিয়াসের অন্য জায়গা খুব অল্প রং নেয়। বিভিন্ন কোষের, অথবা একই কোষের ভিন্ন বিপাক-ক্রিয়ার অবস্থায়, সমানভাবে রঞ্জক পদার্থ গ্রহণ করে না। এতে নিউক্লিয়াসের কোন কোন জায়গা বেশী রং নেয়। সেই জায়গাকে হেটারোক্রোমাটিন বা অতিরঞ্জিত স্থান বলে। আর কম রং নেয়া জায়গাকে বলে ইউক্রোমাটিন বা অল্পরঞ্জিত স্থান।

এ ছাড়াও দেখা যায়, কোন কোন নিউক্লিয়াস এমনভাবে রং নেয়, যে কোষে কোন জায়গা যেন ফোস্কার মত দেখায়। একে বলে ভেসিকুলার বা ফোস্কা ধরা নিউক্লিয়াস।

সেক্স ক্রোমাটিন বা লৈঙ্গিক ক্রোমাটিন ঃ বার (Barr) প্রথমে স্ত্রী জাতের বিড়ালের স্নায়ুকোষে নিউক্লিয়াসের দেয়াল বা পর্দার গায়ে একটি বিশেষ স্থানে ক্রোমাটিনের বেশ বড় রকমের বিন্দু দেখেন। পরে মানুষে স্ত্রী জাতীর বিভিন্ন কোষে এটি দেখা যায়। একেই বলা হয়েছে সেক্স ক্রোমাটিন বা বার বডি। রক্তের শ্বেত কণিকাতেও এ বস্তুটি হাতুড়ির আকারে দেখা

যায়। স্ত্রী জাতীর কোষের নিউক্লিয়াসে XX দুটি স্ত্রী ক্রোমোসোম ও পুরুষ জাতীর XY, একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী ক্রোমোসোম থাকে। স্ত্রী কোষে ডবল ডোজে X থাকায়, যখন কোষ বিভাজন না হয়ে, কোষ বিশ্রামের অবস্থায় থাকে, তখনও তাই এ চিহ্নটি বিদ্যমান থাকে। বিকারতত্ত্বে এর আজ বহুল প্রয়োগ হচ্ছে।

ডেসক্সিরাইবোনিউক্লিক এ্যাসিড, ডি-এন-এ ঃ রঞ্জন ধর্ম দেখে দীর্ঘদিন থেকেই জানা হয়ে গিয়েছিল ক্রোমাটিনের এ্যাসিড চরিত্র। হিস্টোন জাতের প্রোটিনের (যা থাকে স্তন্যপায়ীদের) সঙ্গে থাকে ডেসক্সিরাইবোনিউক্লিক এ্যাসিড। কোষের ভিতরে নিউক্লিয়াসে এই বস্তুটিই হল জিন, যা বংশানুক্রমরে একক।

ডি-এন-এর আণবিক গুরুত্ব হল $6-10 \times 10^6$। অর্থাৎ এটি বেশ বড় ধরনেরই অণু। শিকলের মত পাকানো গড়ন এরা তাতে থাকে ক্ষার (base) —শর্করা—ফসফেট। ক্ষার জাতীয় বস্তুটিতে হয় এ্যাডিনিন-গুয়ানিন, আর তা না হলে থাইমিন-সাইটোসিন, জুটি বেঁধে থাকে। ওয়াটসন ও ক্রিক, ডি-এন-এর সাহায্যে কিভাবে এক দুই হয়ে বংশানুক্রমন করে তা দেখান। আগেই বলা হয়েছে যে এ্যাডিনিন জুটি বাঁধে থাইমিনের সঙ্গে, আর গুয়ানিন সাইটোসিনের সঙ্গে। যদি অক্ষরে লেখা হয়, তা হলে A-T ; G-C বলা যায়। প্রত্যেকটি জিনের নিজস্ব অক্ষর আবার হল, উপর থেকে নিচে তিনটির এককে তৈরি। যে ডবল শৃঙ্খলটি থাকে, সেটি যেন লম্বালম্বি চিরে দুভাগ হয়ে যায়। এই ভাগগুলিই আবার যেন সন্দেশের ছাঁচের মত ঠিক অনুরূপ আর একটি শৃঙ্খল তৈরি করে। সন্দেশের ছানাটার মত বস্তুটা তৈরি করে দেয় বিশেষ ধরনের রাইবোনিউক্লিক এ্যাসিড, যাকে বলে সংবাদবাহী আর-এন-এ (messanger R. N. A)। চিরে যাওয়া দুটি শৃঙ্খল থেকে আরো দুটি শৃঙ্খল এইভাবে তৈরি হলে, ডি-এন-এর একটির জায়গায় দুটি পরিপূর্ণ শৃঙ্খল এইভাবে তৈরি হল।

ডি-এন-এর তিনটি ক্ষার (base) নিয়ে যে এক একটি জিনের একক, এরাই বিশেষ বিশেষ এ্যামাইনো-এ্যাসিড তৈরি করে। প্রাণীতে প্রাণীতে জিনগত যে ভিন্নতা তা তাদের বিশিষ্ট প্রোটিন নির্ভর। জিনের এককগুলিকে বলে কোডন। কোড বা সঙ্কেত বোঝাতেই এ নামটি দেয়া হয়েছে।

শরীরে যত রকম প্রোটিন তৈরি করতে হবে তার নির্দেশ আসে, কোষের

নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসোমে যে জিন আছে তাদের কাছ থেকে। কিন্তু তাই বলে, ক্রমাগতই তো আর তৈরি করেই যেতে পারে না। একটা আটক থাকেই বা থামায়। আর তা ছাড়া বিশেষ কোষ বিশেষ বস্তু তৈরি করে। যেমন রক্তকণিকার কোষ তৈরি করে হিমোগ্লোবিন।

বর্তমানে, জিনের কাজ কি ভাবে হয়. তা নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলেছে। যেমন মনো ও কোন (Monod and Kohn) দেখিয়েছেন যে বীজান্থর মধ্যে কতকগুলি জিন, তারা এমনভাবে থাকে, যে তারা একসঙ্গে ছাড়া কাজ করতে পারে না। কাজেই এই জিনের কোন একটিকে থামিয়ে রাখার কিছু থাকলে, বিভিন্ন জিনের মাধ্যমে তার আর-এন-এ তৈরি বন্ধ হয়ে, কোষ বিভাজন বন্ধ হয়ে যাবে। এর নাম ওপেরন।

কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ, যেগুলি পেনিসিলিন, ইত্যাদির মত এ্যান্টিবায়োটিক পর্যায়ে পড়ে, তারা নিউক্লিক এ্যাসিডের কাজে হস্তক্ষেপ করে। যেমন ক্যানসার নিরোধক মাইটোমাইসিন সি, ডি-এন-এ তৈরির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। আবার একটিনোমাইসিন ডির কাজটা হল আর-এন-এর কাজে।

বলা হয়েছে যে ডি-এন-এর প্রতি খি দু ভাগ হয়ে গিয়ে তার পরই আবার নিজের মত একটি তৈরি করে। এইজন্য দেখা যায় সাধারণ কোষে যে পরিমাণ ডি-এন-এ থাকে জার্ম কোষে, এর পরিমাণ অর্ধেক। কেন না পরে স্ত্রী কোষ ও পুরুষ কোষের মিলন হয়ে, ডি-এন-এর পরিমাণ সমান হবে বলেই, স্ত্রী ও পুরুষ কোষে তা অর্ধেক থাকে। আবার টিউমার কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস আছে, এমন কোষে, (একে পলিপ্লয়েড বলে) ডি-এন-এ ডবল বা তার বেশী থাকে।

পরিমাণগতভাবে কতটা ডি-এন-এ আছে তা ফয়েলগেন, মিথাইল গ্রিন, ইত্যাদি রঞ্জকের সাহায্যে, ও কতটা বেগুনিপার আলো, পরিমাণগত-ভাবে শোষণ করে নিলে, তা দেখা যায়। এই নিয়মটি আবিষ্কার করে ক্যাসপারসন (Cassperson) কোষ তত্ত্বে এক বিপ্লবের সূচনা করেন।

নিউক্লিওলাস ঃ অণুবীক্ষণে দেখলে নিউক্লিয়াসের ভিতরে এক বা একাধিক গোল গোল প্রত্যঙ্গ দেখা যায়। একে বলে নিউক্লিওলাস। এই জায়গা ইলেকট্রন অনচ্ছ। এখানে আর-এন-এ তৈরি যয়। এই আর-এন-এ

কি করে নিউক্লিয়াস ছেড়ে সাইটোপ্লাজম আসে, যদি তা আসে ; তা জানা যায় না। তবে একটি কোষ যখন কর্মব্যস্ত, তখন তাতে একাধিক নিউ-ক্লিওলাস দেখা যায়।

সাইটোপ্লাজম : নিউক্লিয়াসকে ঘিরে কোষের যে জলে-ভরা তরল বস্তুটি থাকে, সেই তরল বস্তুটিকে বলে সাইটোপ্লাজম। এর অভ্যন্তরে যে প্রোটিন থাকে, তা 10%-এর কম। কোষের বাইরে সোডিয়াম ও বাইকারবনেট অণুরই প্রাধান্য, ভিতরে পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফেটেরই আধিক্য দেখা যায়। সাইটোপ্লাজমের অসমোটিক চাপ, কোষের বাইরের তুলনায় সমান। প্রোটিন ছাড়া, অন্য রাসায়নিক বস্তু সাইটো-প্লাজমের বাইরে ও ভিতরে যাতায়াত করে। কোষের ভিতরে সোডিয়াম ঢোকাকে কোষের ভিতরের তথাকথিত কোষের অভ্যন্তরস্থ সোডিয়াম পাম্প বন্ধ রাখে। এর ফলে, কোষের ভিতরের সোডিয়ামের প্রাধান্য কম থাকে। সোডিয়াম জলও টেনে বার করে নেয়। তার ফলে কোষের ভিতরে জলের আধিক্য ঘটে না। সোডিয়াম পাম্পের শক্তি সরবরাহ করে এ-টি-পি (ATP)।

সাইটোপ্লাজমের মধ্যেও ডি-এন-এ থাকে। এর মধ্যে কিছু থাকে মাইটোকণ্ড্রিয়ার সঙ্গে ট্রান্সফার আর-এন-এর সঙ্গে প্রোটিন তৈরির কাজে। তা ছাড়া কোষ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে, নতুন প্রোটিন তৈরির জিন হিসাবে ডি-এন-এ কাজ করে। তখন এদের প্লাসমিডস বা এপিসোম বলে অভিহিত করা হয়।

কোষের ভিতরের প্রত্যঙ্গ

মাইটোকণ্ড্রিয়া : প্রতিটি কোষে সাইটোপ্লাজমে কাঠির মত কতক-গুলি বস্তু দেখা যায়, এগুলিকে মাইটোকণ্ড্রিয়া বলা হয়। 1889 সালে বেন্দা প্রথম এর বর্ণনা দেন। তখন মনে করা হত যে রঞ্জক পদার্থ ব্যবহারের জন্য এগুলি দেখা যায়। কিন্তু ফেজ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরে দেখা গেল যে জীবন্ত কোষেও এরা থাকে। যে কোষে বিপাকক্রিয়া চলছে খুব জোর, সেখানে এদের দেখা যায় অজস্র। এরও আবার দুটি পর্দা থাকে, যা ইলেকট্রন অণু-বীক্ষণে দেখা যায়।

রাসায়নিক দিক থেকে মাইটোকণ্ড্রিয়ার গুরুত্ব অসাধারণ। এর মধ্যে

বহু অনুঘটক রয়েছে। ক্রেব চক্রের (Creb cycle) যে অনুঘটকগুলি প্রোটিন, শর্করা ও চর্বির বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করে, সেগুলি থাকে এখানেই। এই শক্তি এ-টি-পি (ATP) অণুর বন্ধনীতে থাকে। ইলেকট্রন চলাচলের মধ্যে দিয়েই তার প্রকাশ। বলা বাহুল্য, বর্তমান পারমাণবিক পর্যায়ের রসায়নে, রাসায়নিক বিক্রিয়া কিভাবে সংঘটিত হয়, তা আমরা ইলেকট্রন প্রোটিনগুলি কি করল না করল, এই পর্যায়ে বুঝতে শিখছি।

মাইটোকণ্ড্রিয়ার গঠনের জটিলতা ও নিয়ত পরিবর্তনশীলতা থেকেই বোঝা যায়, তারা কত কাজ করে। শক্তি সঞ্চারণ অবশ্য এর মধ্যে একটি প্রধান কাজ।

লাইসোজোমঃ এগুলি গোল। পর্দা বা আস্তরণ ঢাকা। ভিতরে দ্রবীকরণে সক্ষম অনুঘটক থাকে। এ অনুঘটকগুলি নিম্নতর pH বা অম্ল পরিবেশে কাজ করে। এগুলির নাম ফসফাটেজ৷ এষ্টারেজ ইত্যাদি। রক্তের শ্বেতকণিকার ভিতরে অণুবীক্ষণে দেখলে যে দানাদার বস্তুগুলি দেখা যায়, সেগুলি প্রধানত লাইসোজোম। কিন্তু বেশীরভাগ কোষে সাধারণ আলোর অণুবীক্ষণে এদের দেখা যায় না। এর কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে কোষ যেখানে খাদ্য আহরণ করে সেই খাদ্য ভেকুয়োলে মিশে লাইসোজোম অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। আবার কোষের অভ্যন্তরস্থ মাইটোকণ্ড্রিয়া ইত্যাদি যখন ভেঙ্গে অকেজো হয়ে যায়, সেগুলিকে হজম করে ফেলার কাজও এই লাইসোজোমের। দেখা গেছে, হাইড্রোকর্টিজোন বলে যে হরমোন, তা লাইসোজোমের চারিদিকে যে চাদর তাকে রক্ষা করে। এ হরমোন, এই ভাবেই বেগুনি পার আলো যখন কোষকে যখম করে, তা থাকে কোষদের বাঁচায়। আবার ভাইটামিন এ, লাইসোজোমের চাদরে ঢাকা অনুঘটকদের বার করে দেয়। এই জন্য দেখা যায়, খরগোসকে এই ভাইটামিন দিলে, তাদের কানের তরুণাস্থি নরম হয়ে, কুকুরের কানের মত ঝুলে যায়।

লাইসোজোমের হজমকার্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হল ভ্রূণের পরিণতির ক্ষেত্রেও বেঙ্গাচির লেজ খসানো। দেহে অপ্রয়োজনীয় যা, তা লাইসোজোমের অনুঘটকই হজম করে ফেলে।

লাইসোজোমের অনুঘটকের কাজ ঠিকমত না হলে গ্লাইকোজেন জমে থাকা রোগ (Glycogen Storage Disease) দেখা দেয়।

কোষাভ্যন্তরস্থ বক্রীদণ্ড (Endoplasmic raticulum)ঃ এগুলি

দেখতে বাঁকা ও পাকানো পাকানো কাঠির মত (তাই এই পরিভাষা দিলাম) সব কোষেই এগুলি থাকে। এগুলি কোষের অভ্যন্তরে পর্দার মত। এদের একটির সঙ্গে অন্যের যোগাযোগ আছে। কোন কোন গ্রন্থীর কোষে যেমন অগ্ন্যাশয়ের কোষ থেকে যখন রসশ্রাবণ হয়, তখন এদের সংখ্যাধিক্য হয়ে থাকে। এর সঙ্গে থাকে রাইবোনিউক্লিক এ্যাসিডের কণা। যে সব কোষ প্রোটিন সঞ্চালনের কাজে লিপ্ত, সেগুলিতে মোটা ধরনের দণ্ড দেখা যায়। এই কণা বা দানাগুলিকে রাইবোসোম বলে। রাইবোসোম থাকার জন্যই এ দণ্ডগুলিকে মোটা দেখায়। সব সময়ে এই রাইবোসোম দণ্ডগুলির কাছে না থেকে কোষের অভ্যন্তরে ভাসমান অবস্থায়ও থাকতে পারে।

প্যারাফিন বা মোমের মাধ্যমে কর্তিত কলায় এগুলিকে লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য আর-এন-এ (রাইবোনিউক্লিক এ্যাসিড) ক্ষারযুক্ত যে রঞ্জক পদার্থ (basic stains) তার রং নেয় বলে মোমে ফেলা কাটা কলাতেও তাদের চেনা যায়।

মোটা মত দণ্ড ছাড়াও মোলায়েম এক ধরনের দণ্ডও কোন কোন কোষে থাকে। বারবিটিউরেট জাতের ওষুধ প্রয়োগ করলে কোষে এই মোলায়েম দণ্ড বেশী দেখা যায়।

গলজি বস্তুনিচয়ঃ এগুলি চেপ্টা, ঝুলির মতন, অর্থাৎ একটা দিক খোলা। কোষের মাঝামাঝি জায়গায় থাকে। যে কোষগুলি কোন গ্রন্থীর কোষ, সেই কোষে গলজি বস্তুনিচয় বেশী পুষ্ট হয়। সেইসব কোষে এগুলি নিউক্লিয়াসের কাছে দেখা যায়। গ্রন্থীর মধ্যে তৈরি হওয়া তরল শ্রাব এখানে জমা হয়। এখান থেকেই তা কোষের বাইরে চালান হয়।

ক্ষুদ্রনালিকা (microtubules) ঃ এগুলিকে সাধারণ অনুবীক্ষণে দেখা যায় না। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দেখা যায়। বিভিন্ন কোষে এগুলির কাজকর্ম ভিন্ন। এগুলির মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত ইলেকট্রন স্বচ্ছ। এইজন্যই এদের নলের মত দেখায়। কিছু কিছু কোষ, যেমন ডায়াটম ইত্যাদিতে দেখা যায় যে এই নালিকাগুলিই বাইরের চেহারাটাকে রূপ দেয়। রক্তের প্লেটলেটে বা অনুচক্রিকাতেও তাই। কোষের অভ্যন্তরে বস্তুর আদানপ্রদানও এই নালিকাগুলির মাধ্যমেই হয়।

কেন্দ্রক (centriole) ঃ এগুলি অতি ক্ষুদ্র 150 ন্যানোমাইক্রন পর্যায়ের গোলাকার বস্তু। এগুলি ইলেকট্রন অনচ্ছ, এইজন্য ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে

কালচে রংয়ের দেখায়। যখন মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন হয়, তখন এগুলিও বিভক্ত হয়ে যায়। এগুলি থেকেই ঘূর্ণক সূত্র (spindle) কোষ বিভাজনের সময়ে উদ্ভূত হয়।

কোষের বার্ধক্য ঃ অবশ্য কলা অনুশীলন বা টিস্যু কালচার পদ্ধতির সাহায্যে একদল কোষকে হয়ত বহুকাল বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু দেখা গেছে যেসব কোষের বংশ অনির্দিষ্ট কাল ধরে বেঁচে আছে, বা থাকতে পারে, সেগুলি ক্যানসারের কোষ। যেমন হি-লা (He la) কোষকে বিশ্বের বিভিন্ন পরীক্ষাগারে জীবন্ত অবস্থায় রাখা সম্ভব হয়েছে অনুশীলনের সাহায্যে। এ থেকে দেখা যায় স্বাভাবিক কোষ পরিশীলিত অবস্থায় বার্ধক্যগ্রস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু ক্যানসার কোষ তা হয় না। অর্থাৎ ক্যানসার কোষের যে প্রতিনিয়ত কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধি হচ্ছে, তা হয়ত এই কারণে হচ্ছে যে ক্যানসার কোষের তারুণ্য অসীম। এ জন্যই তার বৃদ্ধি ও বিভাজন ক্ষমতা।

কোষ বিভাজন বা মাইটোসিস ঃ কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে জটিলতা আছে। প্রধানতঃ বলা যায় কোষের নিউক্লিয়াসের ভিতরের বস্তু দুটি সমান ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

দেখা যায় কোষের ভিতরের বস্তু লম্বা লম্বা সূত্রের আকার গ্রহণ করে। এগুলিকে বলে ক্রোমোসোম। মানুষের দেহের কোষে (অবশ্য জননেন্দ্রিয়ের কোষ ছাড়া) 46টি ক্রোমোসোম থাকে। এর মধ্যে 22 জোড়াকে দেহের বা সোম্যাটিক (somatic) ক্রোমোসোম বলে। আর একজোড়া লৈঙ্গিক (sex) ক্রোমোসোম।

যখন কোষ ভাগ হচ্ছে, তখনই ক্রোমোসোমগুলিকে আলাদা আলাদা সূত্রের মত দেখায়। কিন্তু কোষ যখন বিশ্রামের অবস্থায়, অর্থাৎ কোষ বিভাজন যখন হচ্ছে না (resting cell) তখন এ সূত্রগুলি দেখা যায় না। তবে নিউক্লিয়াসের এক একটি জায়গায় এই ক্রোমোসোমের অংশ বিশেষ, যাকে হেটেরোক্রোমেটিন অতিরঞ্জিত ক্রোমেটিন বলা হয়, সেইগুলি থাকে। নিউক্লিয়াসের রঞ্জক পদার্থে এগুলি একটু বেশী পরিমাণে নেয়। প্রত্যেক ক্রোমোসোমে অনেকগুলি ডি-এন-এর অণু থাকে।

ডি-এন-এ বিপাকক্রিয়া শেষ হয়ে যাবার পরবর্তী সময়টুকুকে G_2 গ্যাপ-2 বলা হয়। এর পরই আবার কোষ বিভাজন সুরু হয়। এই সময়ে প্রত্যেকটি একক ক্রোমোসোম লম্বালম্বিভাবে ভাগ হয়ে যায়। এদের এক

একটিকে বলে ক্রোমাটিড। ক্রোমাটিডগুলি দুদিকের এক একটি কেন্দ্রকের সঙ্গে (centremere, centrosome) যুক্ত থাকে।

এক একটি ক্রোমাটিড সূত্র লম্বালম্বিভাবে পাকিয়ে যায়। তাতে সেগুলি আরো মোটা ও ছোট হয়ে যায়। এই প্রথম যে অবস্থা কোষ বিভাজনের একে বলে প্রো-ফেজ (prophase)।

এর পর ক্রোমাটিড (এখন তারা মোটাসোটা হয়ে ক্রোমোসোমই হয়ে গেছে বলা যায়)-গুলি কোষের মাঝামাঝি জায়গায় স্থান নেয়। আর নিউক্লিয়াসের যে ঘেরাটোপ তা আর থাকে না। ভাগ হয়ে যাওয়া ক্রোমোসোমগুলি এখনও কোষের মাঝামাঝি জায়গায় অধিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্রোমোসোমের নিজস্ব মধ্যাংশ সূত্রের সাহায্যে যেন লাগানো থাকে বিভক্ত কোষের যে দুটি আলাদা কেন্দ্রক হবে, তারই সঙ্গে।

কোষ বিভাগের এর পরের অবস্থাকে বলে এ্যানাফেজ। এই অবস্থায় বিভক্ত ক্রোমোসোমগুলির অর্ধেক অর্ধেক, কোষের দুটি প্রান্তে চলে যায়।

শেষ অবস্থাটিকে বলে টিলোফেজ। এ অবস্থায় কোষের সাইটোপ্লাজম ভাগ হয়ে যায়। বিভক্ত কোষের মধ্যে নতুন পর্দা পড়ে গিয়ে দুটি কোষ হয়ে যায়। কোষ এই অবস্থায় G_1 বিশ্রামাবস্থায় পৌছয়। এর পরই আবার সুরু হয় ডি-এন-এর বিপাকক্রিয়া। আর তা কোষ বিভাজনের আগে অবধি চলে।

ক্রোমোসোম যেমন দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, তেমনি ডি-এন-এ, জিন, ইত্যাদি বংশাণুক্রমনের সব মালমশলাই ভাগ হয়। বিভাজনের সময় কোন ত্রুটি থাকলে অস্বাভাবিক জিনের উদ্ভব হতে পারে। একে জিনের সোমা ঘটিত মিউটেশান বলে।

মিওসিস ঃ মিওসিসও এক রকমের কোষ বিভাজন যা পুরুষ অণ্ডকোষে ও স্ত্রী ডিম্বকোষে হয়। এর কারণ হল, বংশ অনুক্রমন স্ত্রী ও পুরুষের যৌন মিলনেই সম্ভব। আর জাতক পায় মার কাছ থেকে ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক। আর বাবার কাছ থেকে অর্ধেক। এই কারণেই অণ্ডকোষ ও ডিম্ব-কোষে কোষবিভাজন হবার সময় স্বাভাবিক কারণেই ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হতে হয়।

এই বিভাজনে ক্রোমোসোম অবশ্যই বিভক্ত হয়ে যায়, কিন্তু সে দুটি মাইটোসিসে যে রকম হয়, সেই রকম আলাদা আলাদা হয়ে যায় না।

মেটাফেজের সময়ে ক্রোমোসোমগুলি কোষের মধ্যভাগেই অবস্থিত থেকে, পরস্পরের গায়ে গায়ে লেগে, নিজেদের বিষয়বস্তুর আদানপ্রদান করে নেয়। একে আড়াআড়ি সংক্রমণ (crossing over) বলে। এরপর ক্রোমোসোম-গুলি আলাদা হয়ে যায় ও কোষের বিভাজন ঘটে। এই বিভাজনের ফলে 22টি দৈহিক (somatic) ও একটি লৈঙ্গিক (sex) ক্রোমোসোম নিয়ে বিভাজন হয়। ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে পিতা ও মাতার জিন সংক্রান্ত বস্তু সমাবিষ্ট থাকে। এর ফলে এই কোষগুলি একক সংখ্যার ক্রোমোসোম (22+1) ও অর্ধেক পরিমাণ ডি-এন-এ পায়। এইভাবে শুক্রকীট ও অণ্ডের ক্রোমোসোম ও ডি-এন-এ বিন্যাস হয়ে থাকে।

ডিম্বাশয়ে যে ব্যাপারটি ঘটে, তা মোটামুটি একরকম হলেও একটু ভিন্নতা আছে। এই ভিন্নতা হল, দুবার কোষ বিভাজন হয়ে, অণ্ডকোষে যে জায়গায় চারটি শুক্রকীট তৈরি হচ্ছে, সেই জায়গায় স্ত্রী অণ্ডে ভাগ হবার সময়, একটি পরিণত অণ্ড ও একটি প্রান্তিক অঙ্গ (polar body) বলে। এ-গুলির পরিণত ডিম্বের মত প্রজনন ক্ষমতা নেই। মানুষের স্ত্রী জাতীর দুটি স্ত্রী ক্রোমোসোম থাকে (XX); আর পুরুষের একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ (XY) ক্রোমোসোম থাকে। অবশ্য সব প্রাণীতে স্ত্রী-পুরুষের ক্রোমোসোম বিন্যাস এক রকমের নয়।

23টি করে ক্রোমোসোম আছে বলে, স্ত্রী-পুরুষ মিলনের ফলজাত ভ্রূণ বা শিশুটি 23+23=46 ক্রোমোসোম ও পূর্ণ সংখ্যার জিন পেয়ে যায়। এর মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য বা ব্যতিক্রম ঘটলে তা বিশেষ জিন সংক্রান্ত ব্যাধির সৃষ্টি করে। কি করে এ ঘটে তা নিচের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে।

অসংযুক্তি-নিরোধ (Non-disjnnction): ক্রোমোসোমগুলির যখন আলাদা আলাদা হয়ে, বিভক্ত কোষের দু প্রান্তে চলে যাবার কথা, তখন আলাদা না হয়ে, একটি ক্রোমোসোম আর একটির সঙ্গে লেগে থাকতে পারে। এর ফলে একদিকের বিভক্ত কোষে বেশী সংখ্যার ক্রোমোসোম, অন্যদিকে কম সংখ্যার ক্রোমোসোম থাকতে পারে। তার ফলে উৎপন্ন ভ্রূণের ক্রোমোসোম সংখ্যা কম বা বেশী দুই হতে পারে। যেমন লৈঙ্গিক ক্রোমোসোম XX = স্ত্রী অথবা XY = পুরুষ না হয়ে XO অথবা XXY ইত্যাদি রকমের হতে পারে। এ ছাড়াও XXYY, XYY এসব ও আরো

বিভিন্ন ধরনের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। প্রত্যেকটি ব্যতিক্রমই বিশেষ বিশেষ শারীরিক ত্রুটি ও অসুস্থতার কারণ।

এই ধরনের ত্রুটি ছাড়াও কোন ক্রোমোসোমের অংশবিশেষ ভেঙ্গে যেতে পারে। এই ভাঙ্গা ক্রোমোসোমের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিও জিনঘটিত শারীরিক ত্রুটি ও অসুস্থতার কারণ হতে পারে। দেখা গেছে এই ধরনের ক্রোমোসোমের ত্রুটি কোষে রঞ্জনরশ্মি বা অনুরূপ রশ্মির প্রয়োগের ফলে হতে পারে।

3 রোগের কারণের কয়েকটি দিক

কোন্ রোগের কি কারণ, এ জানা একটি বিশেষ তত্ত্ব হয়ে একটি বিশিষ্ট পাঠ্য, চর্চা ও গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে কারণতত্ত্ব নামে। তবু দেখা যাবে রোগ শরীরে যে বিকার ঘটায়, তার আলোচনাতেও অনিবার্যভাবে রোগের কারণের কিছু আলোচনা এসে যায়।

অনেক রোগকে জন্মগত রোগ বলে বলা হয়। হয়ত বলা উচিত প্রজন্ম-জনিত, যে কথায় তার বংশানুক্রমণ ও সেই রোগগুলির সঙ্গে বংশানুক্রমণ সঞ্চালক ক্রোমোসোম ও জিনগুলির সম্পর্ক ও তাদের বিকার, ঠিকভাবে বোঝা যায়।

প্রজাতিতত্ত্ব বা প্রজন্মবিদ্যার স্রষ্টা মেণ্ডেলই দেখিয়েছিলেন যে প্রাণীর প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই দুটি বস্তু বা জিনের যা পিতামাতার কাছে পাওয়া তার উপর নির্ভর করে। এগুলি আবার, একজোড়া ক্রোমোসোমের বিশেষ লোকাস (locus) বা স্থানে অবস্থিতি। সমান সংখ্যার (ক্রোমোজোম গুলিকে তার দৈর্ঘ্য অনুসারে 1, 2,···22 পর্যন্ত সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। X ক্রোমোসোম 6 ও 7 সংখ্যার ক্রোমোসোমের মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যে। আর Y ক্রোমোসোম সবচেয়ে ছোট দৈর্ঘ্যে।) ক্রোমোসোমগুলির এক সংখ্যার ক্রোমোসোমে একই স্থানে অবস্থিত জিনকে এলিল (alleles) বলে। তার মানে, যে কোন চরিত্রের পিতার একটি জিন ও মাতার এলিল জিনের সমাহারে সেই চরিত্রের অনুক্রমণ হয়। জিনঘটিত চরিত্রগুলিকে বলা হয় জিনচারিত্রিক (genotype) আর অন্য চরিত্রগুলিকে বলা হয় অন্যচারিত্রিক (phenotype)।

জিনগত যে চরিত্র অনুক্রমিত হয়, তার মধ্যে দেখা যায়, যে এমন চরিত্র বা রোগ আছে, যার মাত্র একটি জিন যদি সেই রোগগ্রস্থের থাকে ও তার এলিল জিনটি নাও থাকে, তবু ওই এক জিনের কারণেই সেই রোগ বা সেই চরিত্রটি অনুক্রমিত হতে পারে এই ধরনের জোরালো জিনকে বলে শক্তিশালী (dominant) জিন। আবার যদি অনুক্রমণের জন্য একটি জিন ও তার

এলিল দুটি জিনেরই প্রয়োজন হয়, সেই জিনকে বলে দুর্বল (recessive) জিন।

অনেক রকমের অস্থির ব্যাধি, একণ্ড্রোপ্লেসিয়ার (achondroplasia) জিন শক্তিশালী। ঠিক অনুরূপভাবে রক্তে যে গ্রুপ বা বিভাগ আছে, তার মধ্যে রিসাস গ্রুপের D শক্তিশালী। যেমন

$$D+D=D$$

$$D+d=D$$

$$d \times d=d$$

যেখানে rH অসঙ্গতির জন্য নবজাতকের মৃত্যু হয়, সেখানে এই কথা মনে রাখতে হয় যে D একটি শক্তিশালী জিন।

রক্তের যে গ্রুপ A, B, AB এবং O আছে, সেখানে A ও B-র জিনকে সমশক্তিশালী বা Co-dominant বলে।

জিনচরিত্র	AA/AO,	BB/BO,	AB,	OO
অন্যচরিত্র	A	B	AB	O

তথাকথিত শক্তিশালী জিনের যে কথা বলা হল, তার মাধ্যমে বিভিন্ন অসুখ কিভাবে অনুক্রমিত হয় তা লক্ষ্য করা যাক। এগুলি হল:

১। বংশপরম্পরায়, বাদ না নিয়ে প্রতি পুরুষেই এ অসুখ হতে থাকে, যদি পিতা মাতার মধ্যে একজনের রোগটা থাকে।

২। বংশে যারা রোগগ্রস্থ নয়, তাদের মাধ্যমে অনুক্রমণের ভয় নেই।

৩। রোগগ্রস্থ মানুষরা সাধারণতঃ সমজিনিক (homozygous) না হয়ে অসমজিনিক (heterozygous) হলে ও তাদের বিবাহে সঙ্গী বা সঙ্গিনী যদি স্বাভাবিক হলে, তাদের সন্ততিদের 50% ক্ষেত্রে অনুক্রমিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

৪। জিনের এই ত্রুটি বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করে না। কারণ তা করলে সেই জিন তো বিলুপ্ত হয়ে যেত। তবে অনেক সময় প্রকোপের যে হ্রাস লক্ষ্য করা যায় তার কারণ হল এদের বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা কম হয়ে যায়।

৫। কোন কোন জিন ঐভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। আবার পূর্বপুরুষের চেহারা হইতে ভিন্ন অবস্থার ফলে (mutation) কোন সুস্থ পরিবারে এর উদ্ভব হতে দেখা যায়।

৬। জিনের ত্রুটি পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমান সংখ্যায় হয়।

দুর্বল জিন মাধ্যমে যে ত্রুটিগুলি অনুক্রমিত হয়, সেগুলির অনেকগুলিই মারাত্মক। এ জন্য এগুলির আপাতসুস্থ বাহকের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন ক্ষেত্রে বাহকরা বিশেষ রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা পড়ে।

পরিবারের মধ্যে বিবাহ হলে অনুক্রমণ সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কেননা সেই পরিবারে একাধিক ব্যক্তি এই জিনের বাহক হতে পারে।

লিঙ্কেজ (Linkage) **বা সংযুক্তি** : ক্রোমোসোম সূত্রগুলিতে যে জিনগুলি থাকে, তা একটির পর একটি অবস্থিত। তাই জিন আদানপ্রদানের সময়ে ক্রোমোসোমগুলি যখন পরস্পরের আড়াআড়ি হয়, তখন খুব কাছাকাছি অবস্থিত জিনগুলি একসঙ্গে থাকে। একে বলা হয় লিঙ্কেজ বা সংযুক্তি। এই জন্য কোন একটি চরিত্র, অন্য একটি চরিত্র বা রোগসম্ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। এই রকম লৈঙ্গিক ক্রোমোসোম X বা Y-এর সঙ্গে অনেক রোগ বা দৈহিক ত্রুটি সংযুক্ত থাকতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শক্তিশালী (dominant) হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন প্রজন্মে রোগটি বাদ যায়, অর্থাৎ দেখা দেয় না। একে বলা হয় যে উক্ত জিনটির গভীরে যাবার ক্ষমতা কম (reduced penetration)। আবার এই জিন থাকা সত্ত্বেও কোন ক্ষেত্রে রোগের প্রকোপের কমবেশী দেখা যায়। একে প্রকাশের ইতর বিশেষ বলে (variable expressivity) নাম দেয়া হয়েছে।

মধ্যবর্তী অনুক্রমণ (Intermediate inheritance) : যখন সমজিনিক (homozygote) ও অসমজিনিকের (heterozygote) ব্যবধান খুব বেশী হয়, সেই অনুক্রমণকে মধ্যবর্তী অনুক্রমণ বলা হয়। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল সিক্‌ল সেল এ্যানিমিয়া (sickle cell anaemia) বা কাস্তের মত রক্ত-কোষ জনিত রক্তহীনতা। এ ক্ষেত্রে সমজিনিক ব্যক্তির জীবন সংশয় হয়, কিন্তু অসমজিনিক থাকে আপাত স্বাভাবিক। বিশেষ রক্ত পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে।

জিনের কাজকর্ম কিভাবে হয় : এখন এটা জানা গেছে যে, ডি-এন-এই একটি কোষ থেকে পরবর্তী কোষে জিনের অন্তর্গত সংবাদ বহন করে। এই সংবাদের মাধ্যমেই অনুক্রমণের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়। খবর যে সাংকেতিক অক্ষরগুলির দ্বারা চালিত হয়, তার একক তৈরি হয় তিনটি করে নিউক্লিও-

টাইড দিয়ে। তিনটি বিশেষ ভিতের নিউক্লিওটাইড একটি বিশেষ এ্যামাইনো এ্যাসিড তৈরির নির্দেশনামা। এইভাবেই বিশেষ বিশেষ প্রোটিনগুলি প্রস্তুত হয়। এই পর্যায়ে কোন ত্রুটি থাকলে, অস্বাভাবিক কোন প্রোটিন তৈরি হয়। একেই বলে আণবিক পর্যায়ের অসুস্থতা (molecular disease)। এর উদাহরণ হল, বিভিন্ন অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন সংক্রান্ত রোগ।

যেমন সিকল সেল এ্যানিমিয়া বা কাস্তের মত রক্তকণিকা পাওয়া যায় যে রক্তহীনতা রোগে, তাতে লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিন S বলে এক বিশেষ ধরনের হিমোগ্লোবিন তৈরি হতে থাকে। এ হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা অল্প। রক্তকণিকার চেহারাটা ওই রকম হবার ফলে, এগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও ছোট ছোট ধমনীজালিকায় এগুলি আটকে রক্ত জমাট বেঁধে যায়।

একটি অস্বাভাবিক জিনের প্রভাবে এই রোগ হয়। অবশ্য রোগীকে সমজিনিক (homozygous) হতে হয়। এ্যামাইনো এ্যাসিডের মধ্যে গ্লুটামিক এ্যাসিড স্বাভাবিক হবার পরিবর্তে অস্বাভাবিক হবার ফলে এই রোগ হয়।

আরো অনেক রকমের অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন দেখা যায়।

কখনো জিনের ত্রুটি জন্য হয়ত কোন কোন প্রোটিন একেবারে তৈরিই হয় না। যেমন এ্যালবুমিন তৈরির ব্যাঘাত (analbuminaemia) যেখানে এই প্রোটিনটি তৈরি হয় না।

একটি জিন = একটি অনুঘটক, এ থিয়োরির সত্যতা দেখা যায় যখন এমন কোন অনুঘটক দেখি, যার মধ্যে ত্রুটি আছে। যেমন স্বাভাবিক কোলিন-এষ্টারেজের বদলে সুডো-কোলিনএষ্টারেজ কোন কোন বিশেষ অবস্থা তৈরি করছে, এমন জিনগত অস্বাভাবিকতা দেখা যায়।

ক্রমে ক্রমে আমরা এ রকমের বহু জিনগত ত্রুটি আবিষ্কার করছি। এদের বিপাকক্রিয়ার জন্মগত বিপাকের ভ্রান্তি (inborn errors of metabolism) বলে নামকরণ হয়েছে। এইসব জানায় জিনতত্ত্বের জ্ঞানও আমাদের বাড়ছে।

আমরা আরো জানতে পেরেছি, যে একটি ত্রুটিপূর্ণ এলিল একটি বিশেষ

জিনের জায়গায় থেকে যদি কোন জিনের কার্য পরিচালিত করে, তাহলে তার ফলস্বরূপ এক বা একাধিক ত্রুটি দেখা দিতে পারে, ও এর ফল সুদূর-প্রসারী হতে পারে। অনুঘটকের ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা কম বা স্থিতাবস্থায় ব্যাঘাত হতে পারে।

জন্মগত বিপাককার্যের ত্রুটির কিছু কিছু উদাহরণ :

গ্যালাকটোসিমিয়া (Galactosaemia) : শিশুদের প্রজন্মগত এই ব্যাধিতে, শিশুরা বাড়ে না, লিভার বড় থাকে, প্রস্রাবের সঙ্গে গ্যালাকটোজ, অন্য এ্যামাইনো এ্যাসিড, এ্যালবুমিন ইত্যাদি বার হয়। বুদ্ধিহীনতা, লিভারের সিরোসিস, চোখে ছানি পড়া উপসর্গ দেখা যায়। এগুলি গ্যালাকটোজ 1-ফসফেট ইউরিডিল ট্রান্সফারেজ, এই নামের এক অনুঘটকের অভাবের জন্যই হয়। এই অনুঘটক গ্যালাকটোজকে গ্লুকোজে পরিণত করায় সাহায্য করে। এ ত্রুটি থাকায় দুধের গ্যালাকটোজ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া যে অনুঘটক, ফসফোগ্লুকোমিউটেজ শর্করা ভেঙ্গে গ্লুকোজ হবার শেষ ধাপগুলিকে সম্ভব করে, তার কাজও বিঘ্নিত হয়।

এ্যালক্যাপটোনিউরিয়া : এই অসুখে প্রস্রাবে হোমোজেনসেটিক এ্যাসিড, যার উপস্থিতির জন্য রেখে দিলে, প্রস্রাবের রং কালচে হয়, তাতেই বোঝা যায়। এই রোগে, রোগী বড় হলে গাঁটে গাঁটে ব্যথা হতে দেখা যায়।

ফেনিলকিটোনিউরিয়া : এই রোগ লাখে তিন-চার জনের দেখা যায়। এই রোগগ্রস্থদের প্রস্রাবে উপরোক্ত বস্তু বার হয়ে যায়। এদের বুদ্ধিহীনতা ও অন্য স্নায়ুর অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া চামড়ার অস্বাভাবিক রং ও চামড়া উঠে উঠে গিয়ে একজিমা দেখা দেয়। এতে ফেনিল-এ্যালানিন-হাইড্রক্সিলেজ, যা ফেনিল-এ্যালানিন, যা জান্তব বা উদ্ভিদজাত, তাকে মনুষ্য উপযোগী করে। খুব ছোটবেলায় ধরা পড়লে, যে খাদ্যে ফেনিল-এ্যালানিন নেই, এমন খাদ্য দিয়ে এই রোগকে কম রাখা যায়।

লেস-নাইহান সিণ্ড্রোম : এই রোগে বুদ্ধির অল্পতা, বাত, এক ধরনের পক্ষাঘাত ইত্যাদি দেখা যায়। এদের হাইপোজ্যানথিন-গুয়ানিন-ফসফোরাইবোসিল-ট্রান্সফারেজ বলে একটি অনুঘটকের অভাব দেখা যায়। এই রোগীদের কিছু কিছু ব্যবহারিক বৈলক্ষণ্যও দেখা যায়।

যে ধরনের প্রজন্মতত্ত্ব ও জিনের জ্ঞানের জগৎ-এ আমরা ক্রমশঃ প্রবেশ করতে পারছি, তার ফলে বিভিন্ন ঔষধ ও রাসানিক বস্তুগুলির কি ফলাফল হয়, প্রজাতিতাত্ত্বিক দিক থেকে তাও জানা যাচ্ছে। এর ফলে একটি নতুন জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্ম হয়েছে, যার নাম ফারমাকোজেনেটিকস (pharmacogenetics) বা ভেষজ-প্রজাতি তত্ত্ব। কিছু কিছু ভেষজের ফলাফল প্রজাতিগতভাবে অনুশীলন করা যায়। যেমন হেক্সামেথোনিয়াম অথবা আইসোনিয়াজাইডে যে কারো কারো সহ্য হয় না, এটা প্রজাতিগতভাবেই শুধু আমাদের বোধগম্য হয়।

ভন-গিয়েরকি-ব্যাধিঃ লিভার হল এমন একটি প্রত্যহ যা বিভিন্ন কার্বোহোইড্রেট ও শর্করাকে গ্লাইকোজেন হিসাবে মজুত করে লিভারেই সঞ্চয় করে রাখে। এই বিশেষ অসুখে তারই ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। এ রোগে লিভার বৃদ্ধি পায়। চেহারা মোটা দেখায়। রক্তে গ্লুকোজ কম হয়ে যায়। প্রস্রাবে কিটোন জাতীয় উপাদান দেখা দেয়। একটি প্রজন্মগত ব্যাধি। গ্লুকোজ-6-ফসফেটেজ নামের অনুঘটকের অভাবে এ রোগ দেখা দেয়।

ক্রোমোসোম ও ক্রোমোসোমের ত্রুটির কারণজাত ব্যাধিঃ বর্তমানে ক্রোমোসোমগুলিকে দেখা, ও তাদের সংখ্যা গণনা করার উপায় বার হয়েছে। কোলচিসিন (cholchisine) কোষ বিভাজনের অবস্থায় প্রয়োগ করলে, বিভাজন মাইটোসিস অবস্থায় আটকে থাকে। টিস্যু কালচার করে কোষগুলির উপর কোলচিসিন প্রয়োগ করা হয়। তারপর কোষগুলিকে অল্প চাপ লবনের রসে (hypotonic) ভিজিয়ে রাখলে, কোষটি ফুলে ওঠে ও ক্রোমোসোমগুলিকে বিচ্ছিন্ন দেখায়। এই সময়ে উপযুক্ত নিউক্লিয়াসের রঞ্জকে রং করে নিলে, এই ক্রোমোসোমগুলির উপযুক্ত ছবি নেওয়া যায় ও দেখা যায়।

ছবির ক্রোমোসোম (এগুলি X এই রকম হয়।)-গুলিকে তাদের বড়ছোট অনুসারে সাজানো হয়। সবচেয়ে বড়টি জোড়া নং 1 তারপর 2, 3, ইত্যাদি। সব চেয়ে ছোট জোড়া 22। X ক্রোমোসোম Y-এর সমান লম্বা। Y ক্রোমোজোম 22 জোড়ার একটির মত।

বর্তমানে প্রতিটি ক্রোমোসোমের মধ্যে কয়েকটি রেখা দেখে তার কোনটি কত নম্বরের তা বোঝা যায়।

বার (Barr) যেমন কোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমাটিনের বিন্দুর উপস্থিতিতে

বোঝা যায় যে সে কোষটি স্ত্রী জাতীর ও তার এই বিন্দু দুটি X ক্রোমোসোমের উপস্থিতির জন্য। ঠিক ওই রকমই বর্তমানে কুইনাক্রিন দিয়ে কোষকে রঞ্জিত করে, বেগুনিপারের আলোর সাহায্যে কোষের Y ক্রোমোসোমের চিহ্ন হিসাবে একটি বিন্দু দেখা যায়।

মেরি লিয়ন দেখিয়েছিলেন যে স্ত্রী কোষে যে দুটি X ক্রোমোসোম থাকে, তার মধ্যে একটি নিষ্ক্রিয় থাকে। নিষ্ক্রিয় হলেও এই ক্রোমোসোম বংশানু-ক্রমণের বিশেষ বিশেষ জিনের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে। যেমন হিমোফিলিক রোগে বিশেষ যে জিন এ্যান্টি হিমোফিলিক গ্লোবিউলিন তৈরি করার জিন এইভাবে বাহিত হয় মনে করা যেতে পারে। এই বিশেষ ধারণাটিকে লিয়ন হাইপোথিসিস বলা হয়।

লৈঙ্গিক ক্রোমোসোম জাত ব্যাধি ঃ আমরা দেখেছি যে X ও Y ক্রোমোসোম কিভাবে স্ত্রী বা পুরুষ জাতীর দৈহিক ও মানসিক কাঠামোর রূপ দেয়। অর্থাৎ XX ক্রোমোসোমে স্ত্রী আর XY পুরুষ তৈরি করে।

কোন কোন ব্যক্তির দেহে ও মনে স্ত্রী ও পুরুষ উভলিঙ্গের হতে পারে। এদের উভলৈঙ্গিক (Hermaphrodite) বলে। এদের শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষ দুই থাকে।

প্রকারভেদে উভলৈঙ্গিক নানা রকমের হতে পারে। এরা সকলেই সঠিক উভলৈঙ্গিক নয়।

এক ধরনের উভলৈঙ্গিক দেখা যায়, যাদের অণ্ডকোষ স্ত্রী ভাবান্বিত হয়েছে বলে বলা যায়। একে testicular feminisation বলে। এদের বুদ্ধি থাকে যথেষ্টই। বহিরাঙ্গ আকর্ষণীয় স্ত্রীসুলভ হয়। স্তনের বৃদ্ধিও হয় ঠিক মেয়েদের গঠনের। এদের অণ্ডকোষ থাকে কুঁচকির কাছে। মাসিক হয় না। যোনি ছোট। এদের ক্রোমোসোম সংখ্যা স্বাভাবিক পুরুষালি, অর্থাৎ 46, XY কিম্বা 45, XO হতে দেখা যায়। এর বিকারতাত্ত্বিক কারণ সঠিক জানা নেই। ভ্রূণাবস্থায় সৃষ্টি উলফিয়ান। মুলারিয়ান সুড়ঙ্গ পথ (duct) থেকে যে বহির্জননেন্দ্রিয় তৈরি হয়, তারই ত্রুটিবিচ্যুতিই এর কারণ বলে মনে হয়। রোগীদের এণ্ড্রোজেন দিয়েও কোন কাজ হয় না।

ক্লাইনফেলটার সিণ্ড্রোম ঃ এই উভলিঙ্গ অবস্থা 500টি শিশুর মধ্যে একজনের দেখা যায়। এদের স্তন পুষ্ট হয়। অণ্ডকোষ ছোট, দাড়ি গোঁফ কম, গলার আওয়াজও হয় মিহি। হাত, পা, বিশেষ করে পাগুলি হয় লম্বা

লম্বা। ক্রোমোসোম সংখ্যা এদের 47। লৈঙ্গিক ক্রোমোসোম হয় XXY। এদের কোষে স্ত্রী চিহ্নসূচক লৈঙ্গিক ক্রোমাটিন একটির বেশী থাকতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রোমোসোম সংখ্যা আরো বিচিত্র হতে পারে: যেমন 48, XXXY বা 49, XXXYY অথবা 49, XXXXY এই রকমও হতে পারে। আর দুই ধরনের ক্রোমোসোমের মোজাইকও (mosaic) দেখা যায়।

টার্ণার সিণ্ড্রোম: ওভেরি বা ডিম্বাশয়ের কৃপণতা বা ovarian dysgenesis ও বলা হয় এই অবস্থাকে।

এই অবস্থার স্ত্রীলোকদের ওভেরি বা স্ত্রী ডিম্বাশয় নগণ্য অবস্থার কি শুধু একটি রেখার মত অবস্থায় থাকে। একে রৈখিক ডিম্বাশয় বা Streak ovary বলে। এতে ডিম্বাশয়ের বহিরাংশের মধ্যবর্তী কোষ বা Stroma অংশটা থাকে। কিন্তু ডিম্বের জননীকোষগুলি না থাকায় ডিম্ব পরিণত হওয়া তো দূরের কথা, ডিম্ব উৎপন্নই হতে পারে না।

কোন ক্ষেত্রেই ঋতুস্রাব হয় না। স্ত্রীসুলভ শারীরিক গঠন ও পরিপুষ্টিও হয় না। বহির্জননেন্দ্রিয় শিশুসুলভই থেকে যায়। লম্বায়ও অর্থাৎ উচ্চতায় এরা স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের চেয়ে ছোট হয়। জন্মের সময়ে গলায় ভাঁজ, চেপ্টা বুক, স্তনের বোঁটা দুটির পরস্পর থেকে দূরে অবস্থিতি এই সব দেখা যায়। তা ছাড়া মহাধমনীর ত্রুটিও (coaretation) দেখা যায়। অর্থাৎ শরীরের অন্য ত্রুটিও থাকে।

ক্রোমোসোমের ত্রুটি হয় 45, X। কোষ নিউক্লিয়াসে বার (Barr) চিহ্ন দেখা যায় না।

তথাকথিত টার্ণার সিণ্ড্রোমের বিভিন্ন রকমফের যেমন 45,XX কি 46,X ইত্যাদি নানা বৈচিত্র ক্রমশঃই দেখা যাচ্ছে।

সম্প্রতি 47,XXX ক্রোমোসোম বিশিষ্টতা নিয়ে এক ধরনের স্ত্রী দেখা গেছে। এদের অতি স্ত্রী (super female) বলা হয়। কিন্তু একটি স্ত্রী ক্রোমোজোম বেশী থাকা সত্ত্বেও এদের স্ত্রীত্ব বেশী না হয়ে কমই হতে দেখা যায়। এরা ঋতুমতি হয় না। জরায়ু, যোনি, স্ত্রী বহিরাঙ্গ, এ সবই ছোট হয়। মানসিক পর্যায়েও একটু নিম্নমানের হয় এরা।

লৈঙ্গিক পরিপূর্ণতা, বৃদ্ধি ও স্বাভাবিকতা: বলা যেতে পারে একটি ডিম্ব, একটি শুক্রের সঙ্গে মিলিত হল যে মুহূর্তে তখনই ভ্রূণের অন্যবিধ পরিণতির

সঙ্গে লিঙ্গ ও সমগ্র লৈঙ্গিক দেহ পরিণতি কিভাবে হবে ঠিক হয়ে যায়। তার ফলে একটি Y ক্রোমোসোম থাকলেই তা দেহগঠন পুরুষালী করে।

অন্য ক্রোমোসোমের বৈলক্ষণ্যজাত ব্যাধি

মোঙ্গল, যাকে ডাউন সিণ্ড্রোমও বলা হয়, তাতে ছোট ক্রোমোসোমগুলির একটি, অর্থাৎ 21 নম্বরের ক্রোমোসোম দুটির জায়গায় তিনটি থাকে। এই ব্যাধিগ্রস্থদের অল্পবুদ্ধি, কুৎসিৎ দর্শন, খর্বকায়, চেপ্টা কপাল, চৈনিকদের মত চোখ, ইত্যাদি ত্রুটি থাকতে দেখা যায়। প্রায় সাতশত শিশু জন্মালে এ ত্রুটি একজনের দেখা যায়। মার বেশী বয়সের সন্তানদের এ রোগের প্রবণতা দেখা যায়। এই ব্যাধিগ্রস্থদের হাতের ও আঙ্গুলের রেখাগুলির কিছু বিশেষত্ব থাকে। কখনো 46টি ক্রোমোজোম নিয়েও মোঙ্গল হতে দেখা যায়। তবে সে সব ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে 21 নম্বর ক্রোমোসোম অন্য ক্রোমোসোমে যুক্ত হয়ে গিয়ে একটি বড় ক্রোমোসোমের মত দেখায়।

এ সব ছাড়াও এডোয়ার্ড সিণ্ড্রোম, বিড়াল কান্নার সিণ্ড্রোম, ইত্যাদি কিছু কিছু ব্যাধি, বিশেষ কোন পর্যায়ের একটি ক্রোমোসোমের আধিক্যের জন্য হয়। এই সব শিশুরা দুর্বল হয়। বাড়ে না। এত দুর্বল হয় যে তাদের কান্নাও বিড়ালের কান্নার মত হয়। সেইজন্য এ নামও দেয়া হয়েছে এ ব্যাধির।

কোন কোন টিউমার ঘটিত ব্যাধিতে যে শ্বেতকণিকার টিউমার হলে ছোট 22 নম্বরের ক্রোমোসোমের কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এই বিশেষ ত্রুটি-পূর্ণ ক্রোমোসোমটির নাম দেয়া হয়েছে ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোসোম, কারণ ফিলাডেলফিয়ায় কার্যরত বৈজ্ঞানিকরাই এটি প্রথম লক্ষ্য করেন।

জিনগত কোন ত্রুটি অনুক্রমিত হবার সম্ভাবনা আছে কি না, এ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। স্বামী ও স্ত্রীর ক্রোমোসোম বা জৈব রাসায়নিক পরীক্ষা করে, তাদের শিশুর কোন ত্রুটি হবে কি না বলা সম্ভব। সেই উপদেশ অনুযায়ী সেই দম্পতি, শিশুর জন্ম দেয়া বা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

বর্তমানে জিনগত ইঞ্জিনিয়ারিং বলে একটি বিষয়বস্তু পাঠ্য ও জ্ঞাতব্য-সূচির অন্তর্গত হয়েছে। এই বিষয়বস্তুর কাজ হল, জিনগত ত্রুটির সম্ভাবনা থাকলে তা সংশোধনের চেষ্টা করা।

রোগের কারণ সম্পর্কিত কিছু আলোচনা যা হল, তার মধ্যে অভ্যন্তরীণ

ত্রুটির কথা বেশী বলা হয়েছে। বাইরের কোন উত্তেজক বা অন্য কিছুতে কি হয়, তার আলোচনার দরকার।
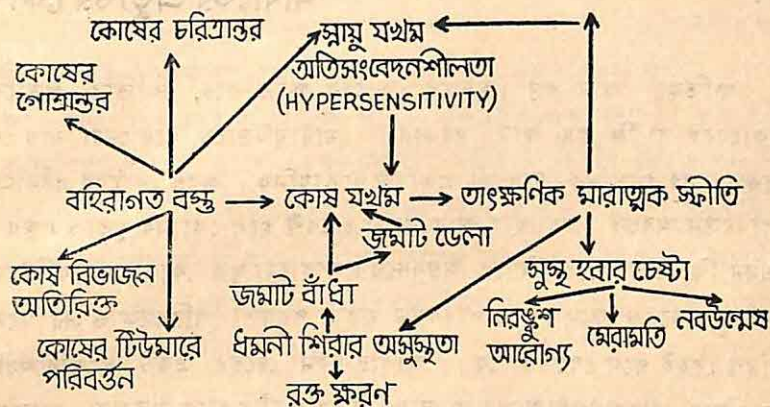
সহজ কথায় (এমন কি কোন পরিভাষা ব্যবহার যতদূর কম রেখে) একটি ছক দেবার চেষ্টা করা হল। এ থেকে দেখা যাবে, যে যে বস্তুটি শরীরের বাইরের ও বিজাতীয়, তা স্বাভাবিকভাবেই কোষকে জখম করতে পারে। আর যাবতীয় বিকারের মূলে জখম কোষ।

জখম যে ধরনের বিকারের রূপ নেয়, তা বাঁ দিকে যেমন দেখানো হয়েছে, টিউমারের দিকে আর প্রাণঘাতী ক্যানসারের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তারপর মাঝের সারিতে যেমন, এক জায়গায় ফেলা যায় এই রকমের দৈহিক বিকার। আর ডানদিকের সারিতে, কিভাবে ও পদ্ধতিতে আরোগ্য ঘটতে পারে তাই নির্দেশ করা হয়েছে।

ক্রমশঃ বিভিন্ন অধ্যায়ে এগুলিরই আলোচনা করা হবে।

4 আঘাতের প্রত্যুত্তর কোষ

ক্ষতিকর কোন বস্তু কিভাবে কোষের ক্ষতি করে, ও তার প্রভাবে কোষেরই বা কি হয় জানা দরকার। মোটামুটিভাবে ধরে নেয়া যায় যে সকল বস্তুর প্রাথমিক বোধগম্য প্রভাবটি রাসায়নিক। অবশ্য কোষের গঠনগত পরিবর্তন অবশ্যই দেখা যায় আর আঘাত বেশী হলে কোষের মৃত্যুও সম্ভব। এমন কি তার পরে, বিভিন্ন অনুঘটকের সাহায্যে মৃত কোষ দেহাবশিষ্টকে দ্রবীভূত করেও ফেলে। এ পরিবর্তন মৃত্যুর পরবর্তী পরিবর্তন ও এর ফলে সমস্ত দেহই গলে যেতে পারে। আবার যখন দেহের একটি অংশবিশেষই মরে যায়, তাকে সেই অঙ্গের বা জায়গাটুকুর স্থানীয়ভাবে মৃত্যু বা নেক্রোসিস হয়েছে বলা যায়।

জৈবরাসায়নিক কোন বস্তুর জন্য যে বিকার দেখা যায়, তার উপর বেশ কিছুদিন থেকেই সকলে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। অনেকদিন থেকেই জানা ছিল, যে পায়রাদের যদি থায়ামিনের অভাব ঘটে, তা হ'লে খিঁচুনি, ঘাড়গুঁজে পড়ে যাওয়া। এই সব উপসর্গ দেখা দেয়।

কিন্তু এই সব পায়রার স্নায়ু ভারবুর যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, যে তা খুবই অল্প পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে। কিন্তু পরীক্ষাতেও থায়ামিন দিলে, তখন অক্সিজেন গ্রহণক্ষমতা স্বাভাবিক হয়ে যায়। আর থায়ামিনের অভাব যে পায়রাদের নেই তাদের তো স্বাভাবিক থাকেই। রোগজনিত বিকারে যে শুধুমাত্র একটি জৈবরাসায়নিক বস্তুর বিকার হতে পারে এটা দেখা গেল, অর্থাৎ জৈবরাসায়নিক বিকারতত্ত্বের সুচনা হল।

ঠিক এইরকম ডিপথিরিয়া রোগের যে বিষাক্ত পদার্থ, তা সাইটোক্রোম নামে যে শ্বাসযন্ত্রের অনুঘটক আছে, তার কাজে বাধা দেয়। কার্যক্রম পদ্ধতির প্রতিটি ধাপ অবশ্য জানা না থাকলেও বীজাণুরাও যে রোগজনিত ক্ষতি রাসায়নিক কার্যপদ্ধতিতেই করে, এটা পরিষ্কার।

এমন কি জিনের মাধ্যমেও যে সব রোগ দেহের ক্ষতি করে, তারও কাজটা ঘটে এইভাবে : জিনে কোন ত্রুটি থাকলে তা সেই জিনের প্রভাবিত

অনুঘটককে প্রভাবান্বিত করে কোন না কোন জৈবরাসায়নিক ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটায়।

যে সব তথাকথিত কেমোথেরাপিতে নানা রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার করা হয়, সেগুলিও বীজাণুর ঠিক অনুরূপ জৈবরাসায়নিক বিকার ঘটিয়ে, তাদের জখম করে, রোগ সারায়। সালফা জাতীয় ওষুধের কাজও অনুরূপ। এ থেকেই আশা করা যেতে পারে যে ক্যানসারের সঠিক রসায়নটা বুঝতে পারলে, হয়ত একদিন ক্যানসার রোগের আরোগ্য করার ওষুধও বার হয়ে যাবে।

বিশেষ ধরনের মানসিক ব্যাধির মূলেও থাকে কোন জৈবরাসায়নিক কারণ। যেমন, লাইসার্জিক এ্যাসিড-ডাইএমাইন, প্রয়োগ করলে সিজে-ফ্রেনিয়ার মত উপসর্গ দেখা যায়।

কিভাবে জৈবরাসায়নিক বিকার ঘটে, তারও কিছু আলোচনার প্রয়োজন। এগুলি হল ঃ

1. বিশেষ অনুঘটকটি না থাকতে পারে, অথবা সেটি অস্বাভাবিক হতে পারে, কোন জিনের ত্রুটির জন্য।

2. কোন রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা অনুঘটকের কার্য ব্যাহত হতে পারে।

3. যে সাবসট্রেট বা ক্ষেত্রপদার্থের উপর অনুঘটক কাজ করবে তা কম বা অনুপস্থিত থাকতে পারে। এর কারণ হতে পারে অনুপযুক্ত খাদ্য ইত্যাদি।

4. সহ-অনুঘটক (co-enzyme) যাকে বলে, তাও কম বা অনুপস্থিত থাকতে পারে।

5. ক্ষেত্রপদার্থের জন্য অনুঘটকের প্রতিযোগিতার ফলে, অনুঘটকের কাজ ব্যহত হতে পারে।

জৈবরাসায়নিক দিক থেকে, কোষের বিপাকক্রিয়াকে বিপর্যস্ত করেই রাসায়নিক বিক্রিয়া বা বিকার কাজ করে থাকে। বিপাকক্রিয়ার যে ইতর বিশেষ হয়, তার ফলে ক্রমে ক্রমে কোষের বা কলার কি শরীরের গঠনও বদলে যেতে পারে। ঐ ধরনের গুরুতর পরিবর্তনের কথা বহুকাল থেকেই জানা আছে। একে degeneration বা অধোবিকৃতি বলা হয়। এই ধরনের বিকৃতির বিবর্তন নিয়ে গত একশো বছর ধরে মাথা ঘামানো হয়েছে। এই পরিবর্তনকে তিনভাবে বিভক্ত করা হয়ে এসেছে। এগুলি হল, cloudy

swelling—ঘোলাটে স্ফীতি, vacuolar degeneration—কোষ ভ্যাকুওলের বিকার, hydropic degeneration—জলস্ফীতি বিকার।

এ ছাড়াও আছে চর্বিজমা বিকার। এও দু'রকমের হতে পারে। এক, চর্বিজাতীয় বস্তু জমা হওয়া আর এক, উক্ত বস্তুজনিত বিকার। এ দুটিকে বলা হয়েছে fatty degeneration ও fally infiltration। তারপর কোষে ইয়োসিন রঞ্জক পদার্থে বস্তুহীন (structureless) লাল রং নেয়। এই অবস্থাকে হায়ালাইন (hyaline) বিকার বলে। আগে যখন সাধারণ অণুবীক্ষণে মোমের সাহায্যে কলার অংশ অতি পাতলা করে কেটে দেখা হত, তখন যেমন দেখাচ্ছে যে রকম, বর্জনমূলক বিকারতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ জৈবরাসায়নিক ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে যে পর্যায়ে পৌছনো সম্ভব হচ্ছে বলে তার একটা গুণগত পার্থক্যই স্পষ্ট হয়েছে।

কোষের ভিতরে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী পরিমাণে জল জমে যাওয়ায়, এই ধরনের বিকারের সূত্রপাত হয়।

আঘাতের প্রত্যুত্তরে কোষের যে কার্যকলাপ, বা অনুরূপ সবকিছুর মূলে একটি জিনিসই থাকে; তা হল রাসায়নিক বস্তুসমূহের বদল। বলা বাহুল্য, এই বদলে কোষের প্রতিটি অংশ, যেমন নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম, ও তাদের প্রতিটি প্রত্যাংশ অংশ নেয়।

নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন: আঘাতের পরেই নিউক্লিয়াসের পর্দার কাছাকাছি যে ক্রোমাটিন থাকে, সেগুলি একসঙ্গে জমাট বা দানা বেঁধে যায়। নিউক্লিওলাসের কাছের যে ক্রোমাটিন, তারও তাই হয়। আর নিউক্লিও-লাসের মধ্যে যে দানাগুলি থাকে, সেগুলিও নষ্ট হয়ে যায়। অথবা আরো ছোট টুকরোয় পরিণত হয়। দানাগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়া মানেই হল রাইবোনিউক্লিক এ্যাসিড প্রস্তুতির ঘাটতি। এর ফলে প্রোটিন উৎপাদনও ব্যাহত হয়।

কোষের সাইটোপ্লাজমের পরিবর্তন: বিকারগ্রস্থ কোষের সাইটো-প্লাজমে এক এক করে পাঁচটি বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যার। এগুলি হল:

1. কোষের কাজকর্মের বৃদ্ধি: আঘাতগ্রস্থ অবস্থা থেকে সেরে ওঠার প্রচেষ্টায় প্রথমে কোষ তার কোন কোন প্রত্যঙ্গের সংখ্যা বৃদ্ধি করে কাজকর্ম বাড়িয়ে বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক বস্তু দিয়ে ক্ষতি যা হয়েছে তা মেরামতের চেষ্টা করে। যে সব বিষাক্ত বস্তু জমা হয়েছে তা প্রথমতঃ পাতলা করে

তারপর বার করে দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। এ-টি-পি তৈরির কাজও এ সময়ে বাড়ে।

2. কাজকর্ম বৃদ্ধির ঠিক পরেই হয় কাজকর্মের হ্রাস। যে সব সাইটো-প্লাজমের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যঙ্গের সংখ্যাধিক্য হয়েছিল, এখন তা কমতে থাকে। এই কমার সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিন সংগঠনও কমে যেতে থাকে। এই জন্য মাইটোকণ্ড্রিয়াগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে ফুলে ফুলে ওঠে। কাজ কমে গেছে বলে এ-টি-পিও কম তৈরি হয়।

3. বিশেষ কোষের কাজকর্মও বদলে যেতে থাকে। যেমন বৃক্ক বা কিডনির গ্লোমোরিউলাসের কোষ, যাদের কার্যসূচীতে খাদক হবার কথাই নেই, তারাই খাদক কোষ হিসাবে, জমা হওয়া ফিব্রিন (fibrin) হজম করে ফেলে।

4. কোষে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর জমা হওয়া। সঠিক কাজ চলছে না বলে কোষের ভিতরে সাইটোপ্লাজমে অনেক কিছু জমা হয়, যেমন চর্বিজাতের জিনিস।

5. বিশেষ পরিবর্তনে কোষকে বিকারগ্রস্থ দেখায়। এই বিকার প্রথম দেখা দেয় কোষের সাইটোপ্লাজমে। এই সাইটোপ্লাজমের স্থানীয় বিকার বলা হয়।

অনেক সময়ে সাইটোপ্লাজমের যে অংশগুলি বিকারজনিত ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্থ থাকে, সেই অংশগুলিকে নিষ্কাষিত হয়ে যেতে হয়। কোষের এই অংশগুলিকে মৃত কোষাংশ (necrosed part of cell) বলে।

যে কোষ জখম হয়েছে তার কার্যপদ্ধতি মোটেই সহজ নয়। তা জটিল। কোন কোষে জখম হবার পর যে সব পরিবর্তন ঘটে, আবার অন্য কোষে হয়ত কোন বিশেষ পরিস্থিতি বা বস্তুর সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য সেই সেই পরিবর্তনই ঘটায়। তাই বলা যেতে পারে, যে জখমটাকে মানিয়ে নিয়েই শরীর জখম সারানোর চেষ্টা করে। আবার বিভিন্ন জখমের প্রত্যুত্তরে কোষ সাড়া দেয় বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

চর্বি জমা হয়ে যে ধরনের বিকার (fatty change) ঘটে, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণেও তা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কোষের স্বাভাবিক অবস্থায়ও এই অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় যে কোষে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় চর্বি

বা তৈলজ বস্তু থাকে। কিন্তু জখম কোষে যে তৈল বা চর্বির উদ্ভব হয় তা বাইরে থেকে আসে।

দেখা গেছে ফসফরাসের বিষাক্ততায় যখন লিভার জখম হয়, তখন তেল বা চর্বিজাতীয় বস্তুতে কোষটি ভরে যায়। কিন্তু যদি জন্তুটিকে উপবাস করিয়ে রাখা হয়, তা হলে লিভার ক্ষতিগ্রস্থ হয় ঠিকই, কিন্তু তার ভিতরে চর্বিজাতের জিনিস জমা হয় না।

চর্বিজাতের বস্তু জমা হবার কারণ হিসাবে বলা হয়, যে যখন চর্বি জমা যেখানে থাকার, সেখানে থাকে. তখন তা চর্বি বা ফ্যাট (fat) অবস্থায় থাকে। যখন তা রক্ত চলাচলের সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়, তখন তা এ্যালবুমিন বা অনুরূপ প্রোটিনের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। কোষ যখন একে ব্যবহার করে, তখন এই যৌগিক অবস্থা থেকে ভেঙ্গে নেয় ও বিপাক কর্মে ব্যবহার করে। কিন্তু যে কোন কারণে কোষ জখম হলে, তখন আর এই ভেঙ্গে নেবার কাজটা করা সম্ভব হয় না। এই জন্য তখন কোষে জমা হতে থাকে।

চর্বি জমা ও তার জন্য যে বিকার ঘটে, অনেক কলার কোষে কিন্তু অন্য ধরনের বিকার দেখা যায়। চর্বিঘটিত বিকার প্রধানতঃ লিভারে হয়। এও যে কেন তা জানা নেই। তবে লিভার রক্তের ফ্যাটি এ্যাসিডকে ফসফো-লিপিডে পরিণত করে। এগুলি আবার তৈল বা লিপিড যোগে লাইপো-প্রোটিনে পরিণত হয়ে আবার রক্তস্রোতে ফিরে যায়। লিভার জখম হলে প্রোটিনের বিপাক কার্য ব্যহত হয়। লাইপোপ্রোটিন তৈরি ব্যাহত হয় কাজেই যে লিপিড বা চর্বি অন্যভাবে ব্যবহৃত হত, তা লিভারেই জমা হতে থাকে।

খাদ্যে স্বল্পতা ঘটলেও লাইপো-প্রোটিন তৈরি করার মালমশলা কম পড়ে। এই কাজে কোলিনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। এ না থাকলে ফসফো-লিপিডে ফ্যাটি এ্যাসিডগুলি পরিণত হতে পারে না। এরই ফলে ফ্যাটি-এ্যাসিড ফ্যাটে (চর্বিতে) পরিণত হয়ে জমতে থাকে। দীর্ঘ অপুষ্টি, উপবাস, ইত্যাদিতে, যেমন কোয়াসিঅরকরে এই ধরনের ক্ষতি লিভারে দেখা যায়। এর ফলে সিরোসিসও (cirrhosis) হতে দেখা যায়।

হায়ালাইন বিকৃতি ঃ লাল ইয়োসিন জাতীয় রঞ্জক হায়ালাইন গ্রহণ করে, এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিবর্তনে কলাকে প্রায় স্বচ্ছ

কাঁচের মত দেখায়। হায়ালিউরোনিক এ্যাসিড ও কনড্রয়টিন সালফেট এই বিকারে কলার অভ্যন্তরে জমতে থাকে। ও তাই হায়ালাইনে পরিণত হয়।

জখম হবার পরে কোষগুলির মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটে তার একটি ছবি দেওয়া হল। এই ছবিতে দেখা যাবে স্বাভাবিক কোষ ধাপে ধাপে মৃত কোষে পরিণত হতে পারে। কিন্তু গতির প্রবণতা শুধু একদিকেই নয়। একেবারে মৃত হবার আগে পর্যন্ত যে পথ দিয়ে খারাপ হয়ে যাবার দিকে গিয়েছিল সেই পথ দিয়েই ফিরে আসে।

কোষের মৃত্যু বা নেক্রোসিস (necrosis) কোষের মৃতু যদিও মৃত্যুই, তবু তার ছবিটায় বেশ ইতরবিশেষ থাকতে পারে।

জমাট বেঁধে মৃত্যু (coagulative necrosis) : এই অবস্থায় মৃত্যু হলে, কোষগুলি শক্ত ও ফোলা ফোলা দেখায়। কিডনি অথবা হৃৎপিণ্ডে রক্ত জমাট বেঁধে, তারই ফলে যদি স্থানীয় কলার মৃত্যু হয়, সেখানে এ রকম দেখা যায়। ওই অবস্থা হয় সাত থেকে দশদিন চলবার পরে। কলাকে গরমে
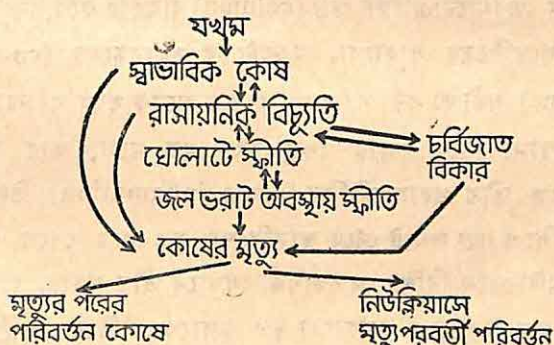
সিদ্ধ করলে যে রকম হয় তেমনি তার স্বাভাবিক স্বচ্ছতা আর থাকে না। অণুর যে শৃঙ্খল আছে, সেগুলির শেষদিককার রাসায়নিক পদার্থের সংযোগ-সূত্রগুলি খুলে যায়। এতেই বোঝা যায় মৃত কলা কেন ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতে পারে, বা রঞ্জক পদার্থ গ্রহণ করে রঙিন হতে পারে। এটুকু ছাড়া বাকি গঠনশৈলী রক্ষিত হয়।

চিজ বা পণিরের মতও মৃত কলার অংশবিশেষ হয়ে যায়। এটা যক্ষা বা টিউবারকুলোসিসেই বেশী দেখা যায়।

তরলিত মৃত্যু (colliquative necrosis) জমাট না হয়ে মৃত কলা বরং তরল হতেই এতে দেখা যায়। এটা স্নায়ু কলায় হতে দেখা যায়।

অবশ্য সব মৃত কলাতেই তরল হওয়া দেখা যায় পরবর্তী পরিবর্তনে। এতে পুঁজ হয়ে এই তরল অবস্থা হতে পারে। আর কেজিন পদার্থের তরলীভবন হয়ে হতে দেখা যায়।

কলাবিশেষের মৃত্যু বা নেক্রোসিস হলে, তার রাসায়নিক সাক্ষ্য শরীরের অনেক জায়গাতেই মেলে। এগুলি রক্তে চলে যায় বলে, রক্ত পরীক্ষায় ধরা পড়ে। এইভাবে গ্লুটামেট-অক্‌জেলো-এ্যাসিটেট-ট্রান্সএ্যামাইনেজ, ইত্যাদি অনুঘটকগুলি হৃৎপিণ্ডের ধমনীতে রক্ত জমাট বেঁধে স্থান বিশেষ মৃত হয়ে গেলে, সেই জায়গা থেকে বার হয়ে আসে। এজন্য সিরামে এগুলির বৃদ্ধি হয়।

ক্রিয়েটিন ফসফোকাইনেজও ওই রকম পোলিওমায়লাইটিজ মদ্যপাণ-জনিত মায়োপ্যাথি পেশীর ডিসট্রাফ, ইত্যাদিতে বাড়ে বলে সিরামেও দেখা যায়।

বর্তমানে ক্রোমাটোগ্রাফির স্তম্ভ (column) ব্যবহার করে, কি ষ্টার্চজেলির ইলেকট্রোফোরেসিসের সাহায্যে, অনুঘটকের সহাবস্থদের (co-enzyme), (iso-enzyme) পরীক্ষা করা সম্ভব। এতেও অনেক খবর পাওয়া যায়।

কোন স্থানবিশেষে কলার কিছু অংশ মৃত হলে, তার কাছাকাছি জায়গাগুলিতে তীব্র প্রদাহ স্ফীতির (acute inflamation) উপসর্গ দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডে রক্ত জমাট বেঁধে স্থানবিশেষ মৃত হয়ে গেলে এটা দেখা যায়। বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট শ্বেতকণিকা সেখানে ভীড় জমায়, যাতে তাদের হজমকারী অনুঘটকগুলির সাহায্যে মৃত কলাকে সরিয়ে ফেলতে পারে। এমন কি মৃত টিউমারও অনুরূপ উপসর্গের সূচনা করে।

তীব্র ক্ষতির পরের কাজটি হল মেরামতের কাজ। এ কাজে দানা দানা দেখতে যে কলা (granulation tissue) ও বৃহদাকার খাদক কোষ ম্যাক্রোফাজের উদ্ভব হয়। এদের দ্বারাই মৃত কলা দূর হয়ে সেই জায়গায় শুষ্ক ক্ষত চিহ্নের উদ্ভব হয়। এ জায়গায় ক্যালসিয়াম জমতে পারে। ক্যাল-সিয়াম জমা হয়ে কোন পুরানো ক্ষতে অস্থিও তৈরি হতে পারে।

গ্যাংগ্রিন বা পচনশীল ক্ষত বলে এর বর্ণনা বহুকালের। কালো, দুর্গন্ধ-যুক্ত হয়ে কোন জায়গা, হয়ত তার পাশের সুস্থ কলার সঙ্গেই খসে পড়বার আগে কিছুদিন থাকে। এই ধরনের মৃত কলায় পচন প্রায় সহগামী।

ক্লসট্রিডিয়া দলের বীজাণুই এই পচন ঘটায়। অবশ্য অন্য বীজাণু যে থাকে না তা নয়।

মুখে ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে এক রকমের শুকনো গ্যাংগ্রিন হতে দেখা যায়। অক্সিজেন অপছন্দ করে যে বীজাণুগুলি তারাও বিভিন্ন ধরনের গ্যাংগ্রিনের কারণ।

দাঁত তুলতে গিয়ে কোন একটি দাঁত বায়ুনালীর মধ্যে দিয়ে ফুসফুসে গিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে অনেক সময় ফুসফুসের স্থানীয় মৃত্যু গ্যাংগ্রিনের সৃষ্টি করে।

আর এক রকমের শুকনো গ্যাংগ্রিন হয় হাতে কি পায়ে। বহুমূত্র বা ডায়বিটিসে, রক্ত সঞ্চালনে বিঘ্ন ঘটলে এই ধরনের গ্যাংগ্রিন হতে দেখা যায়। এই ধরনের গ্যাংগ্রিনকে শুষ্ক গ্যাংগ্রিন বলা হয়।

আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের কোষ কি করে জখম হয়, এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই অসম্পূর্ণ। বর্তমানে কোষের রাসায়নিক কার্যকলাপ ও অণুর পর্যায়ে, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে আমাদের জ্ঞানের পরিধি উন্মোচিত হচ্ছে।

5

প্রদাহস্ফীতি

কোন কলা দেহের, সে দেহকলা যে কোন জায়গারই হোক, কোন আঘাত পেলে, বাঁচবার জন্য তাকে অনেক কিছুই করতে হয়। উচ্চ পর্যায়ের প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই কার্যকলাপ জটিলতর। এ জটিলতার কারণ হল, যে জায়গাটুকুতে আঘাত লাগল, সেই জায়গার কোষগুলি শুধু কাজ করলেই তো হয়ে যায় না। কাজ করে সারাদেহ একযোগে।

এইজন্য চিন্তা করতে হয় দুদিক থেকে। এক: হল সামগ্রিক। যেখানে সারা দেহ স্নায়বিক, কি হর্মোন ইত্যাদির কার্যকলাপ মাধ্যমে, শরীরের সামগ্রিক বিপাকক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটায়। আর সেই সঙ্গে লসিকা সংশ্লিষ্ট যে গ্রন্থীগুলি আছে তার কোষগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে, আরো বেশী সংখ্যায় খাদক কোষ উৎপাদন করেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়ায়।

এ ছাড়াও একটা স্থানীয় কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়। যে জায়গাটি ক্ষতিগ্রস্থ, সেইখানে সঞ্চালিত রক্ত থেকে খাদক কোষগুলি (phagocytic cells) এসে হাজির হয়। এই অবস্থাকে প্রদাহের তীব্র (acute) অবস্থা বলা হয়। জায়গাটি যতক্ষণ ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ উপরোক্ত
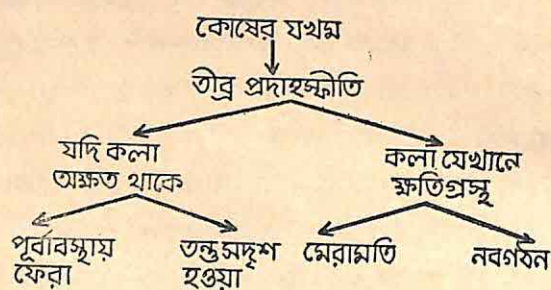
অবস্থা বজায় থাকে। উক্ত অবস্থার অবসান হলে, যে কোষগুলি পরিচ্ছন্ন-কারী কোষের ভূমিকায় থাকে (scavenger cells) তারা জায়গাটা পরিষ্কার করে স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনে। উপরোক্ত ছকের মাধ্যমে দেখলে ভাল বোঝা যাবে।

তীব্র প্রদাহস্ফীতির চারটি চিহ্ন: (1) রং (2) রক্তিমতা (3) যন্ত্রণা

(4) স্ফীতি। প্রথম শতাব্দিতে সেলসাসের বর্ণনায় এই চারটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল। তার পর শুধু একটি চিহ্নই যোগ করা সম্ভব হয়েছে। তা হল কার্যক্ষমতার বিলোপ।

প্রদাহ যে নিজে একটি বিশেষ রোগ নয়, এটি জন হাণ্টার প্রথম দেখান। তিনি বলেন যে প্রদাহ শরীরকে জখম থেকে বাঁচাবার প্রচেষ্টা।

প্রদাহস্ফীতির একটা উপযুক্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করা শক্ত। কোন জখমের বিরুদ্ধে সুস্থ কলার সাড়া, এ বলেও পুরোপুরি সব কথা বলে একটা পূর্ণ সংজ্ঞা হল না। তবে একথাও ঠিক যে, প্রদাহস্ফীতি বলে যা আমরা আজকে দেখি, তাও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান রূপে এসে পৌঁছেছে। উদ্দেশ্য আরোপ করলে বলা যায় যে এটা প্রাণীর পক্ষে রক্ষামূলক।

ধমনী, শিরা ও রক্তচলাচল ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই এই প্রদাহ-স্ফীতি। তবে যে নিম্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে এগুলির উদ্ভবও হয়নি, তাদের মধ্যেও প্রদাহস্ফীতি দেখা যায়। তবে তাকে অনেকেই সত্যিকারের প্রদাহস্ফীতি বলতে রাজি হন না।

এই সব চিন্তা করে বলা যায় যে প্রদাহস্ফীতি রক্তচলাচল ও তার আনুষঙ্গিক কলাসমূহের, আঘাতের উত্তরে সাড়া বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অবশ্য আঘাতটা এত বেশী না হয় যাতে সংশ্লিষ্ট কলার মৃত্যু হয়।

যে সব কলায় শিরা, ধমনী, লাসিকা ইত্যাদি রক্তচলাচলের বস্তু কম আছে, যেমন চোখের অচ্ছোদপটোল (conea) ইত্যাদি জায়গায় এই কারণেই প্রদাহস্ফীতি দেখা যায় না। অথবা এ সব জায়গায় দেখা গেলেও তা অতি মৃদু।

প্রদাহস্ফীতি কি কি কারণে হতে পারে? কারণ বহু।

বস্তুর আঘাত—যেমন কেটে যাওয়া, ধাক্কা লাগা।

রাসায়নিক কোন বস্তুতে—এর তালিকা নির্ধারণ দুঃসাধ্য। বিভিন্ন এ্যাসিড, এলকেলি (ক্ষার) থেকে সুরু করে, কোষ বা প্রোটোপ্লাজমের বিষ হবে, এমন যে কোন বস্তু, শরীরের কোন কোন রসবস্তু যেমন প্রস্রাব বা পিত্তরস বার হয়ে শরীরের—তাদের স্বস্থান নয়—এমন জায়গায় এলে, প্রদাহস্ফীতি ঘটতে পারে।

এ ছাড়া উত্তাপ, বেগুনী পারের আলো, রঞ্জনরশ্মি, অনুরূপ বিভিন্ন রশ্মি বা কণিকার প্রভাবে প্রদাহস্ফীতি ঘটতে পারে। আরো পারে,

ঠাণ্ডা কি গরমের প্রভাবে।

রক্তচলাচল ব্যহত হলে। এটা দেখা যায় যখন রক্ত জমাট বেঁধে কোন জায়গায় রক্তচলাচল বাধাপ্রাপ্ত হলে। যেমন, হৃৎপিণ্ডের করোনারি আর্টারিতে থ্রম্বোসিস হলে।

প্রয়োজনীয় বস্তুর অল্পতা ঘটলে। যেমন, যদি কোন জায়গা, যা বিশেষ হর্মোন পেতে অভ্যস্থ, যদি সেই বিশেষ হর্মোনের স্বল্পতা ঘটে।

কোন পোকা, মাকড় বা বীজাণুর আক্রমণে।

রোগ প্রতিরোধে যে রকম বিশেষ এ্যান্টিজেন—এ্যান্টিবডির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া হয়, সেই প্রতিক্রিয়ায়।

প্রদাহস্ফীতি যখন হয় তখন দেহের বিভিন্ন স্থানে বহুরকমের পরিবর্তনের সূচনা হয়।

প্রদাহস্ফীতি চলমান ঘটনাপ্রবাহ। এ জন্য লক্ষ্য করতে হলে জীবন্ত প্রাণীদেহেই তা লক্ষ্য করা সম্ভব। অচৈতন্য করা বেঙের জিভে, এ ঘটনাপঞ্জী লক্ষ্য করা হয়েছে। বেঙের জিভ স্বচ্ছ। এর ভিতরে রক্তচলাচল কিভাবে ঘটছে, তা এটিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রেখে দেখা যায়। তা ছাড়া হ্যামষ্টারের গালের ভিতরকার থলিতে, গিনিপিগের পায়ুতে, খরগোসের কানে, ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গাতেই দেখা হয়েছে। একশো বছর আগেকার কনহাইমের বর্ণনার পর এতদিনের মধ্যে খুব একটা নতুন কিছু আর বলা যায়নি। প্রদাহস্ফীতিতে পূর্বাপর তিনটি ঘটনা পর পর ঘটতে দেখা যায়। এগুলি হল:

1. শিরা ধমনী ইত্যাদির সাড়া।

(a) সেগুলির স্ফীতির পরিবর্তন।

(b) সেগুলির দেয়ালে বা প্রাচীরে পরিবর্তন, রক্তচলাচলের পরিবর্তন, রক্তচলাচল কম হয়ে যাওয়া।

2. স্ফীতি ও রস বার হওয়া।

(a) তরল রস বার হওয়া।

(b) রসে কোষবস্তুর উপস্থিতি—খাদক কোষ ও তার কাজ।

3. অন্য কলায় যে পরিবর্তন ঘটে।

শিরা, ধমনী প্রভৃতির পরিবর্তন—প্রদাহস্ফীতির সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ

লক্ষ্য করা যায় শিরা, ধমনী, লসিকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এই পরিবর্তন দেখা যায় বিশেষভাবে, দুটি ক্ষেত্রে :

1. ধমনী, শিরাগুলির সুরু বা মোটা হয়ে আয়তনের পরিবর্তন।
2. এগুলির প্রাচীরের পরিবর্তন ও রক্তচলাচলের ইতরবিশেষ।

আয়তনের পরিবর্তন : কোন আঘাতের প্রত্যুত্তরে শিরা, ধমনী, উপধমনী এগুলি প্রাথমিক অবস্থায় আয়তন কমে সরু হয়ে যায়। খুব সহজেই এটা লক্ষ্য করা যায়, যদি চামড়ায় আঘাত করা যায়। দেখা যাবে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা সাদা দেখায়, রক্তচলাচল কমে যাবার জন্য। উপধমনীগুলি উত্তেজিত হওয়ায়, বৃহত্তর শিরা, ধমনীগুলির মধ্যে এই পরিবর্তন দেখা যায়।

শিরা-ধমনীর স্ফীতি : সামান্য কিছু সময়ের জন্য সঙ্কুচিত হবার পরই এগুলি স্ফীত হয়ে ওঠে। এই অবস্থা যতক্ষণ প্রদাহস্ফীতি থাকে, ততক্ষণই চলে। ধমনী স্ফীত হয়ে উঠলে, রক্ত বেশী পরিমাণে আসতে পারে ও শিরার মাধ্যমে চলে যেতে পারে। তারপর উপধমনীর দ্বার খোলা থাকে বলে তাদের মধ্যেও রক্ত আসতে পারে। যে সব উপধমনী স্বাভাবিকভাবে চালু থাকার প্রয়োজন হয় না, সেগুলি এই অবস্থায় চালু হয়। এই জন্য প্রদাহস্ফীত অবস্থায় ধমনী ও উপধমনীর সংখ্যাও বাড়ে ও স্ফীতির জন্য, প্রদাহগ্রস্থ জায়গাটিকেও স্ফীত দেখায়।

ঠিক একভাবেই এগুলি ঘটে বলে, এ সম্পর্কে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে লুইস ত্রিবিধ সাড়ার (triple response) উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখান যে, জখম হওয়া কোষ থেকে হিষ্টামিন বার হয়। তাই কলার বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য দায়ী। ত্রিবিধ সাড়া হল, লাল হওয়া, বিস্তৃতি বা আয়তন বৃদ্ধি ও ফোলা।

লাল হওয়া—আঘাতের অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সেই জায়গাটি গাঢ় লাল হয়ে উঠতে দেখা যায়। তার পরই অক্সিজেন কম থাকা রক্তের (cyanosed) বেগুনী হয়ে যায়। উপধমনীর স্ফীতির জন্যই এটা হয়।

এই লাল হবার আধমিনিটের মধ্যেই লাল জায়গার চারিপাশটা ফুলে ফুলে ওঠে। এর কারণ হল ধমনীর স্ফীতি। এমনকি চামড়ার স্নায়ু যোগাযোগ কেটে দিলেও এটা হতে থাকে। তা থেকে বোঝা যায় যে এর মূলে যে পরাবর্ত (reflex), তা কেন্দ্রিয় স্নায়ুমণ্ডলের অধীনস্থ নয়।

ফুলে ওঠা—যেখানটা লাল হয়েছিল, সেই জায়গাতেই ফোলা ফোলা হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই স্ফীতির কারণ হল, ধমনীর প্রাচীর থেকে জলীয় পদার্থ বার হয়ে আসা। জলীয় বস্তু যত বাড়তে থাকে, ফোলা জায়গাটা লালের বদলে ফ্যাকাসে দেখাতে থাকে। এর কারণ হল, ওই জলীয় বস্তুই উপধমনীগুলির উপর চাপ দিতে থাকে।

ধমনীগুলির স্ফীতির ফলে সেই জায়গার রক্তচলাচল বেড়ে যায়। আর সেই জন্যই স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের চেয়ে ঠাণ্ডা হলেও, এ সময়ে তা বেশ গরম হয়ে ওঠে।

ধমনী ইত্যাদির স্ফীতি মুখ্যতঃ রাসায়নিক কারণের বশবর্তি হলেও, স্নায়ুর কাজও কম নয়।

স্নায়ুর প্রভাব—স্নায়ু ছিন্ন করে দিলেও প্রদাহস্ফীতি ঘটা সম্ভব, এও দেখা গেছে। তবু দেখা যায় যে খরগোসের কাণের স্নায়ু ছিন্ন করে দিলে প্রদাহস্ফীতির লক্ষণগুলি দেখা যায় না। এর ফলে সেই জায়গা বীজাণু আক্রমণের সম্মুখীণ হলে, প্রদাহস্ফীতি শুধু নামমাত্র হয়, ও জায়গাটার ক্ষতি হয় অনেক বেশী।

ঠিক অনুরূপ অবস্থাই ঘটে যখন এ্যাড্রিন্যালিন প্রয়োগ করা হয়। এ্যাড্রিন্যালিনে প্রদাহস্ফীতিজনিত সাড়ার বদলে, আক্রমণের ফল বরং সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে।

শিরা, ধমনী, ইত্যাদি রক্তনালিকার প্রাচীরের পরিবর্তন: স্বাভাবিক রক্তচলাচল যখন হয়, তখন সব রক্তকণিকা রক্তনালিকার মধ্যভাগ দিয়েই চলাচল করে। আর চারপাশ দিয়ে যায় স্বচ্ছ রক্তের প্লাজমা।

প্রদাহস্ফীতিতে প্রথমেই রক্তের চলাচলের গতি বেড়ে যায়। এটা সম্ভব হয় উপধমনীগুলির স্ফীতির জন্য। কিন্তু এটা ক্ষণস্থায়ী। এজন্য অবিলম্বে আবার গতি মন্থর হয়ে যায়। গতি মন্থর হয়ে যায় বলেই শ্বেত-কণিকাগুলি প্রাচীরের কাছে, অর্থাৎ যেখান দিয়ে প্লাজমার স্বাভাবিক যাতায়াত সেইখানে এসে রক্তনালিকার প্রাচীরে ঠেকে যায়। প্লেটলেট-গুলিও তাই করে। রক্তনালিকার প্রাচীরের ভিতরের পর্দাটা জিলাটিনের মত বস্তুতে আবৃত দেখা যায়। শ্বেতকণিকাগুলির রক্তনালিকার প্রাচীরে লেগে যাওয়ার কারণ হল, প্রাচীরে কোন আঘাত। এই সময় দেখা যায় যে শ্বেতকণিকাগুলি প্রাচীরের উপর দিয়ে নেহাৎই গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে।

এই অবস্থায় তিনটি জিনিস লক্ষণীয়। এগুলি হল, এ কণিকাগুলির মন্থরতা, শ্বেতকণিকার লেগে থাকা ও রক্তনালিকার প্রাচীরের ভিতরের দিকের স্ফীতি।

শ্বেতকণিকার লেগে থাকা : রক্তনালিকা থেকে রক্তের তরল অংশ বার হয়ে যায় বলে, নালিকার ভিতরের রক্তের তরলতা কম হয়ে যায়। ফলে রক্ত চলাচলের গতি কমে যায়। রক্তের তরল অংশ বার হয়ে যেতে পারার কারণ নালিকাগুলির স্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভেদ্যতা (permeability) বেড়ে যায়। তা ছাড়া প্লাজমার পিচ্ছিল করার ক্ষমতাও প্লাজমা ঘন হবার সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। এই সব কারণে ও জমাট বাঁধার ক্ষমত বৃদ্ধি পেয়ে যায় বলে নালিকার প্রাচীরের ভিতর দিকে শ্বেতকণিকাগুলি লেগে থাকতে পারে। একে শ্বেতকণিকার প্রান্তিকীভবন (margination) বলা হয়।

রক্তনালিকার ভিতর প্রাচীরের পরিবর্তন : রক্তনালিকার ভিতরের প্রাচীর দেয়ালের কোষগুলিও (endothelial cells) স্ফীত হয়ে ওঠে। যখম হওয়া কোষ থেকে জিলেটিনের মত বস্তু বার হয়। এই বস্তুতেই শ্বেত-কণিকাগুলি বাঁধা পড়ে। সেই সঙ্গে প্লেটলেটগুলিও। জিলেটিন সদৃশ বস্তুটি মিউকোপ্রোটিন বা শর্করা (polysaccharide) জাতীয়।

বিশেষ ধরনের নিঃসরণ বা স্রাবণ, প্রদাহস্ফীতির একটি বিশেষ দিক। এই নিঃসরণের একটা তরল অংশ ও একটা কোষবহুল অংশ থাকে।

তরল অংশ—রক্তনালিকায় যখন 60 মিলিমিটার পারদের চাপের সমান চাপ হয়, তখন রক্তের তরল পদার্থ অর্থাৎ লসিকার (লিম্ফের) নিঃসরণ বাড়ে। প্রদাহস্ফীতির সময়ে রক্তনালিকার কৈশিক চাপ বেড়ে যায়। এজন্য প্লাজমা নিঃসরণ ঘটা সম্ভব হয়। এই নিঃসরণে প্রোটিন বেশী থাকে ও এতে ফিব্রিনোজেন থাকায় সহজেই জমাট বেঁধে যেতে পারে।

নিঃসরণ নিয়ে যে সব পরীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে নিঃসরণের একটা প্রাথমিক দিক আছে। এটি থাকে আট-দশ মিনিট। পরবর্তী দিক সুরু হয় কয়েক ঘণ্টা বাদে। প্রাথমিক দিকটি শিরা জখমের জন্য ঘটে। পরবর্তী দিক অতি সূক্ষ্ম ধমনী বা উপধমনীর কারণে। অর্থাৎ প্রদাহে শিরা কি উপধমনীর প্রাচীর জখম হয়, সেই জখম হওয়া প্রাচীরের গা চুঁইয়ে বার হয়ে আসে তরল রস।

স্বাভাবিক অবস্থায় উপশিরা কি উপধমনীর মধ্যে দিয়ে জল ও দ্রাবকবস্তু,

অর্থাৎ যেসবগুলির আণবিক গুরুত্ব কম, সেই সব জিনিসই মাত্র বার হয়ে আসতে পারে। কিন্তু প্রোটিন কি কোন বড় অণু বেরুতে পারে না। কিন্তু প্রদাহস্ফীতিতে প্রোটিনের মত ভারী অণুও বার হয়। এর কারণ একাধিক।

কোষ যখন পানীয় গ্রহণ করে গৃহিত তরল বস্তুগুলিকে গোল গোল, ছোট ছোট ফোস্কার মত করে গ্রহণ করে। প্রদাহস্ফীতিতে এই ফোস্কাগুলি বড় হয়ে যায়। তখন তার মধ্যে দিয়ে গুরু অণুগুলিও চলাচল করতে পারে। তা ছাড়া দেখা গেছে 5-হাইড্রক্সি-ট্রিপটামিন, অর্থাৎ হিষ্টামিনের প্রভাবে উপশিরার ভিতরের প্রাচীরের কোষে, দুটি কোষের মাঝের ফাঁকটা বেড়ে যায়। এরই ফলে ভার বেশী এমন অণুও এই ফাঁক দিয়ে বার হয়ে যেতে পারে।

নিঃসৃত তরল পদার্থের কাজ: রক্তের মধ্যে যে বস্তুগুলি আছে, তার সবগুলিই এই নিঃসৃত তরল পদার্থের মধ্যে থাকে। এইজন্য বীজাণু-নিরোধক বস্তু যেমন, অপ্‌সোনিন, কম্‌প্লিমেন্ট ও ইমিউনোগ্লোবিন ইত্যাদি সবই এর মধ্যে এসে যায়। এমনকি যদি কোন বীজাণু-নিরোধক ওষুধও রোগী খেয়ে থাকে, তাও এই নিঃসৃত পদার্থে এসে যায়। এইখানেই তাড়াতাড়ি ওষুধ দেবার প্রয়োজনটা বোঝা যায়। নিঃসৃত তরল পদার্থ একটি বড় কাজ করে। তা হল, অপকারী বস্তুকে অনেকটা পাতলা করে দেয়া। তা ছাড়া নিঃসৃত বস্তুতে ফিব্রিনোজেন থাকাতে সেটা জমাট বেঁধে যেতে পারে। এতে, কয়েকটি সুবিধা হয়। যেমন:

1. কাটা জায়গার ফাঁকটা ভরে যায়।

2. জায়গাটা ভরাট থাকায় নতুন নতুন বীজাণু সে জায়গায় আক্রমণ করতে পারে না।

3. আক্রমণকারী সবকিছুকে এক জায়গায় ধরে রাখে বলে, শ্বেত-কণিকারা ক্ষতিকারকদের গ্রাস করতে পারে।

প্রদাহস্ফীতিতে স্ফীতি বা ফুলে ওঠার কারণের বেশীর ভাগটাই এই নিঃসরণ। বেদনা, যন্ত্রণা, এ সবও এই কারণেই হয়। স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে বলেই বেদনা হয়। কিন্তু এও দেখা গেছে যে চাপ যতটা বাড়ছে, বেদনা তার চেয়ে অনেক বেশী।

ক্ষরিত বস্তুর মধ্যে পটাশের উপস্থিতির জন্য তার PH এ্যাসিড পর্যায়ের হয়। পটাসিয়াম ছাড়া 5-হাইড্রক্সিট্রিপটামিন ও ব্র্যাডিকাইনিনও থাকে।

লসিকানালিকাগুলির যে প্রাচীর তার মধ্যে দিয়ে প্রোটিন যাতায়াত করতে পারে। এই জন্য প্লাজমা থেকে যে প্রোটিন বার হয়ে এসেছে, এই লসিকা স্রোতেই আবার তা রক্তের মধ্যে ফিরে যেতে পারে। প্রদাহস্ফীতির সময় লসিকার নালিকাগুলি খোলা থাকে। তাতে প্রোটিন ও অন্য সব কিছুর চলাচলই বৃদ্ধি পায়।

ক্ষরিত বস্তুর কোষসমূহ ঃ এর আগেই বলা হয়েছে যে রক্তের শ্বেত-কণিকাগুলি ক্ষুদ্র ধমনীর প্রাচীরে লেগে থাকে। লেগে থাকতে থাকতে তাদের শরীরের বহিরাংশ পা বাড়ানোর মতন বার করে (psu1opodia) তারা বার হয়ে আসে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দেখেও কোষের মাঝখানে কোন ফাঁক দেখা যায় না, প্রদাহস্ফীতির সময়েও। তাই মনে করা হয়, যেমন বলা হল, শরীরের অংশবিশেষ দুটি কোষের মাঝে সরু করে ঢুকিয়ে, তার পর বাকি শরীরটা ওমনিভাবে টেনেই তারা বার হয়ে আসে।

প্রথম যে কোষগুলি বার হয়ে আসে, তা হল বহুনিউক্লিয়াস যুক্ত পলিমর্ফ। তারা বার হয়ে এসে বহু ও অতিভোজী ম্যাক্রোফাজে পরিণত হয়। কিন্তু লিম্ফোসাইট নামের যে শ্বেতকণিকা, প্রদাহস্ফীতির প্রথমস্তরে তারা বার হয় না। তারা বার হয় পরে। অন্য শ্বেতকণিকা যে পথ তৈরি করেছে, সেই পথ ধরে। এদের ভূমিকা অনেকটা নিষ্ক্রিয়। এই ধরনের গতায়াতকে ডায়াপিডেসিস বলে (diapedesis)।

রাসায়নিক আকর্ষণ ঃ বিশেষ রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবে বিশেষ বিশেষ কোষ আকৃষ্ট হয়ে থাকে। ওই রকম রাসায়নিক আকর্ষণেই রক্তের শ্বেতকণিকাগুলি যে কোন আহত স্থানে আকৃষ্ট হয়। পরীক্ষাগারে বয়ডেনের প্রবর্তিত বিশেষ টিস্যু কালচার ঘরে একদিকে কিছু শ্বেতকণিকা ও অন্যদিকে আহত কলা ও মাঝখানে একটি ফিলটার রেখে দেখা গেছে যে শ্বেতকণিকাগুলি বিশেষ রাসায়নিক আকর্ষণে আহত কলার কাছে এসে যায়।

এই আকর্ষণ দেখা যায় শ্বেতসার, ও কোন কোন বীজাণুর প্রতি। এ্যান্টিজেন-এ্যান্টিবডির সংযোগের উপর কম্প্লিমেন্ট যুক্ত হলে তখন তা শ্বেতকণিকাকে আকর্ষণ করে। মনে করা হয় লিউকোট্যাকসিন অথবা এ্যাডিনিলিক এ্যাসিড এই আকর্ষণের কারণ।

তা ছাড়া বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু বিশেষ ধরনের শ্বেতকণিকাকে আকর্ষণ করে। তবে লিম্ফোসাইট যে কিসে আকৃষ্ট হয় তা বোঝা যায় না।

শ্বেতকণিকাগুলি বীজাণুদের গ্রাস করতে পারে। তবে দেখা গেছে যে মারাত্মক বীজাণুদের গ্রাস করবার জন্য সিরাম থাকা দরকার। সিরামে যে বস্তুটি থাকলে, তবেই শ্বেতকণিকার পক্ষে এটা সম্ভব হয় সেই বস্তুটির নাম অপসোনিন। এরই একটি অংশকে বলে স্বাভাবিক এ্যান্টিবডি। তবে এর কাজের জন্যও কম্‌প্লিমেণ্টের উপস্থিতি প্রয়োজন।

তবে অপসোনিনের আবার রকমফের থাকে। যে সব জীবাণুর দেহে ক্যাপসুল বা ঘোরাটোপ আছে, যেমন নিউমোকক্কাস ইত্যাদি বীজাণু বিশেষ ধরনের অপসোনিন যাকে প্রতিরক্ষী (immune) অপসোনিন বলে তাই থাকলেই হয়ে যায়। তবে অপসোনিন না থাকলেও যদি ফাইব্রিনের জালে বীজাণুগুলি ধরা থাকে, তা হলে শ্বেতকণিকা তাদের গ্রাস করতে পারে।

ঠিক কি পদ্ধতিতে রক্তের শ্বেতকণিকা, বীজাণু বা অনুরূপ বস্তুকে হজম করে ফেলে তা জানা নেই। তবে দেখা গেছে, যে বীজাণুটিকে গ্রাস করার পর শ্বেতকণিকার ভিতরে যে দানাগুলি থাকে সেগুলি কমে যায়। এই থেকে মনে করা হয় যে দানাগুলিতে লাইসোজোমের অনুঘটকই বীজাণুদের হজম করে ফেলে। শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি করে জ্বর উৎপাদক পদার্থ—পাইরোজেনও এইখানে থাকে। তীব্র প্রদাহস্ফীতিতে যে জ্বর হয়, তারও কারণ এই। শ্বেতকণিকার আয়ু তিন-চার দিন মাত্র। এ জন্য এদের আরম্ভ করা কাজ দীর্ঘজীবী ম্যাক্রোফাজের উপর পড়ে। এই বড় কোষগুলি তাই শরীরের অভ্যন্তরে বহুবিধ বস্তুই হজম করার চেষ্টা করে।

প্রদাহস্ফীতিতে একেবারে স্থানীয় যে কর্মকাণ্ড তার বাইরেও অনেক কিছু ঘটে। এগুলি দুটি অবস্থার উপর নির্ভরশীল। এগুলি হল—(1) জখম কতখানি হয়েছে (2) ক্ষতিকারক বস্তুগুলি উপস্থিত রয়েছে কি না।

কিছু কিছু জিনিস, যেমন যে সব বীজাণু পুঁজ সৃষ্টি করে, অথবা টার্পিন জাতের বস্তু যদি শরীরে ঢোকে তাতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ক্ষতি হয়। এইসব বস্তুতেও শ্বেতকণিকার ভিতরের অনুঘটকের কাজের জন্য অনেকটা জায়গা লাগে। সে জায়গাটা পুঁজে ভরে যায়।

প্রদাহস্ফীতিতে খুব বেশী জায়গা নষ্ট না হয়ে গেলে পলি বা বহু-

নিউক্লিয়াস ওয়ালযুক্ত শ্বেতকণিকার বদলে মনোনিউক্লিয়ার বা একনিউ-ক্লিয়াসের শ্বেতকণিকা এসে হাজির হয়। এদের গড়ার কাজও আছে।

প্রদাহস্ফীতিতে একই সঙ্গে ভাঙ্গা আর গড়ার কাজ চলতে থাকে।

ভাঙ্গার কাজ—ম্যাক্রোফাজ নামের যে বড় বড় কোষ আছে, তারাই লোহিতকণিকা, পুঁজ তৈরি করে যে শ্বেতকণিকা, বীজাণু ইত্যাদি সব গ্রাস করে। কখনো একাধিক ম্যাক্রোফাজ মিলে, বহু-নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট রাক্ষুসে কোষে (giant cell) পরিণত হয়।

এইমাত্র যে ম্যাক্রোফাজের কথা বলা হল, তারা আসে কোথা থেকে? প্রাণের প্রাথমিক পর্যায়ে যে ভ্রাম্যমান কোষগুলি বিভিন্ন কলায় থাকে, তাদেরই উত্তরসুরীদের বিবর্তিত প্রাণীকূলেও দেখা যায়, যেখানে এই কোষ কলাকে রেটিকিউলো এণ্ডোথিলিয়াল সিষ্টেম বলা হয়। রক্তে যে একনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট মনোসাইট দেখা যায়, তাদের থেকেই ম্যাক্রো-ফাজের সৃষ্টি এ কথাও মনে করা হয়। আমাদের সঠিক জ্ঞানের অভাব থেকে এটাই বোঝা যায়, যে প্রদাহস্ফীতির একেবারে গোড়ার দিকে যে ভাঙ্গনের কাজ, তাই এখনও পর্যন্ত ভাল করে বুঝতে আমাদের বাকি আছে।

গড়ার কাজ—প্রদাহস্ফীতিতে যেখানে খুব বেশী ক্ষতি হয়নি, সেখানে জারিত রসটা ও ভেঙ্গে যাওয়া কোষের অংশগুলিকে নিষ্কাষণ করে দিয়ে সেই জায়গাটা আবার স্বাভাবিক পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে দেহ। প্রকৃতির এই প্রচেষ্টাকে গঠনপ্রচেষ্টা (resolution) বলে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ফুসফুসে নিমোনিয়ার প্রদাহ সারার সময়ে দেখা যায়। সেরে একেবারে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যদি সারতে কোন কারণে দেরী হয়, অথবা যদি ব্রঙ্কোনিমোনিয়া হয়ে থাকে, সে সব ক্ষেত্রে পূর্বাবস্থায় না ফিরে জায়গাটা তন্তুময় হয়ে যায় ও সংশ্লিষ্ট আচ্ছাদনের (প্লুরা) সঙ্গে আটকে যায়।

মেরামতির কাজ যখন চলতে থাকে, তখন যে সব বস্তু নিষ্কাষণ করতে হবে, সেগুলি লসিকা নালিকা ও উপশিরার নালিকাগুলির মাধ্যমে এই নিষ্কাষণকার্য ঘটে।

পুঁজ হওয়া—যদি কলাকোষের বেশ ব্যাপক হারে মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে কোষদেহের ও শ্বেতকণিকার গলিত তরল দেহাবশেষ পুঁজ হয়। বিশেষ ধরনের অনুঘটকই দ্রবণের কারণ। যখন এই পুঁজ জমা

হয়ে ভিতরে থাকে, তখন এই পুঁজের আধারকে স্ফোটক বলে। স্ফোটকের চারিধারে দানাদার দেখতে এমন কলার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে ছোট ছোট রক্তনালিকা ও বিবিধ তন্তুকলা থাকে বলে এগুলিকে দানাদার দেখায়। পুঁজ নিষ্কাশিত না হয়ে গেলে এর চারিদিকে তন্তুর সৃষ্টি হয়। পুঁজের তরল অংশের মধ্যেও তন্তুর জন্ম হয়ে আস্তে আস্তে তাকে শুকিয়ে তন্তুকলায় পরিণত করে। আবার কখনো তা শুকিয়ে, তাতে ক্যালসিয়াম জমা হয়ে তা অস্থির মত হয়ে যায়।
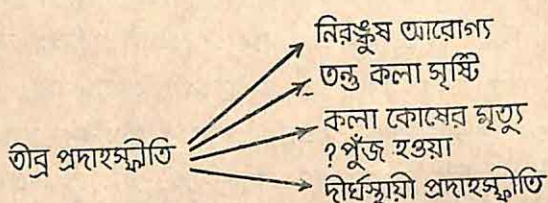
দীর্ঘস্থায়ী বা সামান্য প্রদাহস্ফীতি ঃ ভাঙ্গার ও গড়ার কাজ যখন একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলতে থাকে, তখন তা সামান্য বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহস্ফীতি হয়ে ওঠে। যে অংশটি মৃত হয়ে গেল, সেই বিশেষ মৃত কলাই আক্রমণকারী হয়ে উঠতে পারে।

প্রদাহস্ফীতির রাসায়নিক দিক—এ কথা বলতে গেলে প্রথমেই শিরা ও ধমনীর পরিবর্তনের কথা মনে পড়ে। বিশেষ করে, ক্ষুদ্র ও রক্তবহনের অনুনালিকাগুলিতে পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকবার উপযুক্ত একটা চটচটে ভাব সৃষ্ট হয়। এ ছাড়া রক্তের প্রোটিন ও কোষগুলিও সহজে বার হয়ে আসতে পারে। এর কারণ রাসায়নিক।

হিস্টামিন নামে একটি রাসায়নিক বস্তুকে প্রদাহস্ফীতির জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়েছে। এ ছাড়া আছে লিউকোটক্সিন ও ব্র্যাডিকাইনিন। কিছু কাইনিন তৈরির অনুঘটক যা রক্তে অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকে, তাও প্রদাহস্ফীতির সময়ে প্রস্তুত হয়। এগুলির মধ্যে প্লাসমিন ও গ্লোবিউলিন ভেদ্য বস্তু (globulin permeability factor) রক্তনালিকাগুলির প্রাচীরকে ভেদ্য করে তোলে। এ বস্তুগুলি হল :—

1. এমাইন পর্যায়ের—(a) হিস্টামিন
   (b) 5-হাইড্রক্সিট্রিপটামিন

2. কাইনিন পর্যায়ের
3. কাইনিন প্রস্তুতির অনুঘটক—(a) ক্যালিক্রিন
(b) গ্লোবিউলিন জাতের ভেদ্য বস্তু
(c) প্লাসমিন
4. কমপ্লিমেণ্টের অন্তর্গত বস্তুগুলি
5. বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট শ্বেতকণিকার অংশবিশেষ
6. প্রষ্টাগ্ল্যানডিন
7. নিউক্লিক এ্যাসিড ভাঙ্গা বস্তুগুলি
8. অন্যান্য বস্তু

এমাইন পর্যায়ভুক্ত—হিষ্টামিন: লুইসের যে পরীক্ষা আজ এত সুপরিচিত, তাতে তিনি দেখান যে দেহচর্মে আঘাত লাগলে, যে ধরনের স্ফীতি দেখা দেয়, তা দেহে হিষ্টামিন ইনজেকশান দেয়ার মতনই ঠিক। লুইসই দেখান, যে চামড়ায় আঘাত লেগেছে, তা থেকে হিষ্টামিনের মত বস্তু বার হয়ে আসে।

আবার দেখা গেছে যে, যদি চামড়ায় হিষ্টামিন ইনজেকশান দেয়া হয়, তাহলে সেই জায়গাটা ফুলে ফুলে ওঠে ও একটু পরে সে ফোলা চলে যায়। এমনকি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, হিষ্টামিন কোন জায়গায় স্থান করে নিলে, সেখানে বেশ কিছুক্ষণ থেকে যায়। কিন্তু আহত কলা থেকে হিষ্টামিন বার করে দেখানো যায়নি।

তাছাড়া হিষ্টামিন-বিরোধী, তথাকথিত এ্যান্টিহিষ্টামিন কোন আঘাতে প্রয়োগ করলে, প্রদাহস্ফীতির সব উপসর্গের উপশম হয় না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তথাকথিত এ্যালার্জি বা যেখানে কলা অতিমাত্রায় সাড়া দেয় (hyper-sensitivity state) সেই সব জায়গায় হিষ্টামিন-বিরোধী বস্তু ভাল কাজ করে।

তবে আবার এও দেখা গেছে যে, মারাত্মক প্রদাহস্ফীতিতে হিষ্টামিন বার হবার সম্ভাবনা আছে। কারণ হিষ্টামিন বার হয়ে আসার মত ঘটনাসমূহ এখানে ঘটতে থাকে।

কিভাবে শরীরে যে হিষ্টামিন তৈরি হয়, তা জানা নেই। অবশ্য প্রোটিন ও অন্য পলিপেপটাইড ভেঙ্গেই যে হিষ্টামিন হচ্ছে, এটা মনে করা হয়। কিন্তু

এও দেখানো সম্ভব হয়নি। তবে হিষ্টামিন এত দ্রুত তার কাজ করে যে, মনে হয়, আর কোন সূত্র থেকেই এই অতি দ্রুত হিষ্টামিন তৈরি হয়ে যায়।

5-হাইড্রক্সিট্রিপটামিন বা সেরাটোনিন: ইঁদুরে টার্পিন প্রয়োগ করে প্লুরা বা ফুসফুসের আচ্ছাদন বা প্লুরাতে প্রদাহ সৃষ্টি করে দেখা গিয়েছে যে প্রদাহের প্রাথমিক অবস্থায় 5-হাইড্রক্সিট্রিপটামিন আসে। মনে করা হয় যে এটা প্লেটলেট বা একনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট মাষ্ট কোষ (Mast cell) থেকে আসে। রক্তবাহন নালিকায় এর দ্বারা স্ফীতি বা সঙ্কোচন দুই হতে পারে। অবশ্য এর কোনটা যে হবে সেটা নির্ভর করে পরিমাণের উপর অথবা প্রাণী বিশেষের উপরে।

এ্যাড্রিন্যেলিন: ডোপামিন বা ডোপার (DOPA) পূর্বসূরী। এতে শ্বেতকণিকার বার হয়ে আসার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। আবার মনো-এ্যামাইনো অক্সিডেজ বলে যে অনুঘটক আছে তাতে এ্যাড্রিন্যালিনের এই ক্ষমতা ব্যাহত হয়। সুতরাং এই অনুঘটকও প্রদাহস্ফীতিতে কোন না কোন ভূমিকা নেয় বলেই মনে হয়।

কাইনিন: তাথাকথিত কাইনিন বহু রকমের। এগুলির সঠিক কার্যপদ্ধতি জানা নেই। তবে রক্তবাহনের ক্ষুদ্রনালিকাগুলি স্ফীতিতে যে সাহায্য করে, তাতে সন্দেহ নেই। যেমন, বোলতার হুলে বিশেষ কাইনিনই জায়গাটার স্ফীতির কারণ।

লিউকোট্যাক্সিন: ঠিক এই জাতের একটি বস্তু। এর ক্ষমতা হল শ্বেতকণিকাদের টানা ও রক্তনালিকা থেকে শ্বেতকণিকাগুলিকে বাইরে আসতে সাহায্য করা। তবে বর্তমানে মনে করা হয় যে এটি একক বস্তু নয়। একাধিক বস্তু মিশিয়ে তৈরি।

কাইনিন প্রস্তুতির অনুঘটক: ক্যালিক্রিন নামে এক অনুঘটক আছে যা ব্র্যাডিকাইনিন প্রমুখ বিভিন্ন কাইনিনের জনক। রক্ত জমাট বাঁধাতে যে ফ্যাকটার 12, ও তাকে উত্তেজনা দিয়ে তৈরি করার যে সিঁড়ির মত ধাপগুলি আছে, তাই কাইনিন তৈরি হবার কাজে লাগে। এ থেকে প্রদাহস্ফীতিতে কাইনিনের ভূমিকা যে আছে তা জানা যায়।

গ্লোবিউলিন ভেদ্য পদার্থ: স্বাভাবিক প্লাজমায় রক্তনালিকাকে বেশী ভেদ্য করে তুলবে, এমন বস্তু আছে। রক্তের অপেক্ষাকৃত তরল অবস্থায়

ভেদ্যতা বাড়ে। রক্ত জমাট বাঁধার যে ফ্যাকটার-12 আছে, তাই কাঁচের সংস্পর্শে এসে, অপেক্ষাকৃত তরল অবস্থায় এই ভেদ্য পদার্থকে প্রকাশ করে।

প্লাসমিন ঃ প্লাসমিনোজেন রক্তের প্লাজমায় একটি প্রোটিন। এই থেকে তৈরি হয় প্লাজমিন। প্লাজমিন ফাইব্রিনকে হজম করে, শিরা ধমনীর ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে। কাইনিনোজেন ভেঙ্গে কাইনিন তৈরি করে।

শ্বেতকণিকাগুলি প্রদাহস্ফীতিতে একাধিক বস্তু নিঃসরণ করে। এর মধ্যে অনেকগুলিই হল লাইসোজোম থেকে বার হয়ে আসা অনুঘটক। ভেদ্যতা বাড়াতে, পারে এমন কিছু বস্তু বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট শ্বেতকণিকাগুলি নিজেরা তৈরি করে। যখন কোন বস্তুকে খাদ্য হিসাবে গ্রাস করে, তখনই ভেদ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে এমন বস্তুরও উদ্ভব হয়।

প্রষ্টাগ্ল্যানডিন ঃ মনুষ্যবীর্যে এই বস্তুর প্রথম খোঁজ পাওয়া যায়। প্রষ্টেট গ্ল্যাণ্ডে এই বস্তু পাওয়া গেছে। এর কাজও বহুপ্রকার। স্নায়ুর চালিকাশক্তি থেকে আরম্ভ করে, গর্ভ রক্ষা থেকে সন্তান জন্মের সময়ে জরায়ুর সঙ্কোচন পর্যন্ত, বিভিন্ন কাজই প্রষ্টাগ্ল্যানডিনের কাজ বলে মনে করা হয়। এ বস্তু পাওয়াও গেছে বহু স্থানে। প্রষ্টাগ্ল্যানডিন তৈরির উপযুক্ত অনুঘটক রক্তের প্লেটলেট কণিকারা তৈরি করে। আবার দেখা গেছে এস্পিরিন কি ইন্দোমেথাসিন প্রষ্টাগ্ল্যানডিন তৈরিকে ব্যহত করে। এ কথা মনে করা হয় যে, প্রষ্টাগ্ল্যানডিন ও বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট শ্বেতকণিকার লাইসোজোমের নিষ্কাষিত বস্তু প্রদাহস্ফীতির দ্বিতীয় স্তরে কাজ করে।

নিউক্লিয়িক এ্যাসিড জাত বস্তু ঃ প্রদাহস্ফীতিতে নিউক্লিয়িক এ্যাসিড ভেঙ্গে তৈরি, এ রকম অনেক জিনিস পাওয়া যায়। যেমন ইনোসিন বা ইনোসিনিক এ্যাসিড, নিউক্লিয়োটাউড ভেঙ্গেই পাওয়া যায়। এ বস্তুতে হিষ্টামিন বার হয়ে আসে। শিরা কি ধমনীপ্রাচীরের ভেদ্যতাও এতে বাড়ে। তা ছাড়া এ্যাডিনেসিন হিষ্টামিনের আহ্বায়ক না হলেও ভেদ্য-শক্তিকে বাড়ায়।

এ ছাড়াও প্রদাহস্ফীতিতে আরো অনেক বস্তুই পাওয়া যায়। এগুলি হল, এ্যাসিড বা এ্যালকেলাইন অবস্থায় শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি বা হ্রাসক সাহায্য করে এমন বস্তু, পেক্রোসিন, পাইরেক্সিন, একডুভিন ইত্যাদি বস্তু। এর মধ্যে কোনটি জ্বরের উৎপাদক, কোনটি মৃত কলায় পাওয়া যায়। তাছাড়া

ল্যাকটিক এ্যাসিড, জখম হয়েছে এমন সব কলাতে থাকে। ল্যাকটিক এ্যাসিড, রক্তনালিকাকে স্ফীত ও তার প্রাচীরের ভেদ্যতা বাড়াতে পারে।

বিশেষ ধরনের বীজাণু প্রদাহস্ফীতির রূপের পরিবর্তন করতে সমর্থ। যেমন, যে বীজাণু গ্যাস গ্যাংগ্রিনের জনক, তারা নালিকা প্রাচীরের ভেদ্যতা বাড়ায়।

প্রদাহস্ফীতি, এমনই এক বিষয় ও জীবদেহে এর ক্রিয়াকাণ্ডও এত বিচিত্র যে, বলা যায় যে আজও আমরা এর অনেক কিছুই সঠিকভাবে জানি না ও বুঝি না। এই বিষয়ে গবেষণায়, আরো জানতে পারলে, আমরা রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আরো অনেক কথাই জানতে পারব।

বীজাণুরা রোগ উৎপাদন যে করে, তার পদ্ধতি দুটি। এর একটি হল, যাকে বলা হয় সংক্রমণ (infection)। এতে বীজাণু শরীরে প্রবেশ করে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। আর তা না হলে, প্রাণীদেহের বাইরে সেই বীজাণুদের তৈরি বিষ বা বিষাক্ত বস্তুর দ্বারা প্রাণীর ক্ষতি করে।

আমরা ফুড পয়জনিং বা খাদ্য বিষাক্ত হওয়া বলতে যা বুঝি, তা পরবর্তি পর্যায়ে পড়ে। বটুলিনাস, অথবা ষ্টাফাইলোকক্কাস দ্বারা খাদ্য বিষাক্ত হওয়া যে আমরা দেখি, সেগুলি এই পর্যায়ের।

কিন্তু রোগের আক্রমণ বলতে আমরা যা বুঝি, সে আক্রমণ রোগ উৎপাদনকারী বীজাণুরই আক্রমণ ও তাদের দেহের ভিতরে ঢুকে বংশবৃদ্ধি। যে বীজাণু রোগ উৎপাদন করে, তাকে আমরা বলি রোগবীজাণু। কয়েকটি প্রজাতীগত ও বিপাকক্রিয়াঘটিত ব্যাধি ছাড়া অধিকাংশ ব্যাধিই সংক্রমণ সঞ্জাত ব্যাধি। সংক্রমণ ঘটে বাইরে থেকে। এখানে হয় বীজাণুগুলি প্রাণীর শরীরে, যে কোন উপায়েই হক ঢুকে যাচ্ছে, অথবা শরীরের ভিতর বা বাহিরগাত্রে ঢোকার আগে অবস্থান করে, তারপর প্রবেশপথ করে নেয়। অবশ্য কখনো প্রবেশপথ হয়ত করে উঠতে পারে না, এমনও হয়।

বীজাণু কিভাবে প্রবেশ করে?

প্রবেশ করার উপায় বহু।

চামড়ার মধ্যে দিয়ে: চামড়ার কোন ক্ষতের মধ্যে দিয়ে ষ্ট্যাফাইলোকাস, কোন সংবাহকের দ্বারা বাহিত ও নীত হতে পারে। এইভাবেই সিফিলিস, গনোরিয়ার মত যৌন ব্যাধি বাহিত হয়। হাসপাতালের বাতাসে বহু রোগবীজাণু ভেসে বেড়ায়। তা থেকে ক্ষতে বীজাণুর অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে।

কণিকা ও ধূলিকণার সাহায্যে: ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিংকাশি, বিভিন্ন ভাইরাসজাত ব্যাধি, ম্যানিনজাইটিস, ডিপথিরিয়া, ষ্ট্রেপটোকক্কাসজাত গলার অসুখ, ইত্যাদি কণিকা ও ধূলিকণার সাহায্যে সংক্রমিত হয়।

সংক্রমণ সম্ভব কণিকা, কিভাবে উৎপন্ন হয়, তা নিয়েও গবেষণা হয়েছে।

মনে করা হয়, মিউকাস বাহক উপরতল দিয়ে যখন বাতাস বয়ে যায়, তখন অতি সূক্ষ্ম কণিকায় এর ভিতরকার পদার্থগুলি এমনকি বীজাণুও যেতে পারে। খুব ছোট কণিকাগুলি, শুষ্ক অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাতাসে ভেসে থাকতে পারে।

কথা বলা, হাঁচি, কাশি, এই সবকিছু থেকে অনুরূপ সংক্রামক কণিকার উদ্ভব হতে পারে। মাম্‌স ও বসন্ত রোগের সংক্রামক কণিকা লালা থেকে আসতে পারে। তবে গলায় (স্ট্রেপটোকক্কাস পায়োজেনেস), ফুসফুসে (টিউবারকুলোসিস জীবাণু) ইত্যাদি সাধারণভাবে সংক্রমণ কণিকায় বাহিত হবার সম্ভাবনা কম।

খাদ্যের মাধ্যমে সংক্রমণ : যে নিজে কোন বীজাণুর বাহক, এমন কোন মানুষের দ্বারা খাদ্য সংক্রামিত হতে পারে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল টাইফয়েড। অবশ্য মাছি বা অন্য পতঙ্গদের দ্বারাও খাদ্য সংক্রমিত হতে পারে। টাইফয়েড, আমাশায় পোলিওমাইলাইটিস, ইত্যাদি রোগ খাদ্যের মাধ্যমে ছড়ায়। প্রাণীটি নিজে অসুস্থ হলে, তার ডিম, দুধ, ইত্যাদির মধ্যে বীজাণু থাকতে পারে।

হুল বা অনুরূপভাবে সংক্রমণ : কিছু কিছু ভাইরাস কোন বিশেষ পতঙ্গের দ্বারা ওইভাবে বাহিত হয়।

গর্ভের ফুল মাধ্যমে : সিফিলিস, ও কোন কোন ভাইরাস গর্ভের ফুলের মধ্যে দিয়ে সংক্রমিত হতে পারে।

যেসব বিভিন্ন পথে সংক্রমণের কথা উপরে বলা হল, সেই সব জায়গার সংক্রমণ প্রতিরোধের কি স্থানীয় ব্যবস্থা আছে? কারণ স্থানীয় ব্যবস্থা ও সামগ্রিক ব্যবস্থা একযোগেই তো রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা, যা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষ পেয়েছে।

চামড়া : শরীরের বাইরে চামড়া। তাই ছোট-বড় সব রকমের আঘাত সামলানোর কাজটা চামড়াকেই করতে হয়।

প্রতিরোধ ক্ষমতা : চামড়ার একেবারে বাইরে কেরাটিন আছে, এক রকম শক্ত জিনিস। সব চেয়ে নিচে, অর্থাৎ ভিতরের দিকে থাকে যে ভূমিপট, (basement membrane) তা যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহলে আর সংক্রমণ এড়ানো যায় না। অতিরিক্ত ঘামে কেরাটিন ক্ষতিগ্রস্থ হলে সংক্রমণ

হয়। এই জন্য গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অথবা বগলের তলায় ফোড়া এত বেশী হয়।

চামড়া ছিঁড়ে না গেলে বীজাণু অনুপ্রবেশ করতে পারে না। কোন কোন বীজাণু যেমন প্লেগ, টাইফাস, পীতজ্বর, ম্যালেরিয়া, এগুলি বিশেষ বিশেষ বীজাণুগুলিকে কামড় বা হুল ফুটিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে দেবার জন্যই হয়।

চামড়ার আত্মপরিশুদ্ধির ক্ষমতাও আছে। পরীক্ষামূলকভাবে চামড়ায় বিশেষ সংখ্যায় বীজাণু লাগিয়ে দিয়ে, মাঝে মাঝে তুলি করে কতগুলি বীজাণু রইল, তা পরীক্ষা করলে, বীজাণুর সংখ্যা কমতে দেখা যায়। দশ মিনিটের মধ্যেই বীজাণুর সংখ্যা কমতে সুরু করে ও ঘণ্টা তিনের মধ্যে বীজাণুশুন্য হয়ে যায়। মনে করা হয় যান্ত্রিক, প্রাণীতাত্ত্বিক, ও রাসায়নিক কারণেই এটা ঘটে।

যান্ত্রিক কারণ বলতে, চামড়ার বাইরের স্তর ঝরে যাচ্ছে ও সেই সঙ্গে বীজাণুরা চলে যাচ্ছে এটা বোঝায়। তা ছাড়া চামড়াটা শুকনো হয়ে গেলেও বীজাণু মরে যাবার ফলে জায়গাটা বীজাণুশুন্য হতে পারে।

প্রাণীতাত্ত্বিক কারণ ঃ চামড়ায় কিছু বীজাণু আছে, তারা চামড়ার বাসিন্দা। এরা হল, ষ্টাফাইলো এলবাস, ডিপথিরয়েড ইত্যাদি। কিছু লোক ষ্টাফাইলো পায়োজেনেস, ইত্যাদির বাহক। এই বীজাণু ও অনুরূপ কিছু বীজাণু, অন্য বীজাণুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তাদের বিনাশ করে।

রাসায়নিক কারণ ঃ একাধিক। ঘামের pH এ্যাসিড হওয়ার কারণে চামড়ায় বেশীর ভাগ বীজাণু জন্মাতে পারে না। ঘামে ল্যাকটিক এ্যাসিড আছে বলে, তা বীজাণুনাশকের কাজ করে। ঘামের এ্যাসিড বা অম্ল ভাবটা বেড়ে এর $pH = 3$ পর্যন্ত নামতে পারে। তবে শরীরেই আবার কোন কোন জায়গা আছে, যেমন বগল, কুঁচকি, আঙ্গুলের গলি, এসব জায়গার pH ক্ষার বা এলকেলি পর্যায়ের।

অসংপৃক্ত চর্বিজাতীয় এ্যাসিড শরীরে অনেক জায়গাতেই থাকে। এগুলি বীজাণুনাশক। কিছু কিছু ডিপথিরয়েড বীজাণু এই পরিবেশ ভালবাসে।

খাদ্যনালি ঃ মুখ ও গলা ; চামড়ার অন্য জায়গার মতই আত্মরক্ষার ব্যাপারে এসব জায়গার কাজকর্ম নির্বাহ হয় একইভাবে।

দাঁত যেখানে মাড়িতে প্রবেশ করেছে, আর টনসিলের চারিধার, এই

দুটি সংযোগস্থল বলে এ জায়গার দুর্বলতা বেশী। এইজন্য এই দুটি জায়গা দিয়ে বীজাণুর অনুপ্রবেশ সহজ হয়। তবে আবার দাঁত তোলারও পরে, যেভাবে দাঁতের গোড়া রোগ থেকে আত্মরক্ষা করে; তাতে ওইখানের বিশেষ কলার নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যে আছে, সেটাই মনে হয়।

বীজাণুনাশনঃ যান্ত্রিক দিক থেকে বলা যায় যে, মুখের মধ্যে যে লালা নিঃসৃত হচ্ছে, তার গতি সর্বদাই ভিতরের দিকে। গিলে ফেলার জন্য তাই মুখগহ্বর থেকে বীজাণু ও অন্য সব কিছুই দূরীভূত হচ্ছে।

জৈবিক দিকঃ চামড়ার অন্য জায়গার মত, বিভিন্ন ধরনের বীজাণুর উপস্থিতি, বীজাণুদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার জন্য কোন একটি বিশেষ বীজাণুকুল বেশী সুবিধা আদায় করে নিতে পারে না।

রাসায়নিক দিকঃ লালাতে মিউসিন, লাইসোজাইম, ও বিভিন্ন এ্যান্টিবডি থাকায়, তা রোগ আক্রমণে বাধা দেয়। এর মধ্যে যে লাইসোজাইমের কথা বলা হল, তার মধ্যে একটি বিশেষ অনুঘটক, মিউরামিডেজ থাকে। বীজাণু-দেহে ওই নামে যে পদার্থ থাকে, তার উপরে ওই অনুঘটকের কাজ। এইভাবে লাইসোজাইম অনেক বীজাণুকে নষ্ট করতে পারে, তবে তার অধিকাংশই রোগবীজাণু নয়।

এ্যান্টিবডি, যে ধরনের গামা-গ্লোবিউলিন তা আমরা পাই অশ্রু, প্রস্রাব বা মাতৃদুগ্ধের পূর্বাবস্থা যাকে কলোস্ট্রাস বলে, তার মধ্যে অথবা স্বেদ, ইত্যাদিতে। এগুলি থাকা সত্ত্বেও, কিছু কিছু বীজাণু যেমন হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি, স্ট্রেপটোকক্কাস পায়োজেনিজ ইত্যাদি বীজাণু, এ প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে রোগ আক্রমণের সূচনা করে।

লালাগ্রন্থীঃ স্বাভাবিকভাবে লালার সৃষ্টি ও চলাচল, কোন কারণে রুদ্ধ হলে, মুখগহ্বরে খাবারের টুকরা ইত্যাদি জমা হয়ে থেকে, নানা বীজাণুর আক্রমণ সহজ করে তোলে।

পাকস্থলীঃ যান্ত্রিক দিক থেকে দেখলে, বমনের সাহায্যে পাকস্থলী, যে বস্তুই তার গ্রহণযোগ্য নয়, তাকেই বমি করে বার করে দিতে পারে। কিন্তু এটা কোন ব্যাপক প্রতিরোধ ব্যবস্থা নয়। তবে এও ঠিক যে পাকস্থলীর এ্যাসিড বা অম্লতার জন্য সেখানে বীজাণু থাকে না।

রাসায়নিক দিক থেকে দেখলে পাকস্থলীর ভিতরের হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডই বীজাণুনাশক। তাতে যে অনুঘটক আছে, তার সে ক্ষমতা নেই।

তবে অম্লতা হ্রাস পেলে, বা না থাকলে, আর তার বীজাণুনাশক ক্ষমতা থাকে না। বহু বীজাণুই যে সময়টুকুতে অম্লতা হ্রাস পাচ্ছে, সেই সময়ের সুবিধা নিয়ে পাকস্থলী পার হয়ে যায়। এইভাবেই এণ্টামিবার সিস্ট পাকস্থলীর অম্লতার বাধা পার হয়ে যায়। টিউবারকুলোসিস বীজাণুর চারিদিকে মোমের মত একটা দেয়াল আছে। এইজন্য তারাও পাকস্থলীর বাধা পার হয়ে যেতে পারে।

অন্ত্র ঃ পাকস্থলী পার হয়ে গেলে অন্ত্রের আর খুব একটা রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। দেখা গেছে ইউরোপের লোকেরা যখন প্রাচ্যে আসে, তাদের পাকস্থলীর অম্লতা কম হয়ে যাবার জন্য, তারা প্রায়ই নানাবিধ পেটের অসুখের শিকার হয়ে পড়ে।

যান্ত্রিক বাধা ঃ দেখা গেছে যে, যদিও তন্ত্রের সুস্থ প্রাচীর বীজাণু প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে, তবু টাইফয়েড কি টিউবারকুলোসিসের বীজাণু ঐ বাধা পার হয়ে যেতে পারে সেই সব কোষের সহায়তায়, যারা এই বীজাণু-দের গ্রাস করে ভিতরে নিয়ে যায়। এই উপায়ে যেমন রোগও হতে পারে, তেমনি রোগ না হলে এই কোষগুলির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও (immunity) বৃদ্ধি পায়।

বীজাণু দূরীকরণ ঃ যান্ত্রিক দিক ঃ পেটের অসুখ হয়ে যখন বার বার পায়খানা হয়, তখন বীজাণুগুলিকে বার করাটাই এত পায়খানার আসল লক্ষ্য।

জৈবিক দিক ঃ ক্ষুদ্র অন্ত্রে জীবাণুর সংখ্যা খুবই কম। তবে বৃহদন্ত্রের বীজাণু প্রচুর। এখানে কোলাই ও মলাশয় বা পায়ুস্থিত বহু বীজাণু থাকে। অবশ্য খাদ্যাভ্যাস অনুসারে এই বীজাণুর ধাঁচ ও ধরনের বদল হয়। এইসব বীজাণুদের মধ্যে অনেকে আবার কোলিসিন নামে একটি বহুবীজাণুর নাশক-বস্তু তৈরি করে।

বিশেষ বীজাণুনাশক ওষুধ প্রয়োগ করলে আবার হয়ত অন্য বীজাণু আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। যেমন, স্বাভাবিকভাবেই গিনিপিগ কলেরায় আক্রান্ত হয় না। কিন্তু গিনিপিগকে ষ্টেপট্রোমাইসিন খাওয়ালে, তার এই প্রতিরোধ ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যায় ও তখন এদের অন্ত্রে কলেরা বীজাণু জন্মাতে ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে। অন্ত্রে পিত্তরস, ও তার মধ্যে যে লবণ আছে, তা ভাইরাসজাতের বহু বীজাণু ধ্বংস করে ফেলে।

অশ্রুসৃজক গ্রন্থীতে বীজাণুর আক্রমণ কমই হয়। অশ্রুতে বিবিধ লাইসোজাইমের উপস্থিতির জন্যই এটা সম্ভব হয়।

কাণের খোলে বীজাণুর আক্রমণ সহজেই প্রতিহত হয়।

শ্বাসযন্ত্র : নাসিকা ও ফ্যারিংস যান্ত্রিক দিক থেকে নাসিকা ফ্যারিংস প্রভৃতি জায়গার কোষে কোন বিশেষ যান্ত্রিক বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। এইজন্যই রাইনো কিংবা এডিনো ভাইরাস খুব সহজে আক্রমণ করতে পারে।

প্রতিরোধ : প্রতিরোধ হিসাবে এসব বীজাণু বার করে দেবার চেষ্টা হয় হাঁচির মাধ্যমে। যদি নাকে বীজাণু প্রবেশ করে, সেই বীজাণু মিনিট পনেরোর মধ্যে বার হয়ে যায়। মিউসিন আছে নাসিকার ও শ্বাসনলীর স্রাবে। এর বীজাণুনাশক ক্ষমতাও যথেষ্ট। তাছাড়া এতে এ্যান্টিবডি, লাইসোজোম ইত্যাদি থাকে। কিন্তু তবু কিছু বীজাণু, যেমন ম্যানেনজাইটিস, অথবা ডিপথিরিয়া বীজাণু, নাকে বাসা বেঁধে থাকতে পারে। এইজন্য কেউ কেউ এইসব বীজাণুর বাহক হয়ে গিয়ে, অন্যকে আক্রমণে সাহায্য করে।

শ্বাসনলী ও শ্বাসযন্ত্রের নিচের পর্যায়গুলি : যান্ত্রিক বাধা : স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বাসনলীর নিচের দিক বীজাণুশুন্য হবার কথা। কিন্তু বীজাণু প্রবেশ করে গেলে আর তার উপর বাধা সৃষ্টি করার উপযুক্ত ব্যবস্থা কিছু নেই।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা : কাশি একটি পরাবর্তের (reflex) অধীন। এর কাজ হল, বীজাণু হক, অন্য কোন ক্ষতিকর পদার্থ, যাই হক না কেন, তাকে শ্বাসযন্ত্রের বাইরে বার করে দেয়া। ট্রেকিয়া বা শ্বাসনলী যতই ভাগ হয়ে ও ভিতরে যাচ্ছে, ততই তা সূক্ষ্ম হয়ে যাচ্ছে আকারে অর্থাৎ ব্যাসে। এর ফলে যে বাতাস যাচ্ছে, শ্বাসনলীর ভিতর দিয়ে, তারও গতি কমে যেতে থাকে। এ জন্য কণিকামাত্রই আটকে যেতে থাকে মিউসিন আছে যে জায়গায়।

এই মিউসিন শুধু যে কণিকাদের আটক করে তাই নয়, শরীরের ক্ষতিকর বায়বিয় পদার্থ যেমন SO_2 কোষের উপরস্থ রোম বা সিলিয়াগুলিকে আন্দোলিত করে। এই আন্দোলনের ফলে ক্ষতিকর পদার্থ ভিতরের দিকের বদলে বাইরের দিকে যেতে বাধ্য হয়।

এই স্বাভাবিক কাজে কোন বাধা সৃষ্টি হলেই রোগবীজাণুর আক্রমণ সহজ ও সম্ভব হয়। এটাই দেখা যায় ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হলে, অথবা ক্যানসার

কি শ্বাসনলীতে কোন বাধা সৃষ্টি হলে। এর ফলে সিলিয়া বা কোষরোমের কাজ ব্যাহত হয়।

অবশ্য সব রোগ প্রতিরোধে সিলিয়ার কাজ বেশী নয়। এর চেয়ে অনেক বেশী কাজ ম্যাক্রোফাজ ইত্যাদি কোষের। এই কোষগুলি বীজাণুগুলিকে গ্রাস করে, তাদের নষ্ট করে। এর শক্তিটা আসে অক্সিজেন বিপাকের মাধ্যমে।

প্রস্রাবযন্ত্র ঃ দেখা গেছে প্রস্রাবে কিছু কিছু বীজাণুনাশক পদার্থ থাকে। প্রস্রাব যে এ্যাসিড বা অম্লভাবাপন্ন, এটাও এ বীজাণুনাশকতার একটা কারণ। প্রস্রাবযন্ত্রের মধ্যে যে কোন জায়গায় কোন বাধা, যেমন প্রষ্টেট বৃদ্ধি, পাথুরি রোগ ইত্যাদিতে পথের বাধা সৃষ্ট হলে, বীজাণু আক্রমণ সহজ হয়। তবে এ বীজাণু রক্তস্রোতে বাহিত হয়ে আসে। কিডনী বা বৃক্ক প্রথমে আক্রান্ত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ঃ যোনির $pH = 4{\cdot}3 — 5{\cdot}5$। ডোডারলাইন বীজাণু গ্লাইকোজেনকে ভাঙ্গলে তবেই অম্লতা সৃষ্ট হয়। এটা ল্যাকটিক এ্যাসিড। ইষ্ট্রোজেনই আবার গ্লাইকোজেনের জনক। তাই তরুণী বয়স ছাড়া অল্প বা বেশী বয়সে যোনিতে বীজাণুর আক্রমণ বেশী।

7

বীজাণু আক্রমণ ও শরীরের সাড়া

বীজাণু একবার শরীরে প্রবেশ করলে, তারপর যে কি ঘটবে, তা নির্ভর করে প্রধানতঃ দুটি জিনিসের উপরে। এর একটি হল, শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা, আর অন্যটি হল বীজাণুগুলি কতটা মারাত্মক, তার উপরে। এর ফলে একাধিক জিনিস ঘটতে পারে।

1. বীজাণুগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

2. বীজাণুগুলি কিছুক্ষণ বৃদ্ধি পেয়ে, তারপর মরে যেতে পারে। রোগটা এ অবস্থায় মারাত্মক না হয়ে মৃদুই থাকে।

3. বীজাণুরা আশ্রয়দাতার দেহে সহ-অবস্থানে থাকতে পারে। এর উদাহরণ হল হার্পিসের ভাইরাসের দেহের অভ্যন্তরে থাকা।

4. স্থানীয়ভাবে বীজাণুরা সংখ্যাবৃদ্ধি করে, স্থানীয়ভাবেই সেই জায়গাটার ক্ষতি করতে পারে। এর উদাহরণ হল, কোন জায়গায় ফোড়া।

5. বীজাণুরা বিশেষ জায়গায় বৃদ্ধি পেয়ে তাদের বহিরঙ্গের বিষ বা টক্সিনের (exotoxin) সাহায্যে সারা দেহের উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। এর উদাহরণ ডিপথিরিয়া, টিটেনাস।

6. আক্রমণটা স্থানীয়। কিন্তু বীজাণুগুলি ছড়িয়ে পড়তে পারে। যেমন ষ্ট্রেপটো পায়োজেনসের সেলুলাইটিস।

7. কোন স্থানীয় ক্ষতি না করে বীজাণুগুলি ছড়িয়ে পড়তে পারে। উদাহরণ ঃ টাইফাস।

8. প্রথমে কোন স্থানীয় ক্ষতি না করে বীজাণুগুলি ছড়িয়ে পড়ে, তার পরে প্রবেশস্থানেই মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করে। উদাহরণ হল, সিফিলিস, টাইফয়েড।

19. বীজাণুরাই কোষবৃদ্ধির সূচনা করে। এর উদাহরণ হল রুস সারকোমা ভাইরাস। বসন্তে, প্রথমটায় কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধি, কিন্তু পরে সেই কোষগুলিই নেক্রোসিস হয়ে মরে যায়।

এ ছাড়াও যে ইতরবিশেষ থাকে না, তা নয়। কলেরায় বীজাণুরা

অন্ত্রের মধ্যেই বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। তাদের টক্সিন কোষগুলিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। কিন্তু তবু ক্ষত ভিতরে যায় না।

দেখা গেছে যে যদি বীজাণুগুলি রোগ উৎপাদক না হয়, তারা শরীরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। ম্যাক্রোফাজ ও পলিমরফোসাইট ইত্যাদি কোষ তাদের গ্রাস করে নষ্ট করে দেয়। কোন কোন বীজাণু শুধু বিশেষ প্রাণীর দেহেই বৃদ্ধি পায়। যে বীজাণু রোগ উৎপাদন করে, সে রোগ কত মারাত্মক হবে, সেটা নির্ভর করে বীজাণুর উপর।

কোন বীজাণু কতটা মারাত্মক, সেটাও নির্ভর করে (1) কত তাড়াতাড়ি তারা ছড়িয়ে পড়তে পারে, (2) কতটা ক্ষতি করতে পারে, এই দুটির উপরে।

জখম বীজাণু, যাদের "L" ফর্মের বলা হয়, (লিষ্টার ইন্‌ষ্টিটিউটে দেখা গিয়েছিল বলে এই নাম দেয়া হয়েছিল) সেগুলির রোগ উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। কিন্তু তা না থাকলেও, শরীরে এদের উপস্থিতি রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (immunity) বাড়াতে পারে। তবে অসুবিধা এই যে, মারাত্মক নয় এই রকমের L বীজাণু আবার V বা মারাত্মক ধরনের বীজাণুতে পরিণত হয়, যখন তখন, বিশেষ করে শরীরে থাকতে থাকতে।

বীজাণুরা যে কিভাবে শরীরের ক্ষতি করে, সেই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আগে আলোচনা করেছি, বীজাণুর শরীর থেকে উৎপাদিত বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন নিয়ে। টক্সিন আবার দু' রকমের, ভিতরের ও বাহিরের। ভিতরেরটি শুধুমাত্র বীজাণুর দেহ ভেঙ্গে গেলে বার হতে পারে। আর বাহিরের যে বিষ বা টক্সিন, তা বীজাণু জীবন্ত অবস্থাতেও দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বলা যায় ঃ
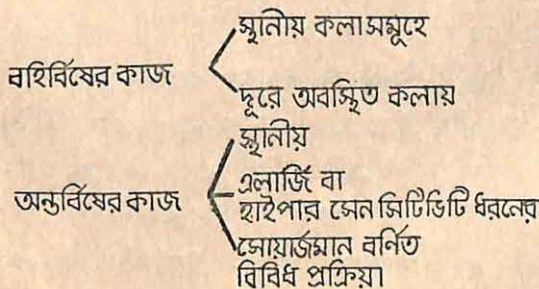
বীজাণুদের বহির্বিষ বা এক্সোটক্সিন কোন কোন ক্ষেত্রে এত শক্তিশালী

হতে পারে যে তা স্থানীয়ভাবেও ক্ষতি করে থাকে। এর উদাহরণ হল ডিপথিরিয়া, গ্যাস গ্যাংগ্রিন। তারপর এই টক্সিন রক্তের মধ্যে দিয়ে বাহিত হয়ে হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ুর ক্ষতিসাধন করতে পারে।

বীজাণুর বহির্বিষের কথা অনেকদিন থেকেই জানা। এগুলি জলে দ্রবিত হয়, এজন্য বীজাণু যখন কৃত্রিমভাবে চাষ বা কালচার করে রাখা হয়, সেই মাধ্যমের ভিতরে টক্সিন সঞ্চারিত হয়। সেখান থেকে পরিস্রুত, পরিচ্ছন্ন, এমনকি কেলাসীকৃত অবস্থায় এই টক্সিন পাওয়া সম্ভব। এর মধ্যে কোন কোনটির, যেমন বটুলিজমের বিষক্রিয়াই মারাত্মক হতে পারে।

কোন কোন বীজাণুর শরীরের বাইরে বিষ বার হয়ে আসে না, অথচ এ-সব রোগবীজাণু যখন শরীরে থাকে, তখন তাদের শরীরের ভিতরের বিষে শরীরকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এই বিষাক্ত বস্তুগুলি, যেগুলি বীজাণুর বাহির বা অভ্যন্তরীণ, যে ধরনের বিষই হক না কেন, তাদের মধ্যে থেকে প্রোটিন, শর্করা ও চর্বিজাতীয় বিভিন্ন ধরনের পদার্থ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

কোন বিশেষ বীজাণুর ভিতরের বিষ, এণ্ডোটক্সিন বীজাণুদেহ থেকে, তার দেহ না ভেঙ্গেই বার হয়ে আসতে পারে। ষ্টাফাইলোকক্কাসের কোয়াগুলেজ এর একটি উদাহরণ।

আক্রমণকারী বীজাণু কিভাবে শরীরের ক্ষতি করে, সেটা জানা দরকার। কারো কারো কাজকর্ম একেবারে সোজাসুজি। প্রদাহস্ফীতি ও নেক্রোসিস বা কলা বিশেষের সোজাসুজি মৃত্যু ঘটিয়েই তাদের কাজ। আবার কোন বীজাণুর ক্ষেত্রে কার্যকলাপ জটিলতর। যেমন টাইফয়েড।

টাইফয়েড: মানুষের টাইফয়েড সম্পর্কে আনুপূর্বিক ধারণা না থাকলেও ইঁদুরের এই রোগের সালমোনেলা-টাইফি-মিউরিয়াম নিয়ে বহু গবেষণাই হয়ে বহু তথ্যই জানা গেছে।

কিভাবে টাইফি-মিউরিয়াম ছড়ায়: খাদ্যনালীর মধ্যে দিয়ে গিয়ে বীজাণুগুলি ক্ষুদ্র অন্ত্রে পৌঁছে যায়। এখানে খাদক কোষগুলি এই বীজাণুদের গ্রহণ করে স্থানীয় লসিকাগ্রন্থীতে নিয়ে যায়। এখানে কোন ক্ষতির চিহ্ন দেখা যায় না। এই লসিকাগ্রন্থী থেকে লসিকানালিকার মধ্যে দিয়ে মেসেন্ট্রিতে অবস্থিত লসিকাগ্রন্থীতে যায়। সেখান থেকে বক্ষদেশের বৃহৎ লসিকানল (thoraeicduct)-এর মাধ্যমে রক্তস্রোতে যায়। এই সময়ে ক্ষণস্থায়ীভাবে হলেও রক্তে বীজাণু চলে গিয়ে রক্তে বীজাণুদূষণ সৃষ্ট হয়।

কিন্তু রক্তের এই অবস্থাটা রেটিকুলো-এণ্ডোথিলিয়ামের খাদক কোষ, যে কোষগুলি লিভার, প্লীহা অস্থির মজ্জায় থাকে প্রচুর, তারাই এই বীজাণু-দূষণ অবস্থা দূর করে। কিন্তু এই সময়ে, এইসব কোষের ভিতরে থেকেই বীজাণুরা বংশবৃদ্ধি করে যায়। দিন দশের মধ্যে এই কোষগুলির মৃত্যু হলে, রক্তে আবার আরো বেশী করে বীজাণুতে ভরে যায়। এই অবস্থায় রোগী বীজাণুর বিষ-প্রভাবে মারাত্মক অসুস্থতা, সেপটিক অবস্থায় পৌছয়। জ্বর ধাপে ধাপে বাড়ে, নাড়ী মন্থর, সারা শরীরে নানা উপসর্গ, শ্বাসনালীর প্রদাহ দেখা যায়। এই অবস্থায় রক্ত থেকে বীজাণু কালচার বা চাষ করা যায়।

রোগের পরবর্তী অবস্থায় ক্ষুদ্র অন্ত্রে ক্ষত দেখা দেয়। এই সময়ে মলে বীজাণুর আবির্ভাব হয়। ক্ষুদ্র অন্ত্রে বীজাণুরা পৌছয়, যকৃতে আসা রেটিকিউলো এণ্ডোথিলিয়াল কোষের মধ্যে দিয়ে। সেখান থেকে যায় পিত্তকোষে। তারপর পিত্তের মাধ্যমে পৌছয় গিয়ে ক্ষুদ্র অন্ত্রে। লসিকা-গ্রন্থীর যেগুলি বিশেষ অবস্থায় পায়ারস প্যাচ এই নামে অভিহিত, সেই জায়গায় ক্ষত হতে দেখা যায়। এই ক্ষতের চারিদিকে ও লসিকাগ্রন্থীতে
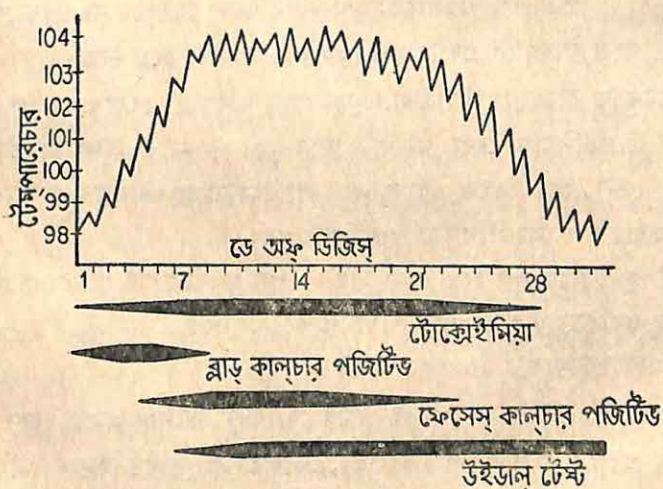
চিত্র 3

ম্যাক্রোফাজ অভিধায়ের কোষ দেখা দেয়। বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট পলিমরফোনিউক্লিয়ার কোষ থাকে না বললেই হয়।

দ্বিতীয় সপ্তাহে মলে বীজাণু থাকায় রোগের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়। এমন কি তা প্রস্রাবেও থাকতে পারে।

তৃতীয় সপ্তাহে বীজাণুদের প্রতিবস্তুর সংযোগে জমাট বাঁধানোর এ্যগ্লুটিনিন দেখা দেয় সিরামে। এই জমাট বাঁধাকে ভিডাল রিএ্যাকশান বলে (widal reaction)। এই অবস্থা রোগের বিরুদ্ধে শরীরের যুদ্ধাবস্থার প্রতীক। যুদ্ধ জয় হয়ে গেলেও পরবর্তী কালে প্রতিরোধ ক্ষমতারও প্রতীক এই ভিডাল কার্যক্রম। রোগের বিভিন্ন অবস্থায় কি পাওয়া যাবে, আর কি যাবে না, তা দেখা যাবে পাশের ছবিতে।

আক্রমণকারী অন্য বীজাণুদের ক্ষেত্রে কি হয়?

বসন্ত রোগের ভাইরাসও যে পথ দিয়ে প্রবেশ করল, তখনই সেখানে কোন ক্ষতের সৃষ্টি করে না। কিন্তু বংশবৃদ্ধির পরে যেখানে অধিষ্ঠিত হয় সেখানে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করে।

সিফিলিসের স্পাইরোকিট বীজাণুতেও ঢোকার রাস্তায় কিছু হয় না। তারা তখন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তার দু'তিন সপ্তাহ পরে, যেখান দিয়ে জীবাণু প্রবেশ করেছিল সেইখানে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। প্রথমে প্রদাহ না হওয়া ও পরে সেই জায়গাতেই তা হবার কারণ হিসাবে বলা হয় যে এই সময়ের মধ্যে জায়গাটা প্রদাহের উপযুক্ত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।

এনথ্রাক্স বীজাণুরা বিষক্রিয়ায় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়। দেখা গেছে যে আগে থেকে এ্যান্টিসিরাম দেয়া থাকলে আর মৃত্যু হয় না। কিন্তু এ্যান্টিসিরাম দিতে দেরী হয়ে গেলে, বীজাণুরা এ্যান্টিসিরামের প্রভাবে মরে গেলেও বিষক্রিয়াতে সংবেদনশীলতার জন্যই মৃত্যু হয়।

কিছু প্রদাহে পুঁজ হতে দেখা যায়। পুঁজ হওয়ার অর্থ হল যে দেহ চেষ্টা করছে প্রদাহকে এক জায়গায় সীমাবদ্ধ করে ফেলতে।

প্রদাহের আবার রকমফের আছে।

প্রদাহে সিরাম বা জলীয় বস্তুর আধিক্য অনেক সময় দেখা যায়। জলীয় প্রদাহে তরল পদার্থ যত থাকে, কোষ সে অনুপাতে কম। টক্সিন বা বিষের ক্রিয়ার জন্য অনেক সময় সিরাম রক্তের বা অনুরূপ জলীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে ক্ষরিত বলেই এ ধরনের প্রদাহ হতে দেখা যায়।

ফাইব্রিনপূর্ণ প্রদাহঃ তাতে রক্ত ও অন্য পদার্থকে যা জমাট বাঁধায় সেই ফাইব্রিনের আধিক্য থাকে। প্লুরিসি, পেরিকার্ডাইটিস, পেরিটোনাইটিস

ইত্যাদিতে এই ধরনের প্রদাহ দেখা যায়। কিছু বীজাণু, যেমন নিমোকক্কাস, ষ্টাফাইলোকক্কাস ইত্যাদিও এই ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি করে।

রক্তাক্ত প্রদাহঃ যে ধরনের আঘাতে শিরা ধমনীগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে প্রদাহের সঙ্গে রক্তক্ষরণও হয়, তাকেই রক্তাক্ত প্রদাহ বলে। এ ধরনের প্রদাহ এনথ্র্যাক্স বীজাণুর আক্রমণে দেখা যায়।

শ্লেষ্মাবাহী প্রদাহঃ যে সব জায়গায় শ্লেষ্মাবাহী ঝিল্লী আছে সেই জায়গায় প্রদাহ হলে এই ধরনের প্রদাহ দেখা যায়। সাধারণ সর্দিতে নাকে এই ধরনের প্রদাহ দেখা যায়।

পর্দা পড়া প্রদাহঃ যে জায়গায় প্রদাহ, সেই পুরো জায়গায় একটা পর্দা দিয়ে ঢাকা পড়ে যায়। যে অঙ্গটি ঢাকা পড়েছে পর্দাটা ঠিক তারই ছাঁচের হতে পারে ও সামগ্রিকভাবে বেরিয়ে আসতে পারে।

পুরো পর্দা না হলেও প্রদাহের সঙ্গে আংশিক পর্দা পড়তে দেখা যায়। এর উদাহরণ ডিপথিরিয়া কি শিগেলা বীজাণুর আক্রমণে দেখা যায়।

গ্যাংগ্রিনঃ প্রদাহের ফলে সে কলার মৃত্যু হলে, সেই প্রদাহকে গ্যাংগ্রিন-যুক্ত-প্রদাহ বলা হয়।

প্রদাহের একটি বিশেষ দিক বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট যে শ্বেতকণিকা, তাদের সংখ্যাধিক্য। এমন কি পরীক্ষাধীন প্রাণীর ক্ষেত্রেও এটা দেখা যায়। কিন্তু কিছু কিছু বীজাণু আছে যারা একনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট শ্বেতকণিকা-দেরই আবাহন করে থাকে। এর উদাহরণ টাইফয়েড ও কোন কোন ভাইরাস। কিন্তু এইটাই আশ্চর্য যে, টাইফয়েড বীজাণু, যারা পরীক্ষাকালে বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত শ্বেত কণিকাগুলিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু রোগে যে এটা দেখা যায় না, তার কারণ হিসাবে অতিসংবেদনশীলতা বা হাইপারসেনসিভিটিকেই দায়ী করা হয়। এতে একনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষেরই প্রাধান্য থাকে।

কোন বিশেষ ধরনের প্রদাহে ইয়োসিন রঞ্জিত শ্বেতকণিকার প্রাধান্য দেখা যায়। এস্কেরিস ইত্যাদি কৃমির উপদ্রবে, অথবা বিভিন্ন এ্যালার্জিতে এটা দেখা যায়। এর সঠিক কারণ জানা নেই। তবে মনে করা হয়, থাইমাস, যে গ্রন্থীর কাজ লিম্ফোসাইট কোষ উৎপাদন করা, বিশেষ উত্তে-জকের প্রভাবে ইয়োসিন রঞ্জক বা ইয়োসিনোফিল কোষও উৎপাদন করে। এটা পরীক্ষায় ইঁদুরের থাইমাস বাদ দিয়ে দেখা গেছে।

ইয়োসিন রঞ্জক এই কোষগুলিতে দেখা গেছে যে হিষ্টামিন ও হিষ্টামিন-বিরোধী দু'রকমের বস্তুই থাকে।

বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট যে শ্বেতকণিকা দেখা গেছে যে তাদের দ্বারা বহু রোগবীজাণু বাহিত হয় ও তাদের ভিতরে কিছুটা বংশবৃদ্ধিও করে। কিন্তু তবু এ কথাও ঠিক যে এরাই আবার বীজাণুদের ধ্বংসও করে। লাইসো-সোমের অনুঘটক, এবং ক্যাটাওনিক প্রোটিন বলা হয়েছে, এমন কিছু কিছু বস্তু বীজাণু ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত। বীজাণু নষ্ট করার পর, অভ্যন্তরীণ গ্লাইকোজেন ভাঙ্গার ফলে, ল্যাকটিক এ্যাসিড তৈরি হয়। এই এ্যাসিড বীজাণুনাশক। pH এ্যাসিড পর্যায়ে নেমে গেলে ফ্যাগোসাইটিন, নামে একটি বস্তু লাইসোজোম থেকে বার হয়ে আসে, যা বীজাণু আগ্রাসনে সাহায্য করে। এ ছাড়াও নিউক্লিও-পারক্সিডেজ নামের অনুঘটকের সাহায্যে কোষ হাইড্রোজেন পারক্সাইড তৈরি করে নেয়।

একনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষও বীজাণু-নাশক। কিন্তু কিভাবে এ কাজ সেটা জানা নেই। তবে দেখা গেছে এদের মধ্যে ল্যাকটিক এ্যাসিড ও লাইসোম থাকে। মনে করা হয় এদের কাজ রেটিকিউলো এণ্ডোথিলিয়্যাল কোষের মাধ্যমে হয়।

কোষ ভিন্ন অন্য বাইরের তরল পদার্থের কাজ : বীজাণুভুক কোষগুলি থেকে ল্যাকটিক এ্যাসিড বার হয় বলে, কোষের বাইরে যে তরল পদার্থ, তার, pH, 5 পর্যন্ত নেমে গিয়ে এই pH-এ থাকতে পারে। এ জন্য দেখা যায় যে নাইট্রোজেন মাষ্টার্ড, যাতে শ্বেতকণিকার সংখ্যা কমে যায়, তাতে কোষের বাইরেটা এ্যাসিড হতে পারে না। সেই জায়গায় গ্লুকোজ দিলে এ্যাসিড হওয়াটা বাড়ে।

এইরকম বিরূপ আবহাওয়াতে শুধু যে বীজাণুরাই মরে তা নয়। এতে দেহকোষও মারা যাচ্ছে। একে যুদ্ধাবস্থার পোড়ামাটি নীতির সঙ্গে তুলনা করা যায়।

বীজাণু আক্রমণ ও প্রদাহের ফলে গ্লুকিউরোনিক এ্যাসিড বার হয়ে আসে। বিজাণুর কোন কোন বিষ বা টক্সিন এতে বিষক্রিয়া শুন্য হয়ে যায়। তা ছাড়া কিছু কিছু ভাইরাসও এই আবহাওয়াতে জন্মাতে বা বৃদ্ধি পেতে পারে না। সিরামের কম্প্লিমেন্টও এ কাজ করে।

বাইরে থেকে দেয়া রোগপ্রতিষেধক, যার মধ্যে এ্যান্টিসিরাম পড়ে, তা

শরীরে প্রবেশ করালে, তা তখনই যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে বীজাণু ধ্বংসের কাজে লেগে যায়। এর কাজও অনেকখানিই p'I কমিয়েই হয়। এর উদাহরণ ডিপথিরিয়ায় এ্যান্টিসিরাম প্রয়োগ। ডিপথিরিয়া বীজাণু pH-কে এ্যালকেলাইন করতে চাইছে। সেইখানে এ্যান্টিসিরাম, অন্য কাজের উপরে pH-কে এ্যাসিড পর্যায়ে নিয়ে বীজাণু নাশন করছে।

কিভাবে বীজাণুরা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা অতিক্রম করে ঃ ঐ উপায় একাধিক।

এর একটি হল ঃ এ্যান্টিবডিকে নিষ্ক্রিয় করবার ক্ষমতা ঃ প্রত্যেকটি বীজাণুর দেহের বহিরাংশে বিশেষ এ্যান্টিজেন আছে। সহজাত অবস্থায় থাকা সিরামের এ্যান্টিবডি জাতীয় প্রতিরোধ ক্ষমতাকে, বীজাণুর এই এ্যান্টিজেন প্রথমেই নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। বীজাণু কত পরিমাণ এ্যান্টিজেন ছাড়ছে ও আক্রান্তের সিরামে কতটা এ্যান্টিবডি আছে, এই দুয়ের প্রতি-যোগিতায় নির্ভর করে কোন্ পক্ষ জয়ী হবে।

বীজাণু গ্রাস করার ক্ষমতার প্রতিরোধ ঃ বীজাণুদেহের যে এ্যান্টিজেন, তার বিরোধী অপসোনিন (opsonin) যদি না থাকে, তা হলে বীজাণু গ্রাস করবার ক্ষমতা, যেটা শ্বেতকণিকার স্বাভাবিকভাবে আছে, সেই ক্ষমতার প্রতিরোধ ঘটে। ষ্ট্রেপটো ও ষ্টাফাইলোকক্কাস লিউকোসিডিন নামে শ্বেতকণিকার এক নাশক পদার্থ তৈরি করে।

এ ছাড়া থাকে আর একটি দিক ঃ এটি হল, বীজাণুরা যেন চায় আক্রমণের এলাকাটা ছড়িয়ে দিতে, আর প্রতিরোধকারী শ্বেতকণিকারা চায় আক্রমণের এলাকা সীমাবদ্ধ করতে।

রোগ আক্রমণের বিস্তার

স্থানীয় বিস্তার ঃ কলা কোষগুলি পরস্পরের গায়ে গায়ে লাগা। এর ফলে বীজাণুরা সহজে ছড়াতে পারে না। তাই বীজাণুই হক, আর কোন কণিকাই হক, একটা তরল মাধ্যম অবলম্বন করে, তবেই তারা এক জায়গা থেকে স্থানান্তরে যেতে পারে। তরল বস্তুর চলাচলের পন্থা তিনটি ঃ

1. ক্যাপিলারি বা কৈশিক রসনালিকাগুলির এক জায়গা সঙ্কুচিত ও অপর জায়গা স্ফীত হয়। সঙ্কুচিত জায়গা থেকে স্ফীত জায়গায় রস, রক্ত ও যে কোন কণিকা বাহিত হতে পারে।

2. হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন প্রসারণের ফলে যে পাম্পের মত কাজ হয়, তাতে শরীরের কোন এক জায়গায় কোন বস্তুই স্থির থাকতে পারে না।

3. পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ, সে পেশী ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক, যে কোন রকমেরই হক না, তাদের কার্যকলাপে বীজাণু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবাহিত হতে পারে। কোন জায়গায় প্রদাহ হলে, এই জন্যই স্মরণাতীত কাল থেকে তাকে বিশ্রামে রাখতে বলা হয়।

বলাই বাহুল্য, বীজাণু কতদূর যেতে পারল, তার উপরেই রোগ আক্রমণের ছড়ান নির্ভর করে। তবে এর ব্যতিক্রমও কম নয়। যেমন এ্যানথ্রাক্স। এর বীজাণু চলমান নয়। তবু এর প্রভাব ও বিস্তার সারা দেহে।

স্থানীয় প্রতিরোধঃ প্রদাহস্ফীতির সমগ্র ব্যাপারটাই বলা যায় আত্মরক্ষার জন্য ঘটে। তাই একে কেন্দ্র করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকবে। এ প্রতিরোধ স্থানীয়। প্রদাহ যেখানে, তার চারিধারে ফাইব্রিন জমে। এটা বিশেষ করে দেখা যায় স্ট্যাফাইলোকক্কাসের আক্রমণে। এতে একটা প্রত্যঙ্গ বা তার অংশ বিশেষ অনুরূপ আর একটির লেগে যেতে পারে।

স্ট্যাফাইলোকক্কাস কোয়াগুলেজ বলে রক্ত জমাট বাঁধায় অংশগ্রহণ করে, এ রকম একটি বস্তু তৈরি করে। এই বস্তুটি ফাইব্রিন তৈরি করতে সাহায্য করে। আবার কিছু কিছু বীজাণু আছে, যেমন স্ট্যাফাইলো পায়োজেনেস, যা স্ট্যাফাইলো কাইনেজ বলে একটি অনুঘটকের জন্ম দেয়। তাতে আক্রমণ আরো ছড়িয়ে পড়ে। ষ্ট্রেপটোকক্কাসের ষ্ট্রেপটোকাইনেজেরও কাজ অনুরূপ।

এই তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করে, মেনকিন বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, ফাইব্রিন তৈরি হবার মানেই হল স্থানীয় হলেও, এই বীজাণুর আক্রমণটা মারাত্মক।

শরীরের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ অঞ্চল থাকে। ঐগুলো হল পেরিটোনিয়াম বা উদরঝিল্লী, পেরিকার্ডিয়াম বা হৃদয় ঝিল্লী, প্লুরা বা ফুসফুস ঝিল্লী ইত্যাদি। হয়ত এ্যাপেণ্ডিক্সের প্রদাহ থেকে উদরঝিল্লীর প্রদাহ দেখা দিতে পারে। তবে দেখা যায় উদরঝিল্লীর যে ঝোলানো অংশ থাকে, যার নাম ওমেণ্টাম, তাই চারিদিকে একটা ঘেরা-টোপ তৈরি করে, রোগ আক্রমণটাকে ঘিরে এক জায়গায় বন্দী করে রাখতে চেষ্টা করে।

ঠিক এইরকম ভাবেই অন্যবিধ ঝিল্লীগুলিতে সংক্রমণ ছড়ায়। এ ছাড়া শ্বাসনলী, মূত্রনলী, ও অন্ত্রের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সংক্রমণ ছড়ায়।

লসিকার মাধ্যমে সংক্রমণের বিস্তার: রক্ত যে রকম সঞ্চালিত হয়, লসিকাও তেমনি সূক্ষ্ম নালিকা মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়। একমাত্র প্লীহা, অস্থি ও মস্তিষ্ক ছাড়া শরীরের সর্বত্র এই নালিকা আছে।

প্রদাহ হলে এই নালিকাগুলি ভিতর থেকে আসা চাপে খুলে যায়। সেই সঙ্গে নালিকা প্রাচীরের ভেদ্যতা বেড়ে যায়। আক্রমণকারী বীজাণুরা লসিকার মধ্যে সহজেই প্রবেশ করতে পারে ও নিকটতম লসিকাগ্রন্থীতে পৌঁছয়। যে সব বীজাণুভুক কোষ বীজাণুদের গ্রাস করেছে, কিন্তু ধ্বংস করতে পারেনি, তারাও এখানে পৌঁছয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল টিউবার-কুলোসিস। এদিক থেকে বলা যায়, এই গ্রন্থীগুলি প্রতিরক্ষায় দ্বিতীয় দুর্গ।

তথাকথিত রেটিকিউলো-এণ্ডোথিলিয়্যাল কোষ লসিকানালিকার কাছাকাছি থাকে। উত্তেজিত হলে এই কোষগুলি বিষাক্ত বস্তু ও বীজাণুকে নষ্ট করতে পারে।

লসিকাকে প্রতিরক্ষার কাজে ঠিক ফিলটারের মতন বলা যায়। বীজাণুরা এখানে আটকায়। এ জায়গাটা পার হতে পারলে, রক্তে পৌঁছে যায়।

রক্তের মধ্যে দিয়ে বিস্তার: রক্তস্রোতই বলা যায় প্রতিরক্ষায় শেষ ঘাঁটি। প্রতিরক্ষা এখানে এইভাবে সম্ভব হয়।

1. চলমান রক্তে বীজাণুনাশক বহু জিনিসই আছে। বীজাণু সংহারক যে কোষ, সেগুলি তো আছেই, তা ছাড়া বেশ কয়েকটি বীজাণু-বিরোধী বস্তু রক্তে আছে। বিশেষ বিশেষ বীজাণুর বিরুদ্ধে বিশিষ্ট এ্যান্টিবডি ছাড়া আছে কমপ্লিমেণ্ট, প্রপারডিন, অপসোনিন ইত্যাদি।

2. যাকে আমরা রেটিকিউলো এণ্ডোথিলিয়াল কোষ বলি, যে কোষ-গুলি লিভারে সাইনাস, অস্থির মজ্জা, প্লীহা, এইসব জায়গায় থাকে, তারা রোগ প্রতিরোধে বিশেষ সক্রিয়। দেখা গেছে এই কোষগুলি বীজাণুদের মোকাবিলা করে। দেখা যায় এ কোষ বীজাণু বা অন্য কণিকা গ্রাস করে। এটাই হল ঢোকার মুখে প্রতিরোধের প্রথম ধাপ।

রক্তের মধ্যে বিস্তার ছাড়াও বিস্তারের আরো কয়েকটি দিক আছে। এগুলি হল:

1. রক্তনালিকাগুলিকে আক্রমণ: যেমন ফোড়া হলে দেখি, কিছু বীজাণু আছে, যারা রক্তনালিকাগুলিও সরাসরি আক্রমণ করে। অবশ্য এ ধরনের বীজাণুর আক্রমণ খুব মারাত্মক না হলেও রক্তনালিকা জখম হয়ে বীজাণুরা ভিতরে প্রবেশ করে। দাঁত তোলা হলে মাড়িতে এই ধরনের ফোড়ার আবির্ভাব হয়। রক্তের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী হলেও এই বীজাণু প্রবেশকে রক্তের বীজাণুদূষণ (bactaraemia) বলে। এর জন্য শরীরে কাঁপুনি হতে পারে। বীজাণুদূষণ খুব মারাত্মকও হয়ে উঠতে পারে। হিষ্টামিন প্রয়োগে এই বীজাণুদূষণ স্থানীয় হয়ে ওঠে। এটা আঘাতেও হয়। বীজাণুদূষণ থেকে যাকে শক (shock) বলে, তাও হতে পারে।

2. বীজাণুদূষণজনিত রক্তনালিকার প্রদাহ: কোন বীজাণু আক্রমণের জন্যে রক্তনালিকাতে প্রদাহ হতে দেখা যায়। এর ফলে সেই প্রদাহগ্রস্ত জায়গাটা নরম হয়ে গিয়ে ছোট ছোট জমাট কণা, যাকে পুঁজের কণিকা বলা যায়, সেগুলি রক্তসঞ্চালনে সঞ্চালিত হয়। এই পুঁজের কণিকাগুলি, দূরে দূরে যেখানেই গিয়ে হাজির হয়, সেখানেই ফোড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। জমাট কণাগুলি রক্তনালিকার প্রদাহে জমাট বেঁধে থাকতে পারে, অথবা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জমাটবাঁধা রক্ত হতে পারে। এইভাবে কোন জায়গায় কার্বাঙ্কল বা অস্থিতে অষ্টিও-মাইলাইটিস থেকে ফুসফুসে ব্রণ, যা গাত্রচর্মে ফোড়ার মতন, তা হতে দেখা যায়।

3. লসিকাগ্রন্থী বা লসিকার নালিকাগুলির মধ্যে বীজাণুগুলি আটক পড়ে না গেলে সেগুলি শিরার মধ্যে দিয়ে রক্তচলাচলে পৌঁছে যায়। তার ফলে রক্তের বীজাণুদূষণ (bacteriaemia) ঘটে।

রেটিকিউলো এণ্ডোথিলিয়্যাল কোষ যদি বীজাণুগুলিকে ধ্বংস করতে না পারে, ও সেইসব বীজাণু যদি এইসব কোষে বংশবৃদ্ধি করে রক্তচলাচলের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে, তাহলে এক মারাত্মক ধরনের বীজাণুদূষণ ঘটে। অনুরূপ দূষণকে বিষাক্ত বীজাণুদূষণ বা septicaemia বলে।

এই ধরনে বীজাণুদূষণ হয় অতি মারাত্মক ও রক্তে বীজাণুর সংখ্যা বেশী থাকে। এ ছাড়াও এ রকমের বীজাণুদূষণ হলে বোঝা যায় যে, ওই ব্যক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল।

স্নায়ুর মাধ্যমে: কোন কোন বীজাণুর আক্রমণ স্নায়ুর মাধ্যমেও ছড়ায়। এর উদাহরণ হল ধনুষ্টঙ্কার ও অন্য কিছু ভাইরাসের আক্রমণ।

স্নায়ুর ঠিক কোন্ সূত্র ধরে যে তারা যায়, তা জানা নেই। তবে স্নায়ুর চারিপাশের যে জায়গা, সেইখান দিয়েই যায় বলেই মনে হয়।

কোনও বিশেষ বীজাণু আক্রমণ ছড়াবে কি ছড়াবে না, এটা নির্ভর করে কিছুটা বিশেষ বীজাণুর উপরে আর কিছুটা আক্রান্তের উপরে। এই তুটি দিক নিয়ে আলোচনা করছি।

বীজাণুর ভূমিকা রোগবিস্তারে

কোন্ বীজাণু কতটা মারাত্মক: এমনকি একই প্রজাতীর বিশেষ বীজাণুর মধ্যে কোন এক ধরন বেশী মারাত্মক হতে পারে। যেমন ডিপথিরিয়া বীজাণুর মধ্যে গ্রেভিস, ইণ্টারমিডিয়াস ও মিটিস, এই তিন শ্রেণীর সকলেই বিষ নিষ্কাষণে সমর্থ। কিন্তু তাদের পরিমাণগত বিভিন্নতা থাকে।

বীজাণুর সংখ্যা বা পরিমাণ: কতটা ছড়াবে, কি আক্রমণ কতটা মারাত্মক হবে, সেটা নির্ভর করে কত সংখ্যায় বীজাণু আছে তার উপরে। যেমন গোবৎসের উপরে যদি টিউবারকুলোসিস বীজাণুর আক্রমণ ঘটে, তা হলে দেখা যায়, যে বীজাণু সংখ্যায় কম হলে যে ক্ষতের সৃষ্টি করে, তা একেবারে স্থানীয়। কিন্তু বেশী পরিমাণের বীজাণু হলে রোগটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন একটি মাত্র সাল-মোনেলা টাইফিমিউরিয়াম ইঁতুরে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

প্রবেশ পথ: কোন পথ দিয়ে প্রবেশ করে বীজাণুরা কোথায় পৌছল, এর উপর রোগ হবে কি না হবে, তা নির্ভর করে। যেমন, কলেরা বীজাণু খাদ্যনালীতে কলেরা রোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু চামড়ার তলায় ইঞ্জেকশান দিলে কিছু হয় না। যে সংখ্যায় টিউবারকুলোসিস বীজাণু ফুসফুসে টিউবার-কুলোসিস রোগের সৃষ্টি করবে, তার শতগুণ বীজাণুর প্রয়োজন হবে, অন্ত্রে এই রোগ উৎপাদন করতে।

পারস্পরিক সাহায্য: একটি বিশেষ রোগ বীজাণু কোন রোগ যতটা উৎপাদন করতে পারে, অন্য একটি সাহায্যকারী পেলে হয়ত সেই রোগ আরো মারাত্মক করে তুলতে পারে। যেমন ভেড়ায় ক্লসট্রেডিয়াম ইডিমেটিয়েনস থাকে। এর আক্রমণ কিছু মারাত্মক নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে যখন ফেসিওলা হেপ্যাটিকা নামের কীটের আক্রমণ ঘটে, তখন এই প্রাণীর

যকৃত কালো হয়ে এক মারাত্মক রোগের উদ্ভব হয়! হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি বীজাণুরও ষ্ট্যাফাইলোকক্কাসের প্রয়োজন হয়।

বিস্তার বস্তুঃ কোন কোন বীজাণু তাদের নিজেদের শরীর থেকে এমন বস্তু বার করে; কিম্বা কোন অন্য কোন কলার অনুরূপ কোন বস্তুর সহযোগিতায়, এই বিস্তার বস্তু থাকায়, রোগের বিস্তার ঘটাতে পারে। যেমন ষ্ট্রেপটোকক্কাস ও ক্লসট্রিডিয়া এই বস্তুর সাহায্যে পরস্পরকে সাহায্য করে। এ ছাড়া সাপের বিষে ও কোন কোন টিউমারে এই বিস্তার বস্তু আছে। মনে করা হয় হায়লিউরোনিডেজ নামের একটি অনুঘটক এই বিস্তার বস্তুর মধ্যে থাকে। বীজাণুর নিজস্ব অনুঘটক যেমন ষ্ট্রেপটোকাইনেজ ও ষ্ট্যাফাইলোকাইনেজ বিস্তার বস্তু হিসাবে কাজ করে।

আক্রান্তের দিকঃ যে আক্রান্ত সে আবার বীজাণুর আশ্রয়দাতাও বটে। আশ্রয়দাতা যদি উপবাসী, রক্তশূন্য কি আঘাতজনিক শকে পীড়াগ্রস্থ হয়, তাহলে রোগবীজাণুদের আক্রমণের সুযোগ বেড়ে যায়। ঠিক ওই-রকমই নেফ্রাইটিস কি ডায়াবিটিস রোগী, অন্য বীজাণুর দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। এর কারণ একাধিক: যেমন, রক্তে কমপ্লিমেণ্ট কমে যাওয়া, রোগ প্রতিরোধকারী কোষের (বীজাণুখাদক) সংখ্যাল্পতা।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাঃ রক্তে কমপ্লিমেণ্ট ছাড়া, বিশেষ এ্যান্টি-বডি, যা বিশিষ্ট বিশিষ্ট বীজাণুর বিরুদ্ধেই তৈরি (specific)।

বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট শ্বেতকণিকাঃ রক্তে যদি এই কণিকার সংখ্যা কম হয়ে যায়, তাহলে রোগবীজাণুর আক্রমণ সহজ হয়।

শরীরের কিছু কিছু স্থানীয় অবস্থা বীজাণু আক্রমণকে সাহায্য করে। এগুলি হল, এ্যাড্রেন্যালিন, স্নায়ুতে জখম, রক্তনালীর কোন রোগ, শরীরে বাইরের কোন বস্তুর উপস্থিতি, দুষ্ট রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি।

রোগ আক্রমণে শরীরের সাড়াঃ এগুলি বহু। যেমন জ্বর, রক্ত কণিকার নিম্নপাতনের বৃদ্ধি, এগুলি আবার ভিন্ন বীজাণু অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

৪

ক্ষতের আরোগ্য

ক্ষত আরোগ্য হওয়া বলতে বোঝায় শরীরের কোন অংশ বা শরীরের কোন কলার অংশবিশেষ, যা নষ্ট হয়ে গেছে, তার আবার জীবন্ত অবস্থায় ফিরে আসা।

কলা বিশেষের বিনাশ কিভাবে হয় ?

1. যে কোন ছেদের মূলে কোন না কোন আঘাত থাকে। সে আঘাত শল্যচিকিৎসা জনিত আঘাত হতে পারে, অথবা অন্য প্রকারের।

2. বস্তু বা পদার্থভিত্তিক, রাসায়নিক অথবা বীজাণু দ্বারা এই আঘাত সম্ভব। তবে শল্যচিকিৎসা জনিত এ ধরনের আঘাত পেলে, প্রদাহস্ফীতি ঘটে ও তার ফলে কলা বা তার অংশবিশের বিনাশ ঘটে।

3. রক্ত জমাট বাঁধার জন্য রক্তাল্পতা ঘটা অসম্ভব নয়।

4. বহিরাগত কোন বস্তুর জন্য শরীরের বিক্রিয়ার ফলে কলাবিশেষের বিনষ্টি ঘটতে পারে। যেমন, প্রদাহ স্ফীতির জন্য, তারই নিষিক্ত রসে রক্তচলাচল বাধাগ্রস্থ হতে পারে। যে রকম হয় অষ্টিওমায়লাইটিস রোগে, কিম্বা বিজাতীয় প্রোটিনের বিরুদ্ধে সংবেদনশীলতার জন্য (আর্থাস বর্ণিত)।

আরোগ্য দু'ভাবে সম্ভব।

(a) **সঙ্কোচন** : সঙ্কোচন হওয়াতে ক্ষতিগ্রস্থ স্থানের আয়তন ছোট হয়ে যায়। এ অবস্থা প্রথম কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয়।

(b) ক্ষতিতে বিনষ্ট কলার পুনর্জন্ম : নতুন কোষের ক্ষতস্থানে আগমন ও কাছাকাছি জায়গার কোষগুলির বিভাজন হয়েই ফাঁকটুকুকে ভরে ফেলার চেষ্টা হয়। এও ঘটে দুটি উপায়ে :

পুনরুজ্জীবন : যে কলা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তা ঠিক সেই কলা দ্বারাই পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। এ সম্ভব আশপাশের পরিণত কলার কোষ বিভাজন ও নতুন কোষ সৃষ্টির ফলে।

মেরামতি : যে অংশ নষ্ট হয়েছে, তা একরকমের দানাদার কলায় (granulation tissue) ভরে ওঠে। এটিই পরিণত অবস্থায় ক্ষতস্থানের

বিশেষ কলায় (scar tissue) পরিণত হয়। পেশী ও স্নায়ুতে এটি হতে দেখা যায়। কারণ এই কলাগুলির পরিণতি ও বিশিষ্টতা এমনই যে এরা কোষ বিভাজন করে নতুন কোষ সৃষ্টি করতে পারে না। এই ক্ষমতা নিম্নস্তরের কোন কোন প্রাণীর যেমন নিম্ন সরিসৃপদের মধ্যেও দেখা যায়। কাঁকড়া, ইত্যাদি প্রাণীরা পুরো দাড়া কি চোখ নষ্ট হয়ে গেলে, তা আবার ফিরে পেতে পারে। এ যেন ভ্রূণের দেহাংশ সৃষ্টি করে বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনীয়। মানুষেঃ ক্ষেত্রে যকৃত বা অগ্নাশয় এইভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে।

শল্যচিকিৎসকের কাছে সফলভাবে যেমন করেই হক ক্ষত হয়ে যে ফাঁক সৃষ্ট হয়েছে তা জোড়া দিতে পারলেই মেরামতির কাজ হল। কিন্তু বিকার-তত্ত্বের বিশেষজ্ঞের কাছে এর শ্রেণীবিভাগ, কিভাবে ও কতটা মেরামতি হল তার উপরে।

ক্ষত আরোগ্যের আগে, ক্ষতের সঙ্কোচণ, দানাদার কলা বিশেষের উৎপত্তি ও তার স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে আলোচনা করে নেয়া ভাল।

ক্ষতের সঙ্কোচন

পরীক্ষামূলক ভাবে ক্ষতস্থানের সঙ্কোচণ দেখার জন্য ইঁদুরের পিঠে পুরো চামড়া নিয়ে একটি নির্দিষ্ট বৃত্তাকার ক্ষত তৈরি করা হয়। প্রথম দুই কি তিন দিনের পর দেখা যায় যে ক্ষতের ব্যাস ক্রমশঃ কমে এসে পনেরো দিনের মধ্যে ক্ষতটা আশী ভাগ ছোট হয়ে যায়। সঙ্কোচনের হার নির্ভর প্রাণী, ক্ষতটি কত বড়, তার চারপাশ কি রকম, এ সবের উপরে।

সঙ্কোচন হয় বলে, ক্ষতের আরোগ্য ত্বরান্বিত হয়। কেননা, এতে মেরামত করতে হবে, এমন জায়গাটাই ছোট হয়ে যায়। সঙ্কোচন ব্যহত হলে ক্ষত সারতে দেরী হয়, ও ক্ষতচিহ্ন এবড়ো-খেবড়ো হয়।

সঙ্কোচনের কারণ : নিশ্চিতভাবে এ সম্পর্কে কিছু জানা নেই।

ক্ষতস্থানের জলীয় পদার্থ বার হয়ে যায়, এটা সঙ্কোচনের অন্যতম কারণ।

দীর্ঘকাল ধরে মনে করা হচ্ছে যে কোলাজেনের সঙ্কোচন ক্ষত সঙ্কোচনের একটি কারণ। অবশ্য কোলাজেনকে সিদ্ধ করলে, তার আয়তন দুই-তৃতীয়াংশ কমে যায়। কিন্তু শুধু ফেলে রাখলে কমে না। তবে এ কথা ঠিক, যে ক্ষত সঙ্কোচন কোলাজেন বেশী থাকলেই হয়। তবু আবার এও দেখা যায়, ক্ষত

আরোগ্যে যখন দানাদার কলার সৃষ্টি হয়, তখনও সঙ্কোচন যথেষ্ট হয়। যদিও দানাদার কলায় কোলাজেনের ভাগ কমই থাকে।

দানাদার কলার বিন্যাস যখন হয়, সে সময়ে ক্ষত সঙ্কুচিত হয় বলে, এ থেকে অনেকে এই বিন্যাসকেই ক্ষত সঙ্কোচনের কারণ বলে ভাবেন। এমনকি কোন কর্মী দানাদার কলাকে সঙ্কোচনেরই বিশিষ্ট কলা হিসাবে অভিহিত করেছেন। স্কার্ভিগ্রস্থ প্রাণীর ক্ষেত্রেও এই কারণেই ক্ষত সঙ্কোচন কম হয়। কারণ ভাইটামিন C-র অভাবে কোলাজেন বিন্যাসে তো ভাঁটা পড়বেই।

একটা জিনিস দেখা যায় যে সঙ্কোচনটা ক্ষতের চারিপাশ থেকে ঘটে, যেন ছবির ফ্রেমটা ছোট হয়ে আসছে। ফ্রেমটি পুরো সঙ্কুচিত না হতে পারলে, সচঙ্কন ও ক্ষত সারায় দেরী হয়।

কর্টিসোন জাতীয় ষ্টেরয়েডেও সঙ্কোচনের খুব একটা ইতরবিশেষ হয় না।

দানাদার কলা

এই বিশেষ ধরনের কলা, খরগোসের কানে স্বচ্ছ একটি প্লাসটিকের ঘর বানিয়ে একটি প্লাসটিকের স্পঞ্জের মধ্যে কি কি ঘটছে তাই দেখা যায়। এতে তিনটি অবস্থা দেখা যায়।

1. আঘাতজনিত প্রদাহস্ফীতি—ফাইব্রিন ও বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ দেখা দেয় প্রথমে। সেই সঙ্গে রক্তক্ষরণ। রক্তক্ষরণের জন্যই ফাইব্রিন দেখা দেয়। ভিতরের বস্তুর মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে।

2. তার পরের ধাপটি হল পরিস্কার হয়ে যাওয়া—বহুকোষী শ্বেত-কণিকাগুলি থেকে বিবিধ অনুঘটক তাদের শরীর ভেঙ্গে বার হয়। এই সঙ্গে দেখা দেয় ম্যাক্রোফাজ কোষ। বস্তুকণাগুলিকে এই কোষ হজম করে সরিয়ে ফেলে। এই কোষগুলি রাক্ষুসে কোষে পরিণত হতে পারে।

3. এর পরবর্তী ধাপ হল দানাদার কলা তৈরী হওয়া: আশপাশের কলাসমূহ থেকেই এই দানাদার কলার সৃষ্টি হয়। প্রথমে তন্তু তৈরি করে যে কোষ, সেই কোষ ও সূক্ষ্ম রক্তনালিকা এতে অংশগ্রহণ করে। প্রথমদিকে প্রচুর রক্তনালিকা থাকে, কিন্তু পরে তন্তুজাতীয় কলারই প্রাধান্য ঘটে। এদিক থেকে বলা যায় যে, এর রক্তনালিকার সৃষ্টি ও পরের ধাপটি হল রক্ত-নালিকার অপসারণ।

রক্তনালিকা সৃষ্টি: তন্তুসৃজনকারী কোষেও রক্তনালিকা থাকার

প্রয়োজন ক্ষতসৃষ্টির প্রথমদিকে থাকে। তার কারণ, জমাট বাঁধা রক্ত, যা সেখানে রয়েছে, তাকে দূর করতে তো হবে। এই অবস্থাকে সংগঠনমূলক অবস্থা (organisation) বলা যায়। এই ঘটনাগুলিও খরগোসের কানে দেখা যায়। ঘরের প্লাষ্টিকের স্বচ্ছ জানলা, অণুবীক্ষণে দেখে নেওয়া যায় তার সূক্ষ্ম স্তর অবধি কি ঘটছে। দেখা যায়, ফাইব্রিনের গড়া জমাট অংশটি ম্যাক্রোফাজ জাতের কোষ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এদের পিছন পিছন আসে রক্তনালিকারা।

রক্তনালিকার সৃষ্টি : রক্তনালিকা, অর্থাৎ যে নালিকাগুলি উন্মুক্ত হয়ে বা ভেঙ্গে গেছে, তাদের ভিতরের দিকে যে বন্ধনী কোষ (endothelial cells) আছে, তা থেকেই রক্তনালিকার অঙ্কুর বা কুঁড়ি তৈরি হয়। এর ভিতরকার নলের মত যে ফাঁকা জায়গা এও তৈরি করে ওই কোষগুলি। তারপর একটি নালিকার সঙ্গে আর একটির সংযোগ ঘটিয়ে সূক্ষ্ম সেতুর উদ্ভব হয় (arcades)। নবগঠিত রক্তনালিকার ভিতরের স্তরের কোষগুলিতে (endothelium) পরস্পরের মধ্যে সামান্য ফাঁক থাকে। এ ফাঁক শুধুমাত্র ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দেখা যায়। ফাঁক থেকে প্রোটিন বার হয়ে আসতে পারে। এই জন্যই আবার এতে ফাইব্রোব্লাষ্ট জাতের কোষ জন্মাতে পারে ভাল করে। রক্তনালিকাগুলির কোন কোনটির মধ্যে পেশী জাতীয় কলার বিন্যাস হয়ে ধমনী হয়। আর কোনটি শিরা হয়। এই পর্যায়ে শিরা ও ধমনীর যোগাযোগও হয়। তন্তু ও সেইসঙ্গে কোলাজেনও ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষগুলি তৈরি করে। এইখানের pH এলকেলাইন (ক্ষার) জাতীয় হয়।

রক্তের শ্বেতকণিকারা যে ফাইব্রোব্লাষ্টে রূপান্তরিত হতে পারে, এও প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন যে, রক্তনালিকা জখম হবার জন্য ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষ রক্তনালিকা থেকে আসতে পারে।

ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষের প্রাধান্য থাকতে থাকতেই স্নায়ুসূত্র জন্মায়। ঐগুলির জন্ম হলে দেখা যায় তখন ধমনীনালিকাগুলিতে স্পন্দন সুরু হয়েছে।

ফাইব্রোব্লাষ্ট প্রাধান্যের মধ্যেই রক্তনালিকার ভিতরের স্তরে কোষবৃদ্ধি হতে হতে, এর ভিতরটা বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থাকে রক্তনালিকা বন্ধ হবার অবস্থা বলা যায়। এই পর্যায়ে ক্যালসিয়াম, বা চুণজাতীয় বস্তু জমা হয়ে, শেষ পর্যন্ত তা অস্থিতে পরিণত হতে পারে। এই অবস্থাকে ক্ষতচিহ্ন-রক্ষার (cicatrisation) অবস্থা বলা যায়।

সংগঠিত অবস্থার (organisation) কথা বলা হয়েছে। এই সংগঠন বিকারতত্ত্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যখন প্রদাহ হয়, যেখানে ফাইব্রিন জমাট বেঁধেছে সেই জায়গা থেকেই সংগঠন কার্যের সূচনা হয়। তবে কোন কোন জায়গায়, কোন গহ্বরে ফাইব্রিনই তন্তুজাত বস্তু হিসাবে একটি কলাকে অন্য একটি কলার সঙ্গে আটকে রাখে। ক্ষত সারার ব্যাপারে দানাদার কলা তৈরি হওয়াটা সংগঠনের একটি প্রয়োজনীয় দিক।

ক্ষত সারার সময়, সেটা কোন খোলা ক্ষতই হক, আর হাড় ভেঙ্গে যাবার মত ক্ষতই হক, বা কোন জায়গায় রক্তজমাই হক, ম্যাক্রোফাজ জাতীয় কোষ অন্য সব বস্তু হজম করে, জায়গাটা পরিষ্কার করে দেয়। সেখানে দানাদার কলা সংগঠিত হবার অবস্থা সৃষ্ট হয় না।

কোন কোন ধরনের ক্যানসারে, ক্যানসারের মধ্যবর্তী অংশে দানাদার কলা সংগঠিত হতে দেখা যায়। এখানে এ ধরনের কলার সার্থকতা যে কি তা জানা নেই তবে মনে হয়, ক্যানসার কোষগুলিই প্রদাহের ইন্ধন দিয়ে প্রদাহস্ফীতির হয়ত সূচনা করে। তাই এখানেও আবার যথারীতি সংগঠনের কাজ ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে। আবার এও হতে পারে যে, ক্যানসার তার চারিপাশে যোগাযোগ সৃষ্টি করবে যে কলা, সেই কলা সৃজন করে। সেই কলাই দানাদার কলার মত, যা ক্ষত আরোগ্যে দেখা যায়।

দানাদার কলার কমবেশী কিসে হতে দেখা যায়

স্কার্ভি : গিনিপিগের যদি স্কার্ভি রোগ থাকে, তাহলে ঘা সারতে দেরী হয়। এর প্রধান কারণ হল কোলাজেন তৈরি হবার ব্যাঘাতের জন্য। দানাদার কলার যে রক্তনালিকা তৈরির অংশ তা অব্যাহত অবস্থায় থাকে ও ঠিকই চলতে থাকে। কিন্তু ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষে ফসফাটেজ জাতের অনু-ঘটকের কম থাকতে দেখা যায়। রৌপ্যঘটিত রঞ্জকের রং নেয় এ রকম গোল গোল অস্বাভাবিক পদার্থ দেখা যায়। কোলাজেনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে প্রো-কোলাজেন থেকে কোলাজেন হবার জন্য হাইড্রোজেনের সংযুক্তি ঘটতে দেখা যায় না। কোষ প্রোটিন নিষ্কাষণ করতে পারে না বলেই এটা ঘটে।

কর্টিজোন : কর্টিজোন বা অন্য ধরনের গ্লুকোকর্টিকোষ্টেরয়েড শরীরে বেশী পরিমাণে থাকলে দানাদার কলা সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে। এইজন্য সহজে ঘা সারতে চায় না। এতে ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষগুলি ছোট ছোট হয়,

ও কোলাজেন তৈরি ব্যহত হয়। তবে এই ফলাফল অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে যত মারাত্মক মানুষের ক্ষেত্রে ততটা নয়।

ভারবহন শক্তি ঃ কতটা ভার বা টান, সারছে এমন ক্ষত সহ্য করতে পারে, যে ক্ষত সারছে সেই ক্ষত, এর উপরে সারাটা অনেকখানি নির্ভর করে। 1853 সালে প্যাজেট এর গুরুত্ব দেখিয়েছিলেন। পরীক্ষামূলক-ভাবে, কতটা টানে ক্ষত ছিন্ন হয় এটা মেপে দেখা হয় টেনসিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে।

কতটা কোলাজেন আছে, তার উপরে ক্ষতের ভারবহন শক্তি নির্ভর করে। কোলাজেনের বৃদ্ধি একটু একটু করে হতে থাকে। আশী দিনে তা চরম পর্যায়ে পৌছে শেষ হয় কিন্তু ক্ষতের ভারবহন শক্তি, তার পরেও বাড়তে থাকে ও তা কয়েক মাস ধরেই বাড়ে। হয়ত তন্তুগুলির সঠিক বিন্যাস ও সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক অনু সংযুক্তির ফলে এটা সম্ভব হয়।

আরো একটা বিষয় হল যে দেহের যে রেখাগুলি ধরে স্বাভাবিক অবস্থায় চাপ বা টান পড়ে, সেই রেখাগুলির দিকে ক্ষতরেখার বিন্যাস হলে সে ক্ষত তাড়াতাড়ি সারে। কিন্তু এই রেখার সমকোন রেখার ক্ষত সারতে দেরী হয়। রেখাগুলি চামড়ার নিচে কোলাজেন বিন্যাসের ফলে সৃষ্টি হয়।

পেটের ক্ষতে যদি কোন রক্ষাব্যবস্থার বেশী বাড়াবাড়ি করা হয়, তাতে সেই ক্ষতের ভারবহন ক্ষমতা ব্যহত হয়।

কাছাকাছি জায়গায় পুরাতন কোন ক্ষত থাকলে, তা অন্য ক্ষতকে প্রভাবিত করে না। ক্ষতের কোন ক্ষতজাত হর্মোন নেই। প্রথমেই সেলাই করা ক্ষতের চেয়ে পুনরায় সেলাই করা ক্ষত তাড়াতাড়ি সারে। কারণ তার সারার কাজটা আগে থেকেই সুরু হয়েছে বলে। জখম যদি মারাত্মক হয়, তাহলে চাপ সৃষ্টির (stress) জন্য এ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থীর বহিরাংশের প্রভাবে ক্ষত সহজে আরোগ্য হতে চায় না।

চর্ম ক্ষতের আরোগ্য

সম্প্রতি এ সম্পর্কে অনেক কাজ হয়েছে ও তার ফলে অনেক কথা জানা গেছে।

পরিচ্ছন্ন রৈখিক কাটা ক্ষত ঃ এই ধরনের ক্ষতের আরোগ্যকে প্রথম

চেষ্টায় আরোগ্য বলে। সার্জারির (শল্যচিকিৎসা) জন্য যে ধরনের ব্যবচ্ছেদ করা হয়, তার আরোগ্য এইভাবে হয়।

এর ধাপগুলি হল এই রকমঃ প্রাথমিক রক্তক্ষরণের জন্য, যথেষ্ট ফাইব্রিন আছে, এইরকম রক্ত জমা হয়।

প্রদাহস্ফীতি তারপর থেকে সুরু হয়। কিন্তু ফাইব্রিন থাকাতে ক্ষতের কাটা অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

ক্ষতস্থানে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই চামড়া থেকে এপিথিলিয়ামের কোষ ক্ষতস্থানে গিয়ে. জমাট রক্ত ও চামড়ার নিম্নবর্তী স্তরে পৌছোয়। ক্ষতের উপরটায় থাকে জমাটবাঁধা রক্ত। এপিথিলিয়ামের যে কোষগুলির কথা বলা হল, সেগুলির ভিতর দিকের কোষের (basal) বিভাজন থেকেই নতুন সংযোগকারি কলা সৃষ্ট হয়। তলার ভিত্তিভূমির কোষে (basal) যে বিভাজন সুরু হয়, সেগুলির অবস্থান ক্ষতের পাশে। ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে এই কার্যকলাপ চূড়ান্ত অবস্থায় আসে। কোষগুলি শেলাইয়ের রেখার পাশে বিন্যস্ত হয়ে চলতে থাকে। কি করে যে এই কোষ বিভাজন সুরু হয়, তার কারণ জানা নেই। তবে টিস্যু কালচার বা কোষ-চাষে দেখা যায়, যে নিজেদের মত কোষের সঙ্গে যোগাযোগ হলে, তবেই তাদের কোষবিভাজন বন্ধ হয়। এ্যাবারকম্বি একেই সংযোগজনিত ক্লান্তি বলেছেন।

প্রদাহস্ফীতি যেমন একটি ধাপ, তেমনি আর একটি ধাপ হল স্ফীতি-ভঙ্গ। যাতে জড় হওয়া কোষগুলি সরে যেতে থাকে।

এর পরের ধাপ হল সংগঠনঃ ফাইব্রোব্লাষ্ট জাতীয় কোষ, ও রক্ত-সংবহন নালিকার ছোট ছোট কোরক বা কুঁড়ি তৈরি হওয়াটাই সংগঠনের প্রাথমিক অবস্থা। এই সংগঠন উপরের দিকের অর্থাৎ যাকে এপিডারমিস বলে, সেখানেই সুরু হয়। ভিতরের কলা বরং অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় থাকে।

সংগঠন কার্যের মাধ্যমে যখন দানাদার কলা তৈরি হয়ে যায়, তারপর সুরু হয় কোলাজেন তৈরি। কতটা কোলাজেন তৈরি হল, তার পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব হয়, সেই কলায় কতটা হাইড্রক্সি-প্রোলিন আছে, তার পরিমাপ করে বোঝা যায়। তবে আবার এও ঠিক কথা, যে এই রাসায়নিক পরিমাপ ক্ষত কতখানি সারল তার অভ্রান্ত পরিমাপ নয়। কারণ কিছুটা হাইড্রক্সি-প্রোলিন ও হেক্সোজ শর্করা জাতীয় এ্যামাইন, সেরে উঠছে এমন ক্ষত ছাড়া, অন্য জায়গা থেকেও আসতে পারে।

দানাদার কলা তৈরী থেকে আরো একটা উপকার হয়। এপিথিলিয়ামের অতিরিক্ত কোষ, ক্ষতের সৃষ্ট ফাঁকটায় জমা হয়ে, ক্ষতস্থানের আরোগ্যকে বাধা দিতে পারে না। কারণ এই কোষের শুধুমাত্র থাকবার কথা চামড়ার বহিস্তরে।

ক্ষত সারাতে প্রথমেই এগিয়ে আসে ত্বকের উপরের দিকের এপিথিলিয়াম কোষ। সংযোগকারী কলাকে তাই উৎসাহিত করে বলে বলা যায়।

গর্তের গড়নের ক্ষত, যেমন ক্ষত ইঞ্জেকশানে হয়, সে ধরনের ক্ষতে ক্ষতচিহ্নও হয় না কারণ চর্মগাত্রের এপিথিলিয়াম এখানে স্থান নিতে পারে না।

ক্ষতমুখে ফাঁক থাকলে কিভাবে ক্ষত আরোগ্য হয়

একে বলে পরবর্তী চেষ্টায় আরোগ্য অবশ্য বিকারতত্ত্বের দিক থেকে ক্ষত আরোগ্যের রূপ সব জায়গাতেই সমান। যদি ক্ষতমুখটি কাছাকাছি না আনা হয়, অথবা আঘাতের জন্যই হক বা অন্য কোন কারণে হক, ক্ষতস্থানের অনেকটা জায়গা যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে প্রথমেই এই জায়গাটা ভর্তি করতে হবে। ভরতে হলে চাই দানাদার কলা। তাই এ রকমের আরোগ্যকে বলে, দানাদার কলার সাহায্যে সারা। তবে তা বলতে, এটা বোঝায় না যে, অন্য রকমের আরোগ্যে দানাদার কলা তৈরি হয় না। অর্থাৎ তফাৎটা গুণগত না হয়ে পরিমাণগত। এর ধাপগুলি হল :

1. প্রথমে আশপাশের কলসমূহকে জড়িয়ে একটা প্রদাহস্ফীতি দেখা দেয়। রক্ত বা প্লাজমা জমাট বেঁধে ক্ষতমুখ বন্ধ করে। এটা শুকিয়ে একটা সাময়িক ক্ষতচিহ্ন হয়ে ওঠে।

2. তার পরের ধাপ হল ক্ষত সঙ্কোচন। একথা আগে আলোচনা করা হয়েছে।

3. অন্য ক্ষত সারার মতই বহিঃত্বকের এপিডারমিস কোষ বহু হবার জন্য কোষ বিভাজনে প্রবৃত্ত হয় ও এপিথিলিয়ামের কোষ ক্ষতস্থানে হাজির হয়। জিভ বার করার মত সংযোজক কলার মধ্যে ও জমাটবাঁধা অংশেও এই কোষ অনুপ্রবেশ করে। কোলাজেনেজ বলে একটি বিশেষ অনুঘটকের সাহায্যে এটা সম্ভব হয়। এই অনুঘটক সংযোগকারী কলার কিছু অংশ হজম করে ফেলে।

4. এর পরবর্তী ধাপটি হল প্রদাহস্ফীতির মাধ্যমে জমাটবাঁধা অংশটি

আক্রান্ত হয়ে, সেখানে দানাদার কলা তৈরি হওয়া। এই কলা ক্ষতের তলদেশ থেকে উদ্ভূত হয়। আগে বলা হয়েছে যে, ক্ষত সঙ্কোচনে এই কলার ভূমিকা আছে। ক্ষতের তলায় রক্তনালিকা কত আছে, তার উপর এই কলার পরিমাণ কত হবে, তা নির্ভর করে।

আতসী কাঁচ দিয়ে দেখলে, এইজন্য এই দানাদার কলায় লাল লাল দানা দেখা যায়। এই দানাগুলি খুব ভঙ্গুর। ভাঙ্গলে রক্তপাত হয়। দানাদার কলা এভাবে অর্থাৎ রক্তের সাহায্যে অন্য বীজাণুর আক্রমণও প্রতিহত করে।

5. ত্বকের উপরভাগ দানাদার কলাকে ঢাকা দেয়। এর উপর একটি বোঁটার সাহায্যে বেঙের ছাতার মত নিচের সঙ্গে লাগানো থাকে ও ক্ষত আরোগ্য হলে ঝরে যায়।

6. নতুন জন্মানো ত্বক একটু পুরু। এরই মধ্যে থেকে বন্ধনী নিচে অবধি নেমে যায়। ঐগুলি থাকে না। নতুন ত্বক প্রথমে থাকে লাল। তার পর সাদা হয়ে যায়।

পুড়ে গিয়ে আংশিক ত্বকের ক্ষত, অথবা চামড়া অন্য জায়গায় লাগানোর জন্য থিয়ারস গ্রাফট, তাড়াতাড়ি সারে।

ক্ষত আরোগ্যের জটিলতা

সংক্রমণ ঃ যে কোন ক্ষতই বীজাণু ঢুকতে পারার সহজ রাস্তা। বীজাণু সংক্রমণ ক্ষত সারায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আর তা মারাত্মক হলে, ঘা একেবারে নাও সারতে পারে। সংক্রমণ হলে সেই স্থানীয় কলার অনেকখানিই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রকম হলে কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন, যা তন্তুজাতীয় কলা দিয়েই তৈরি, তাই হতে দেখা যায়।

ক্ষত ফেটে যাওয়া ঃ পেট কেটে অস্ত্রপচার করার পর, এ ধরনের ঘটনা দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার শতকরা তিরিশ ভাগ। তবে এরকম হয় কমই (0·5%—5·0%)। অস্ত্রপচারে ত্রুটি, প্রোটিনের অভাব, ভাইটামিন সি'র অভাব, অপুষ্টি, ক্যানসার এইসব ক্ষেত্রে পেট ফেটে যাবার ঘটনা ঘটে। স্থানীয়ভাবে, বীজাণু সংক্রমণ, পেটের মধ্যে অতিরিক্ত চাপ, পেরিটোনিয়ামে প্রদাহ, বেশী বমি, কাশি, স্থানীয় কারণ হতে পারে।

পুঁজ কোষ তৈরি হওয়া ঃ ক্ষত সারবার সময়ে, বর্হিত্বকের কোন

অংশ ভিতরে থেকে গেলে, তা থেকে এরকম কোষ তৈরি হতে পারে। তার ভিতরে থাকতে পারে পুঁজ, সিরাম বা অনুরূপ তরল পদার্থ। ডারময়েড কোষের তুলনায় এর ভিন্নতা লক্ষ্য করার যোগ্য।

কিলয়েড জাতীয় ক্ষতচিহ্নঃ ক্ষতচিহ্নে অতিরিক্ত কোলাজেন তৈরি হলে সেই শক্ত আঁটি আঁটি ক্ষতচিহ্নকে কিলয়েড বলে। কেন যে কিলয়েড তৈরি হয়, জানা নেই। তবে বার বার আঘাত লাগা, চুল, কেরাটিন, ইত্যাদির উপস্থিতি এর কারণ হতে পারে। কিলয়েড হবার বেশী সম্ভাবনা তরুণী, নিগ্রো (কালো রং), ও টিউবারকুলোসিস রোগগ্রস্থদের। পোড়া ক্ষততে বেশী হতে দেখা যায়।

রংয়ের পরিবর্তনঃ রঞ্জক কণিকা ক্ষতস্থানে থেকে গেলে, তা থেকে উল্কির মত ছিট ছিট রং বা পুরো জায়গায় রং হতে দেখা যায়।

যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতচিহ্নঃ কখনো ক্ষতচিহ্নের মধ্যে নিউরোমা জাতের টিউমার থাকলে ক্ষতচিহ্ন যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে।

দুর্বল ক্ষতচিহ্নঃ ক্ষতচিহ্নের উপরে অবিরত চাপ পড়তে থাকলে, তা দুর্বল হয়ে হার্ণিয়ার স্থল হতে পারে।

ক্ষতচিহ্ন সঙ্কোচনঃ (cicatrisation)ঃ ক্ষত সঙ্কোচনের সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। এ ধরনের সঙ্কোচন হলে, তার ফলে নানাবিধ বিকৃতি দেখা দিতে পারে। এ রকম বিকৃতি মূত্রদ্বারে, অন্ত্রে, খাদ্যনালীতে দেখা দিতে পারে। এতে সেই নালিকার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। লিভারেও এই ধরনের ক্ষতচিহ্ন সঙ্কোচন সিরোসিস হলে দেখা যায়। তাতে লিভার শিরায় রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।

ক্ষতচিহ্নে টিউমারঃ বার বার আঘাত পেতে পেতে ক্ষতচিহ্নতে স্কোয়ামাস কোষে ক্যানসার দেখা দিতে পারে।

ক্ষতের আরোগ্য প্রভাবান্বিত হয় কিসে ?

এর অনেকগুলি দিক আছে। সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই ভাগ করে নেয়া উচিত স্থানীয় ও সাধারণ কারণ।

স্থানীয় কারণ

রক্তাল্পতাঃ আহত স্থানে রক্ত সঞ্চারণ কম হলে ঘা সারতে দেরী হয়। এইজন্য পায়ে টিবিয়া অস্থির সামনের চামড়ায় ক্ষত হলে তা সারতে দেরী

হয়। তেমনি পায়ের ক্ষত, রক্তাল্পতার জন্য সারে দেরীতে। বিছানায় একভাবে শুয়ে যে 'বেড-সোর' ক্ষত হয়, তাও চাপ লেগে রক্তচলাচল ব্যহত হয় বলে সারতে দেরী হয়। দীর্ঘদিন ধরে প্রদাহ চলতে থাকলে, অন্তিম-ধমনীগুলির সঙ্কোচন হয়। এতে রক্তচলাচল ব্যহত হয় ও ক্ষত সারতে চায় না। ঠিক এটাই ঘটে রঞ্জনরশ্মির প্রভাবে। বৃদ্ধ মানুষের শরীরে এইজন্য ক্ষত সারতে দেরী হয়।

অস্থির উপর লেগে থাকা জায়গায়ঃ ক্ষতের চারিপাশে অস্থির কোন অংশ লেগে থাকলে, ক্ষত সঙ্কোচন হতে পারে না। পায়ের হাড়ে এটা খুবই দেখা যায়।

বার বার প্রদাহ হওয়াঃ সব রকমের বীজাণু সংক্রমণ এই পর্যায়ে পড়ে। আবার অতিরিক্ত বীজাণুনাশক ব্যবহার ও তার জন্য উত্তেজনার কারণ ঘটলে, ক্ষত সারতে দেরী হয়। অবিরাম ড্রেসিংয়েরও ফল তাই।

নড়াচড়াঃ নড়াচড়া হলে যে কোন ক্ষত সারতে দেরী হয়।

(a) বার বার নড়াচড়ার জন্য বারে বারে জখম হয়ে প্রদাহস্ফীতি হবার জন্য ক্ষতটি সারতে চায় না।

(b) চলাচল বা নড়াচড়ার কাজ ব্যায়ামের মত। ব্যায়ামে এ্যাড্রি-ন্যালিন উত্তেজিত হয় ও সেই জন্য কোষ বিভাজন স্তিমিত হয়ে যায়।

টিউমারের প্রভাবঃ কোন জায়গায় টিউমার হলে, সেখানে ঘা সারতে দেরী হয়।

এক্স-রে বা অনুরূপ আয়নকারী রশ্মির প্রভাবঃ এগুলির প্রভাব একাধিক। প্রথম, ক্ষতের সঙ্কোচনে বাধা সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়, দানদার কলা তৈরিতে বাধা সৃষ্টি।

আলট্রাভায়োলেট রশ্মিঃ এ রশ্মির প্রয়োগে ক্ষত আরোগ্য ত্বরান্বিত হর।

ক্ষত আরোগ্যের অন্য দিক

বয়সঃ অল্প বয়সে ক্ষত সারে অনেক তাড়াতাড়ি। বৃদ্ধ বয়সে গতি কিছুটা স্তিমিত হয়। তার উপর রক্তচলাচল স্তিমিত হবার জন্য ক্ষত সারতে দেরী হয়।

পুষ্টিঃ প্রোটিন অপুষ্টির জন্য দানাদার কলার উদ্ভব হতে পারে না।

কোলাজেনের উৎপাদনও বাধা পায়। মেথিওনিন ও সিসটিন যাতে আছে, এমন প্রোটিন দিলে এর উপশম হয়। অবশ্য কোলাজেনে যে এগুলি থাকে তা নয়। কিন্তু প্রো-কোলাজেন থেকে কোলাজেন তৈরিতে এদের প্রয়োজন।

ভাইটামিন সিঃ এর অভাব হলে ক্ষত সারে না। কারণ যে কোলাজেন তৈরি হয়, তাও স্বাভাবিক নয়। ফলে রক্তনালিকা ভঙ্গুর হয়। রক্তক্ষরণ হয় এ জন্য। দেখা গেছে এই অবস্থায় জোড়া হাড় আবার ভেঙ্গে যায়।

দস্তাঃ খাদ্যে খুব অল্প পরিমাণ দস্তা থাকলে ক্ষত ভাল সারে। কি ভাবে এর কাজ হয়, তা জানা নেই।

হর্মোনঃ ষ্টেরয়েড জাতীয় হর্মোনে যেমন টেষ্টোষ্টেরনে ক্ষত দ্রুত সারে। হয়ত এর কাজ পিটিউটারির মাধ্যমে হয়।

তাপঃ সাধারণ অভিজ্ঞতাই এটা যে, শীতের দিনে ঘা সারতে দেরী লাগে। যেমন কাঠবেড়ালীকে 5°C উত্তাপে রাখলে, দানাদার কলা থেকে চামড়া আর যেন হতেই চায় না। কিন্তু প্রতি 10°C উত্তাপ বৃদ্ধি হলে, ক্ষত সারাটা দ্বিগুণ হয়।

স্নায়ুর ক্ষতের আরোগ্য

মোটামুটি ক্ষত আরোগ্যের যে মূল সূত্র তাই এখানের ক্ষত আরোগ্যেও দেখা যায়। তবে মস্তিষ্কে লিপিড বা চর্বি জাতীয় বস্তু থাকায়, ম্যাক্রোফাজ কোষে প্রচুর চর্বিজাতের বস্তু জমা হয়। অন্য জায়গায় ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষ, যে রকম, স্নায়ুতে গ্লিয়া কোষ তারই অনুরূপ। তবে পিয়ার (Pia) মত, যেখানে তন্তুজাতীয় কলা থাকে, সেখানে ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষ দেখা যায়।

ক্ষত আরোগ্যের রূপরেখা

যে দ্রুততার সঙ্গে ক্যানসারে কোষ বৃদ্ধি হয়, তার চেয়েও দ্রুত কোষ বিভাজন করে শরীর ক্ষত আরোগ্য করে। যেটা আমাদের এ ব্যাপারে জানা নেই, তা হল, এত দ্রুত কোষবৃদ্ধির নির্দেশই বা কি, আর তা কোথা থেকে আসে?

আগে মনে করা হত যে ক্ষত থেকে বিশেষ হর্মোন বার হয়। গাছ-পালায় এ ধরনের বস্তু পাওয়া গেলেও, অন্য প্রাণীর শরীরে তা পাওয়া যায় নি। আবার এর উল্টোদিক থেকে বলা হয়, চালোন (chalones) বলে প্রতিরোধমূলক বস্তু শরীরে থাকে; যার দ্বারা ভ্রূণাবস্থার অতিরিক্ত কোষ বৃদ্ধি প্রতিরুদ্ধ হয়ে যায় বড় হলে। টিউমার বা ক্ষত আরোগ্যে এই বস্তুটি কমে যায় অথবা থাকে না।

এ ছাড়াও কোষগুলির পারস্পরিক সান্নিধ্য, আরো বিভাজন ও বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। ক্ষত আরোগ্যে এথিথিলিয়াম কোষের এগিয়ে আসা ও তারপর বিভাজন বন্ধ হওয়া দেখে এটা বোঝা যায়। সেখানেও একটা খটকা থাকে, কি করে তাহলে, চামড়ার উপর স্তর বজায় থেকে নিচের স্তরে কোষ বিভাজন ও পূরণ হয়। পুষ্টি, হর্মোন ইত্যাদির অনেকটা হাত অবশ্যই আছে; কিন্তু ক্ষতস্থানের নিজস্ব ভূমিকা এর চেয়ে অনেক বেশী।

9 কলাবিশেষে আরোগ্যরীতি

ক্ষত আরোগ্যের যে আলোচনা আগের অধ্যায়ে করা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে ক্ষত সরার আগে যে ফাঁকটার উদ্ভব হয়েছে ক্ষত জায়গাটার মাধ্যমে, সেইটা একেবারে বন্ধ না হলেও ছোট হয়ে যাওয়া দরকার। তবুও যে ফাঁকটুকু থেকে গেল, তা পূরণ করতে নতুন কোষ তৈরি হওয়া এজন্য দরকার।

সংযোজক কলায় আরোগ্য—অস্থি

সঙ্গের ছবিটিতে দেখা যাবে হাড় ভেঙ্গে গেলে কি ভাবে আরোগ্য হয়। পুরো জায়গাটা একই সঙ্গে আরোগ্যের পথে না গিয়ে, মাঝখানটা বাদ রেখে, অস্থির কাছের জায়গা থেকে আরোগ্য সুরু হয়।

অস্থি বা হাড়ে প্রাথমিক অস্থিকলার উপর চুণ বা ক্যালসিয়াম জমা হয়। কিছু কোলাজেন তন্তুও মিউকোপ্রোটিনে সংবদ্ধ থাকে। একে মিউসিন-নবাস্থি বলা হয়। এখানে অস্থিতে যে লবণ থাকে সেই লবণ জমা হয়।

একরকমের অস্থি, যাকে তন্তুজ অস্থি বলা হয়, তাতে কোলাজেন ও অষ্টিওসাইট কোষ ঠিক গোছানো ভাবে থাকে না। এই অস্থি তৈরী হবার সময়, চাদরের মত পাতলা পর্দায় অস্থিবিন্যাস ঘটে। যেমন হয় মাথার খুলি কি চোয়ালে। এ অস্থিকে পর্দার মত অস্থি বলে। ভাঙ্গা হাড় সরার সময় এ রকমও হয়।
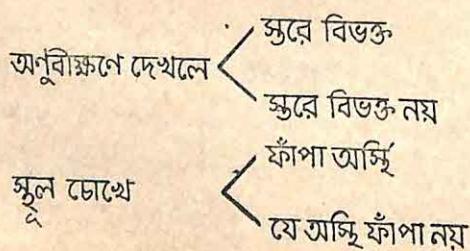
পরতে পরতে অস্থিবিন্যাস দেখা যায় পরিণত অস্থিতে। ছবিতে যে

রকম দেখা যাবে, হেভার্স বর্ণিত নালিকাগুলিকে মাঝে রেখে, শক্ত অস্থি পেরি-অষ্টিয়ামের তলে জমা হতে থাকে। এ অস্থির মাঝের ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় মজ্জা থাকে। দীর্ঘ অস্থিগুলি এইভাবেই বিন্যস্ত হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় ;

পরিণতির দিক থেকে < পর্দার কাঠামোর / তরুণাস্থির কাঠামোর

গড়নের দিক থেকে—লম্বা, চ্যাপ্টা ইত্যাদি।

অস্থি বা হাড় ভাঙ্গার আরোগ্যের স্তর

প্রথম ধাপ—রক্তপাত ঃ চোট লেগে হাড় ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে যাওয়া রক্তনালিকা থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। যদি অস্থির চারিপাশের পর্দা বা পেরিঅসটিয়াম ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে পেশীতে পর্যন্ত রক্ত পৌঁছয়। কখনো কখনো তা অস্থিতে পরিণত হলে তাকে মায়োসাইটিস অসিফিকেনস্ বা পেশীর অস্থিভবন বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় ধাপ—আঘাতজনিত প্রদাহস্ফীতি ঃ স্থানীয় কলা ক্ষতি-গ্রস্থ হওয়ায় প্রদাহ হয়। এর ফলে সেখানে আরো ফাইব্রিন জমা হয়। প্রদাহে যা স্বাভাবিক, রক্ত সঞ্চারে আধিক্য, আরো বেশী করে বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট শ্বেতকণিকার জমায়েত হওয়া, এ সবই দেখা যায়। এর জন্য, রঞ্জন-রশ্মি পরীক্ষায় হাড়গুলিকে একটু হালকাও দেখায়। কারণ, অস্থির ক্যাল-সিয়াম দূর করতে পারে যে অষ্টিওক্লাষ্ট কোষ, তারা দেখা দেয়। প্রদাহ ও আনুষঙ্গিক কার্যকলাপে, হাড়ের গায়ে লেগে থাকা পেরিঅষ্টিয়াম শিথিল হয়ে যায়। এই জন্য এ অবস্থায় লম্বা হাড়ও একটু পেট মোটা দেখায়।

তৃতীয় ধাপ—ভাঙ্গন ঃ ম্যাক্রোফাজ কোষগুলি, জমাট রক্ত, রক্ত-কণিকা, ফাইব্রিন ইত্যাদি সরিয়ে ফেলে। এমনকি অস্থির যে টুকরোর রক্তচলাচল ব্যহত হয়েছে, তাও সরে অষ্টিওক্লাষ্ট, ম্যাক্রোফাজ ইত্যাদি কোষের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

চতুর্থ ধাপ—দানাদার কলা তৈরি ঃ ভাঙ্গনের কাজ শেষ হলে, সূক্ষ্ম রক্তনালিকা তৈরি হতে থাকে পেরিঅস্টিয়ামের ও হাড়ের ভিতরের রক্ত-নালিকা থেকে। পেরিঅস্টিয়ামের ভিতর তলের হাড় তৈরি করার ক্ষমতা

আছে। এর তৈরি নবগঠিত কোষ ও রক্তনালিকা মিলে দানাদার কলা সৃষ্টি করে।

পায়ের উরুর ফিমার বলে যে হাড়, তার গলাটা যখন ভাঙ্গে, তখন ফিমার হাড়ের মাথা—যার পুষ্টি নির্ভর করে পেরিঅস্টিয়ামের উপর—তা বিপন্ন হয় এই পেরিঅস্টিয়াম ছিঁড়লে। পাঁজরার হাড় জোড়া লাগাও পেরিঅস্টিয়াম নির্ভর।

লম্বা হাড় ভাঙ্গলে, হালকা হাড়ের অনেকখানিই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এজন্য স্থানীয় রক্তনালিকা ও হালকা হাড়ের ফাইব্রোব্লাষ্ট, এরাই কার্যভার নেয় বলে পেরিঅস্টিয়ামকে আর ততটা বোঝা বইতে হয় না।

আর একটা কথা : হাড় জোড়া লাগার এই স্তরে স্থানীয় pH এ্যাসিড থাকে।

পঞ্চম ধাপ—তরুণাস্থি তৈরি : যেখানে অস্থি তৈরি হচ্ছে, তার মাঝে যে সব অষ্টিওব্লাষ্ট কোষ আছে, সেইগুলিই পরিণত হয়ে তরুণাস্থি তৈরি হয়। এগুলিকে, বিশেষ করে এর যে অংশটি কঠিন, তাকে বলা হয় ক্যালাস। এর মধ্যে দানাদার কলার আধিক্য থাকলে বলা হয় যে ক্যালাসটা নরম।

অষ্টিওব্লাষ্ট কোষের বুনানির মধ্যে দিয়েই কোলাজেন তন্তু, যার মধ্যে অস্থিজাত মিউসিন থাকে তাতেই অস্থি তৈরি হয়। অস্থি তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে যে রক্তনালিকা থাকে প্রথম অবস্থায়, তার পরিমাণ কমে যেতে থাকে ও এর সঙ্গে সঙ্গে ক্যালসিয়াম জমা হয়। আমরা হাড়ের যে বুনানি দেখি তা এমনিভাবেই তৈরি হয়।

হাড় ভাঙ্গার দিন দশেকের মধ্যে pH বেড়ে ক্ষারের অভিমুখে যায়। এই সময়ই হল ক্যালসিয়াম জমা হবার সময়। এই সময়েই এ্যালকেলাইন ফসফ্যাটেজ জাতের অনুঘটকের প্রাধান্য দেখা যায়। যে কোন ক্ষত আরোগ্যে ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষে এই অনুঘটকের প্রাধান্য দেখা দেয়। অস্থির শেষাংশে এইভাবেই জোড় লাগে। যখন হাড়কে নড়তেচড়তে দেয়া হয় না, তখনই অস্থির বুনানির কাজটা ভাল করে হয়। পরীক্ষায় অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে, নড়াচড়া বন্ধ করা শক্ত হয় বলে, সুগঠিত অস্থির বদলে তরুণাস্থিই থেকে যায়।

অষ্টিওব্লাষ্ট কোষ, নিজেদের একটু পরিবর্তন ঘটিয়ে, তরুণাস্থি তৈরি

করার বিশেষ কোষ কনড্রোব্লাষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এই কোষের মৃত্যু হলে, ক্যালসিয়াস জমা হয়ে শক্ত হয়।

ষষ্ঠ ধাপ—পরতে পরতে অস্থি তৈরি হওয়া ঃ যে তরুণাস্থি মৃত, অর্থাৎ যাতে আর জীবন্ত কোষ নেই, সেই জায়গায় সূক্ষ্ম রক্তনালিকা ও সেই সঙ্গে অষ্টিওব্লাষ্টের আক্রমণ ঘটে। অষ্টিওব্লাষ্ট যে অস্থি তৈরি করে, তা পরতে পরতে তৈরি হতে থাকে। অস্থির ভিতরে যে হেভার্সিয়ান নালিকা থাকে, তা এইভাবে অষ্টিওব্লাষ্ট ও অষ্টিওক্লাষ্টের ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে দিয়েই হয়।

সপ্তম ধাপ—রূপান্তর ঃ অস্থি যখন নতুন করে তৈরি হল, তখন পরিণত কার্যকর অবস্থায় যেমনটি, তেমন তো আর থাকে না। কিন্তু ভাঙ্গা ও গড়া দুই করবার জন্য দুরকম কোষ থাকে। তাদের পারস্পরিক কাজের মধ্যে দিয়েই ঠিক যেমনটি হতে হবে, তা হয়ে ওঠে।

অস্থির ক্ষত আরোগ্যে অস্বাভাবিকতা

তন্তুজাতীয় বস্তুর মাধ্যমে জোড়া লাগা ঃ অস্থি সৃজন করে যে কোষ, যার নাম অষ্টিওব্লাষ্ট, সেই কোষের বহুবিধ রূপান্তর সম্ভব। নড়াচড়া একেবারে বন্ধ থাকলে তৈরি হয় হাড়। সামান্য নড়া থাকলে হয় তরুণাস্থি। আরো বেশী চলাচল হলে সেই কোষই ফাইব্রোব্লাষ্ট হয়ে তন্তুজাতীয় কলা তৈরি করে। কখনো হাড় এইরকম কলার মাধ্যমেও জোড়া লাগতে পারে। তবে নড়াচড়া খুব বেশী হলে সেই জায়গাটা একটা জোড়ের মুখের মত হয়ে যেতে পারে।

জোড়া না লাগা ঃ হাড়ের যে জায়গা থেকে দু'টুকরো হয়ে গেছে, সেই জায়গায় যদি মাংসপেশী বা অন্য কোন নরম জিনিস থেকে যায়, তাহলে হাড় আর জোড়ে না।

দেরীতে জোড়া লাগা ঃ অনেকগুলি কারণে হাড় জোড়া লাগতে দেরী হতে পারে। এই কারণগুলি হল ঃ

নড়াচড়া ঃ সংযুক্তির পক্ষে, যে কোন রকম নড়াচড়াই খারাপ। তার কারণ, দানাদার কলা তৈরি বন্ধ করে, তা প্রদাহস্ফীতির সূচনা করে। হাড়ের দুটি টুকরো যদি একটি আর একটির সঙ্গে গেঁথে যায়, তাতে

নড়াচড়াটা কম হয়। ওয়াটসন জোনস দেখিয়েছেন যে খুব জোরালোভাবে ধরা থাকলে আরোগ্য ত্বরিত হয়।

সংক্রমণ : বীজাণু সংক্রমণ হলে প্রদাহস্ফীতি তো হবেই ও তারই জন্য সারতে দেরী হয়। জলীয় বস্তু জমা হয়ে, প্রদাহস্ফীতির ফলে চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে রক্তাল্পতা হয়ে, অস্থি মৃতকল্প হতে পারে ও তার জন্য আরোগ্যে দেরী লাগে।

রক্তাল্পতা : একেবারে রক্তচলাচল বন্ধ হলে, সেই অস্থি তো মরেই যাবে। যেখানে রক্তচলাচল কম, সেখানকার জুড়তে দেরী হয়। জংঘাস্থির গলদেশের ভাঙ্গায়, ঠিক এই ভয়ই থাকে। বৃদ্ধ বয়সে হাড় ভাঙ্গলেও ওই একই সমস্যা।

সহজে হাড় ভাঙ্গা : হঠাৎ অস্বাভাবিক চাপ পড়ে, সুস্থ স্বাভাবিক হাড়ও ভেঙ্গে যেতে পারে। এ হতে দেখা যায় ধনুষ্টঙ্কার রোগে, ষ্ট্রিকনিনের বিষক্রিয়ায়, অথবা মানসিক ব্যাধিতে, যখন ECT. শক দেয়া হয়। এতে মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙ্গে যেতে দেখা গেছে।

বিকারগ্রস্থ হাড় ভাঙ্গা : স্বাভাবিক চাপে যখন হাড় ভেঙ্গে যায় তখন তাকে এই নামই দেয়া হয়। কোন কোন বিশেষ ব্যাধিতে অস্থির বিকার দেখা যায়। এ রকম ব্যাধি হল, অষ্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা, হাইডেটিড সিষ্ট, বিশাল কোষবিশিষ্ট টিউমার। অন্য জায়গায় হওয়া ক্যানসার যখন অস্থিতে ছড়ায়। তবে এ রকমের ভাঙ্গা সহজেই জোড়ে।

তরুণাস্থি : তরুণাস্থি যখন ভাঙ্গে তা সহজে জুড়তে চায় না। কোন সন্ধির মুখে যে তরুণাস্থি আছে, তা অল্পমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্থ হলে, সহজে সারে। কিন্তু ক্ষতটা বেশী হলে, সেখানে অস্থি জন্মে যায়।

পেশীর কণ্ডরা বন্ধনী (tendon) : গতি মন্থর হলেও কণ্ডরার আরোগ্য ভালই হয়। তবে অংশগুলির বিচ্ছিন্নতা যেন না থেকে, তার বদলে উপযুক্ত সংযোগ থাকে ; তাতে আরোগ্য দ্রুত হয়।

পেশী : পেশীর সম্পর্কে বলা হয়, যে নতুন করে পেশী তৈরি হয় না। তার বদলে ছিন্ন পেশী তন্তুজ ক্ষত চিহ্নের মাধ্যমে জোড়ে। এর উপযুক্ত উদাহরণ হল পাকস্থলীর ক্ষত সারায়। যদিও ভ্রূণাবস্থার বাইরে পেশী আর নতুন করে তৈরি হতে চায় না, তবু আবার এটাও দেখা যায় যে দানাদার

কলা তৈরি হবার সময়ে যে রক্তনালিকাগুলি হয়, তাদের পেশী কিন্তু সুগঠিত হতেই দেখা যায়। কি করে যে এটা হয়, তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

যে পেশীকে মসৃণ পেশী বলা হয়, অর্থাৎ অস্থি-সংযুক্ত পেশী যেগুলি নয়, যেমন অন্ত্রের, সেইসব পেশী পুরোপুরি সারতে দেখা যায়। এমনকি হাজার দশেক কোষ বিনষ্ট হবার পরেও এদের সারতে দিন পনেরোর বেশী লাগে না। অণুবীক্ষণে দেখলে, কখনো যে ক্ষত হয়েছিল, বলেই বোঝা যায় না।

অস্থি-সংলগ্ন পেশীতে যদি একটিমাত্র খেই নষ্ট হয়, সেখানে জোড়া লাগে ঠিকই। কিন্তু সেই একটি খেই অনেকটা হৃৎপিণ্ডের বা অন্ত্রের পেশীর মতই হয়। এই ধরনের বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষ হতে দেখা যায় যখন অক্সিজেনের অভাবে অথবা টক্সিন অভিহিত বিষে কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হৃৎপিণ্ডের পেশীর সারার ক্ষমতা নেই। সেইজন্য একবার করোনারি ধমনীর মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে হৃৎপিণ্ডের পেশীতে যে ক্ষত হতে দেখা যায়, সেটা ক্ষতচিহ্ন হয়েই থেকে যায়। গাঁটে ব্যথা হয়ে যে রিউম্যাটিক জ্বর হয়, তারপরে এ্যাসফ (Asholf) বর্ণিত বহুনিউক্লিয়াসের রাক্ষুসে কোষও এই-ভাবে হৃৎপিণ্ডে তৈরি হয়েছে বলেই মনে করা হয়। সার্জারির পরে পেশীর চারিদিকে যে সারকোলেমা ঘেরাটোপ থাকে, তা জুড়ে গেলে, কাজের আর অসুবিধা হয় না।

অস্থি মজ্জা ঃ এই একটি কলা, যেখানে যখম পুরোপুরি সেরে যায়।

চর্বি ঃ যে জায়গায় স্বাভাবিক অবস্থায় চর্বি থাকে, তার অংশবিশেষ যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহলে সেই অংশ তন্তুজাতীয় কলায় পূরণ হয়। ক্ষত সারার পরবর্তী স্তর যাকে অপসরণের স্তর বলে, সে সময়ে ম্যাক্রোফাজ কোষগুলি চর্বি আহরণ করে মোটা মোটা হয়ে ওঠে। এদের ফেনার মত কোষ বলে। চর্বি জমে কোষের ও কলার যে মৃত্যু হয় এটি তাই।

পেরিটোনিয়াম ইত্যাদি জায়গায় ঃ সন্ধির চতুপার্শ্বে যে সাইনো-ভিয়াল পর্দার কলা, তার আরোগ্য হয় না।

রক্তনালিকার অভ্যন্তরীণ অংশে ঃ তথাকথিত এ্যাথিরোমা হয়ে বৃহৎ রক্তনালিকা কিভাবে জখম হয়, বহুপ্রকার পরীক্ষাই করা হয়েছে তার। খরগোসের মহাধমনীর ভিতরের একাংশ যদি জখম হয়, তবে কোষ বিভাজন হয়ে ধীরে ধীরে তা সেরে যায়। তবে তাতে একবছর পর্যন্ত লেগে যেতে

পারে। তবে আবার দেখা গেছে যে বেবুনের মহাধমনীতে কোন কৃত্রিম ধমনীর অংশ বসালে, হপ্তা দশেকের মধ্যে তা সেরে যায়।

মনে করা হয়, ভ্রাম্যমান একটি নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট কোষই এই রকমের আরোগ্যের মূলে। তবে তার বিরুদ্ধে বক্তব্য হল, রক্তনালিকার ভিতরের কোষগুলি ফাইব্রিনকে ভাঙ্গতে পারে। কিন্তু একনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষ তা পারে না।

স্নায়ু কলা

বয়স্কদের স্নায়ুকোষের আর বিভাজন হয় না। তাই জখম হলে তার সারার সম্ভাবনা কম। তবে কোন কোন উভচর প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পুরো ল্যাজটা কাটা গেলে তা আবার গজায়। পরে তার স্নায়ুও জন্মায়। এসব প্রাণীতে মেরুদণ্ডও গজাতে পারে। মানুষে তা হয় না।

বহিঃস্নায়ুঃ বাইরে বার হয়ে এসেছে মেরুদণ্ডের ভিতর থেকে যে স্নায়ু, তা জখম হলে, আমরা যাকে ক্রেমেটোলিসিস বলি তাই হয়। এতে কোষটি বড় হয়ে ওঠে ও এর নিসিল কণিকাগুলি চলে যায়। এর ফলে স্নায়ু কোষের প্রোটিন বিপাক বিপর্যস্ত হয়। স্নায়ুর চারিপাশে ঘেরা আচ্ছাদন, তাও ভেঙ্গে যায় আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। এতে যে মাইলিন থাকে, তাও টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সোয়ান কোষ নষ্ট হয়ে ফোঁটা ফোঁটা চর্বি হয়ে যায়। এই বিনষ্টির বর্ণনা ভালাবের দেয়া। তারপর আবার যখন স্নায়ুর পুনর্জন্ম হয়, তখন স্নায়ুর যে এ্যাক্সন স্থত্র, তাই থেকে আরো ছোট ছোট স্থত্র বার হয়ে আসে। এগুলি সোয়ান কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে দিয়ে পথ করে নেয়। এদের বৃদ্ধি দিনে এক মিলিমিটার। এমনিভাবে, কয়েকটি স্থত্র যেথানে যাবার কথা সেখানে পৌছে যায়। স্নায়ুর কাটা অংশ লাগিয়ে রাখলে তবেই অনুরূপ আরোগ্য হয়। শেষ পর্যন্ত, চারিদিকের মাইলিন ঘেরা আচ্ছাদন আবার আগের মত হয়ে যায়। স্নায়ু পুরো সংবাহী (sensory) বা পুরো কর্মনির্বাহী (motor) হলে ভাল সারে। যে স্নায়ু দু' কাজই করে তার আরোগ্য কম হয়।

প্রধান স্নায়ুমণ্ডলীঃ মস্তিষ্ক ও প্রধান স্নায়ুমণ্ডলীতে ক্ষতি হলে তার পূর্ণ আরোগ্য সহজ নয়। তবু দেখা গেছে, যে কিছু উন্নতি ঘটে। যেমন মেরুদণ্ডে যদি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়, দেখা গেছে ছ' মাস থেকে এক বছরের

মধ্যে পেশীর শক্তি অনেকটাই ফিরে আসে। মনে করা হয়, যে পথগুলি জখম হয়নি, সেইসব স্নায়ুপথ দিয়েই সারার পর সংবেদন ও সাড়ার চলাচল ঘটে। তা ছাড়া কিছু নতুন পথ তৈরিও হয়ে যায়। পিছনের শিকড়ে উদ্ভূত মেরুদণ্ডের থেকে নতুন উদ্ভূত স্নায়ু এই কর্মভার গ্রহণ করে। নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীদের মেরুদণ্ডে উদ্ভূত স্নায়ুতে তো বটেই, এমনকি অক্ষিস্নায়ুতে পর্যন্ত মেরামতির কাজ হতে দেখা যায়। এর কতকটা মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। স্নায়ু সৃজনের উত্তেজনা জাগায় এমন টিউমার আছে। সাপের বিষে ও লালাগ্রন্থীতেও এ ক্ষমতা আছে।

বহিঃত্বকের আরোগ্য

কথাই আছে যে কলার কার্যক্ষমতায় যত বিশিষ্টতা বেশী থাকে, তার আরোগ্যক্ষমতা ততই সীমাবদ্ধ। সেদিক থেকে দেখলে ত্বকের আরোগ্য দুঃসাধ্য হবারই কথা ছিল। কিন্তু আবার এও ঠিক, যে অংশে যত বেশী জখম হবার সম্ভাবনা, সেই কলা তত বেশী সারেও। ত্বকের সম্পর্কে এই কথাই বলা যাবে।

স্বেদগ্রন্থী, চুলের গোড়া, ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গেলে আর নতুন করে জন্মায় না। তবে পাশ ও তলা থেকে কোষ বিভাজন হয়ে যে ফাঁক জায়গা থাকে তা ভরে যায়। খাদ্যনালির ক্ষতও এইভাবে সারে। সব সময়ে কোষ বিভাজন না হলেও, কোষের আগমনের ফলেও ক্ষতস্থান পূরণ হয়।

পাকস্থলী ঃ পাকস্থলীর আরোগ্য ভাল। চর্মে যেমন কোষের বিভাজন সম্ভাবনা কম, পাকস্থলীর কোষে কিন্তু বিভাজন সম্ভব। যেমন পাকস্থলীতে ক্ষত যথেষ্টই হয়। কিন্তু সেরে যাবার পর আর ক্ষতচিহ্ন থাকে না। অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী পাকস্থলীর ক্ষত যেন সারতে চায় না। কিন্তু তার কারণ কি জানা নেই। এক্ষেত্রে যখন সারে, তখন কোষগুলি অন্ত্রের মধ্যে যেমন আঙ্গুলের মত ভিলাই দেখা যায়। সেই রকমের হতে দেখা যায়।

মূত্রথলি

পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষত উৎপাদন করলেও মূত্রথলীতে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ক্ষত সেরে যায়। ক্ষতগহ্বরের উপরেও কোষ জন্মে গহ্বর ভেতরে থাকলেও ক্ষত সেরে যায়।

ট্রানজিসানাল অর্থাৎ উভসম্ভব যে কোষ মূত্রথলিতে থাকে, তার বিভাজন সহজ। কুকুরের ক্ষেত্রে মূত্রনালিকা থেকে এই কোষ উপরে উঠে মূত্রথলির ক্ষত সারিয়ে ফেলে। এইজন্য প্যাপিলোমা জাতের টিউমার যাতে অস্ত্রপচারের পর আবার না হয়, এ জন্য মূত্রনালিকার (ureter) বদলে সেখানে শিরা অধিরোপন করা হয়।

পিত্তথলি ঃ এখানে কোন ক্ষত হলে তা ভালভাবেই সেরে যায়।

শ্বাসযন্ত্র ঃ শ্বাসযন্ত্রের কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হলে অবিলম্বে সেখানে কোষ বিভাজন সুরু হয়ে যায়। তারফলে সেখানে সিলিয়া আছে, এইরকম স্তম্ভসদৃশ লম্বা লম্বা কোষ, যেটা সেখানে স্বাভাবিক, তাই জন্মায়।

গ্রন্থীকোষের আরোগ্য

লিভার/যকৃত ঃ যকৃতের আরোগ্য ক্ষমতা অসাধারণ। কোন এক জায়গার কিছু কোষ হয়ে গেলে দু' সপ্তাহের মধ্যেই তা সংখ্যায় ও মাপে সমান হয়ে যায়। এই কোষ বিভাজন খুব সরল নয়। কারণ এর মধ্যে দিয়েই যকৃতের কোষ, পিত্তনালিকার কোষ, রক্তনালিকা ইত্যাদি, যেখানে যেরকম হবার কথা, ঠিক ঠিক তৈরি হয়ে যায়।

মানুষের ক্ষেত্রে যকৃতে সিরোসিস হয়ে কোষগুলির মৃত্যু ঘটলেও নতুন কোষের জন্ম সম্ভব। অবশ্য রোগী যদি ততদিন বাঁচে।

যকৃতে কোষের মৃত্যু তিনরকম ভাবে হতে পারে।

সামান্য মৃত্যু (focal necrosis) ঃ বিভিন্ন যায়গার কিছু কিছু কোষ নষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন রকমের জ্বরে এ হতে পারে, যেমন টাইফয়েড কি নিমোনিয়া। এ রকম ঘটার কারণ কাপ্ফার (Kuffer) কোষের উপর বীজাণু আক্রমণ। জায়গায় জায়গায় এরকম হয়ে, সেই জায়গার কাছের কোষগুলির মৃত্যু হয়। এ কোষগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়ে আবার সেরে ওঠে।

স্থানীয় মৃত্যু (zonal necrosis) ঃ এখানে ক্ষুদ্র লোব (lobule)-গুলির বেশ কিছু কিছু অংশ সারা যকৃত জুড়েই মরে যায়। অনেক রকমের বিষক্রিয়ায় এ রকম হতে দেখা যায়। ফসফরাসের বিষক্রিয়ায় এই চিত্র দেখা যায়। তাছাড়া এক্লেম্পসিয়া রোগেও এ রকম হয়। যকৃতের মধ্যাংশে অনুরূপ ঘটনা ঘটে কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের বিষক্রিয়ায়, ক্লোরোফর্ম সিঙ্কোফেন, ইত্যাদি বস্তু বিষক্রিয়ার পর্যায়ে গেলে, এই চিত্র দেখা যায়।

মধ্যাংশের বদলে বহিরাংশের ক্ষতি হয় ফসফরাস বিষক্রিয়া ও এক্লেম্প-সিয়াতে। বারবার ক্ষতিগ্রস্থ না হলে, দৃশ্যতঃ যকৃতের কোন পরিবর্তন হয় না।

গুরুতর ক্ষতি ও মৃত্যু (massive necrosis) ঃ এতে যকৃতের প্রায় পুরোটাই ক্ষতিগ্রস্থ হতে দেখা যায়। বিষক্রিয়া যদি গুরুতর হয়, তাহলে এ রকম হতে পারে। গুরুতর রকমের ভাইরাসজনিত যকৃতের ব্যাধিতে এ রকম হয়। এ রকম হলে রক্তের ভিতরে পিত্ত চলে গিয়ে, তারই ফলে রোগীর মৃত্যু হতে দেখা যায়। শবব্যবচ্ছেদে দেখা যায় যে যকৃত ছোট হয়ে গেছে, যকৃতের আচ্ছাদন (পর্দা) কোঁচকানো। কাটলে ভিতরটা নরম ও হলদে দেখায়। একে হলুদ রংয়ের সঙ্কোচন বলে (yollow atrophy)। এই ক্ষতিও যদি ধীর গতিতে হয়, তাহলে কিছুটা আরোগ্য সম্ভব। এই অবস্থায় যকৃতের কোন কোন জায়গায় মৃত্যুর চিহ্ন নিয়েই অন্য জায়গাগুলি বেঁচে থাকে। একে মাঝারি ধরনের হলুদ সঙ্কোচন (subacute yellow atrophy) বলে অভিহিত করা হয়।

এই অবস্থা থেকে সারলেও, যকৃতে ক্ষতচিহ্ন থেকে যায়। এর স্থানীয় মৃত্যুর রেখে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন (post necrotic scarring বা cirrhosis) বলে।

যকৃতের সিরোসিস্ (cirrhosis) ঃ এ নামটি দিয়েছিলেন যে লেখক পিঙ্গল রংয়ের জন্যই এ নাম দিয়েছিলেন। এতে যা হয়, তা হল তন্তুজাতীয় কলায়, যকৃতটা ভরে যায়। এর ফলে লিভারের স্বাভাবিক গঠন বিপর্যস্ত হয়। যকৃতের স্বাভাবিক কোষের সঙ্গে তন্তুজাতের কলা সমান তালে জন্মাতে থাকে।

সিরোসিসকে একটি চরম অবস্থা ধরতে হবে। এর কারণও বহুবিধ। এগুলির মধ্যে আছে বিষক্রিয়া, মদ্যপান, খাদ্যাভাব, সংক্রামণ, জিন সংক্রান্ত ত্রুটি, ইত্যাদি। এর বর্ণনামূলক শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন আছে।

স্থানীয় অংশবিশেষে ঃ যে বড় অংশে সিরোসিস হয়, তার বর্ণনা কিছু কিছু করা হয়েছে। এই ধরনের সিরোসিসে, যকৃতের এক একটি অংশ, যাকে নোড (node) বলা হয়, তার কয়েকটি একসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

পোর্টাল সিরোসিস ঃ একে লেখক বর্ণিত সিরোসিস বা ক্ষুদ্রতর নোডগুলির সিরোসিসও বলা হয়। এখানে একই সঙ্গে তন্তুজাতীয় কলা ও পাশাপাশি সেরে উঠেছে, এমন কলার সমাবেশ দেখা যায়। অন্য কারণে

হতে দেখা গেলেও মদ্যপানজনিত সিরোসিসে এই চিত্র দেখা যায়। চর্বি-জাতীয় কলা এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে জমা হতে দেখা যায়। এর ফলে কোষগুলির মৃত্যু হয় ও সেখানে তন্তুর সমাবেশ ঘটে।

উপরোক্ত সিরোসিস ও এই ধরনের সিরোসিসে কোন বিশেষ পার্থক্য আছে মনে হয় না। তাই কতটা জায়গা নিয়েছে, কোন ধরন, তা ভাবার চেয়ে অণুবীক্ষণে এর চেহারাটা কি, এটাই ভাবতে হবে।

হৃদযন্ত্র ঘটিত সিরোসিস : অপেক্ষাকৃত তরুণদের মধ্যে যারা হৃদ-যন্ত্রের পীড়ায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছে, তাদের যকৃতের লোবের মধ্যাংশে তন্তু-জাতীয় কলার প্রাধান্য দেখা যায়। এই সিরোসিস মধ্যভাগে সুরু হয়ে ক্রমশঃ বহির্ভাগে ছড়ায়।

পিত্তনালিকা কেন্দ্রিক সিরোসিস : (Billiary cirrhosis) যদি দীর্ঘদিন ধরে রোগী পাণ্ডুরোগে (jaundice) ভোগে, ও পিত্তরস যদি বার হয়ে না যেতে পারে, তা হলে সেই রস, ভিতরের কোষগুলিকে প্লাবিত করে সেখানে প্রদাহস্ফীতির সূচনা করে। এতে কিছু কিছু স্থানীয় কোষের মৃত্যু হয়ে সেখানটা তন্তু জাতীয় কলায় পূর্ণ হয়ে যায়।

বেশ কয়েকটি কারণের উপর যকৃত কতটা সেরে উঠতে পারবে, তা নির্ভর করে। এগুলি হল :

বয়স : অল্পবয়সী প্রাণীদের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কম বয়সে আরোগ্য দ্রুততর হয়।

রক্তচলাচলে কোনরকম বাধার সৃষ্টি হলে ক্ষত সারায় বাধার সৃষ্টি হয়। যকৃতেও রক্তচলাচল যখন হৃদযন্ত্রের কোন ত্রুটির জন্য ব্যহত হয়, তখন যে সিরোসিস হতে পারে, তা আলোচিত হয়েছে।

স্বাভাবিক গঠন যে কোন দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হলে আরোগ্য হতে চায় না।

সিরোসিসও সবরকম আরোগ্যে বাধা দেয়।

পিত্তনালিকায় বাধা বা পাথুরি থাকলেও যে কোন আরোগ্যই বাধা পায়।

কোন ছোট ক্ষত, অথবা যখন পরীক্ষার জন্য যকৃতের ছোট একটি টুকরো কেটে নেয়া হয়, তখন তা খুব দ্রুত আরোগ্য হয়। তবে মনে করা হয় যে, যকৃতে আরোগ্যের যে প্রেরণা, তা বিপাকক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রক্তে কোন উত্তেজক দেখানো সম্ভব হয়নি। এর বিপরীতও মনে করা হয়। তা হল,

পুরো যকৃত থেকে, আর যাতে তার বৃদ্ধি না ঘটে, এমন বস্তু বার হয়। কোন জায়গা ক্ষতিগ্রস্থ হলে, এই নিরোধক বস্তু না থাকায়, আরোগ্য তরান্বিত হয়।

থাইরয়েড ঃ থাইরয়েড হর্মোন আরোগ্যের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারবে। নিজেও আরোগ্য লাভ করে সহজে।

কিডনি ঃ কিডনির আরোগ্য সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এমন কি দেখা গেছে একটি কিডনি বাদ চলে গেলে, অন্য কিডনি বড় হয়ে ওঠে। তবে নেফ্রন বলে যে এককগুলি দিয়ে কিডনি তৈরি, তার সংখ্যা কিন্তু এতে বাড়ে না। যেগুলি বাড়ে তা হল গ্লোমোরিউলাস ও টিবিউলের কোষ সংখ্যার বৃদ্ধি। তরুণ বয়সে ও পুষ্টি যথেষ্ট থাকলে এই বৃদ্ধি বেশী হয়।

কোষবিভাজনজনিত স্ফীতি ও পুনর্জন্ম (hyperplesia and regeneration) ঃ দুটিরই মূলে কোষ বিভাজন। কিন্তু তবু কত তফাৎ দুয়ে। তবে তফাৎটা ঠিক কোথায়, তা জানা নেই। দুয়েই উত্তেজনা যোগায় যেন কোন হর্মোন। কিন্তু তবু তা থেকে খুবই ভিন্ন। কোষ বিভাজন হয়ে নতুন কোষ হতে থাকে বন্যার মত। কিন্তু পুনরুজ্জীবনের একটা ছন্দ ও যতি আছে। বিভাজনজনিত বৃদ্ধিতে যেন তা নেই। তবু এ বোঝাটা সহজ নয়। এটা বুঝলে হয়ত বোঝা যেত ক্যানসার কি।

10 দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহস্ফীতি

কোন জায়গায় আঘাত লাগলে, তার পরবর্তী এক এক করে তিনটি ধাপ। প্রথমটি রক্তনালিকায়, তার পর পরিষ্কার করার কাজ ও শেষ ধাপ আরোগ্য। এর মধ্যে দ্বিতীয় ধাপে ম্যাক্রোফাজ জাতীয় কোষের প্রাধান্য লক্ষ্য করবার। সেরে ওঠা তখনই সম্ভব, যখন প্রদাহস্ফীতির কোন কারণই আর থাকে না। কিন্তু মাঝের ওই পরিষ্কার করার ধাপে, পরিষ্কার না হয়ে যদি ক্ষতিকর কোন বস্তু থেকে যায়, তাহলে এই তিন ধাপের একটা মিশ্র পরিণতি, যাকে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহস্ফীতি বলে, তাই দেখা যায়।

তাই দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহস্ফীতির সংজ্ঞা দিতে গেলে বলা যায় যে, এ হল এমন একটি দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা, যাতে প্রদাহের অবস্থার ভাঙ্গাচোরা সারিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় গড়া চলতে থাকে একই সঙ্গে।

কারণ ঃ দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহস্ফীতির কারণ হিসাবে বলা যায়, যে কোন উত্তেজক, যার দ্বারা কোষ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, তা যদি অপসারিত না হয়ে থেকে যায়, তা হলে প্রদাহস্ফীতি দীর্ঘস্থায়ী হবে। কিছু কিছু বীজাণু যেমন টিউবারকুলোসিস বীজাণু এই ধরনের প্রদাহের জনক। তাছাড়া এ্যালার্জির মত কিছু কিছু সংবেদনশীল অবস্থায় এ ধরনের প্রদাহ হয়। আত্মপ্রতিরোধ মূলক (auto-immune) সংবেদনশীলতাও এর কারণ হতে পারে।

শ্রেণীবিভাগ

রোগ অনুযায়ী ঃ কিছু মারাত্মক ও তাৎক্ষণিক প্রদাহস্ফীতিও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দাঁড়াতে পারে। এর উদাহরণ হল অস্থিপ্রদাহ, যাকে অষ্টিওমায়লাইটিস (osteomylitis) বলে। টিউবারকুলোসিস বীজাণুরও এই ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে। এমনি আরো কিছু রোগের কথা আগে বলা হয়েছে।

বিশেষ কারণ অনুযায়ী ঃ পূর্ব প্যারাগ্রাফে যেমন বলা হল, টিউবারকুলোসিসের মত বিশেষ রোগ, চিংড়িমাছ বা অনুরূপ বিশেষ খাদ্য সামগ্রী, বিশেষ ধূলো বা ফুলের রেণু সম্পর্কে শ্বাসনালীর সংবেদনা, ইত্যাদি

বিশেষ কারণের মধ্যে পড়ে। তেমনি আবার টিউবারকুলোসিসের মত রূপ হলেও এই বীজাণুর জন্য নয়, এ রকম প্রদাস্ফীতি যার বিশেষ বীজাণুজনিত কারণ নেই, এ রকমের প্রদাহও দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখা যায়। তাই কারণের দিক থেকে বিশেষ ও তা নয়, অর্থাৎ অবিশেষ এ রকম শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব।

সূক্ষ্ম গঠন অনুযায়ী—Histologicalঃ শ্রেণীবিভাগও করা হয়েছে। যখন বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট পলিমর্ফনিউক্লিয়ার কোষ দেখা যায়, তখন দীর্ঘস্থায়ী, পুঁজ আছে, এমন প্রদাহ বলা হয় তাকে (pyoganic)। আবার এপিথিলয়েড কোষের সংখ্যাধিক্য থাকলে, যে রকম নাকি টিউবারকুলোসিসে থাকে, তাকে টিউবারকুলয়েড ধরনের প্রদাহ বলে। এর মধ্যেও আবার ভাগ আছে।

পুঁজ নেই, শুকনো টিউবারকুলয়েড ধরন, একে সারকয়েডের মত বলা হয়। কেজিনের মত পুঁজ জমাট, এই রকম টিউবারকুলোসিসের প্রদাহ।

পুঁজ আছে টিউবারকুলোসিসে, এ রকমের প্রদাহও দেখা যায়। এতে বহুনিউক্লিয়াসে আছে এমন কোষ ও এপিথিলয়েড কোষ দুই দেখা যায়।

কোন কোন দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে, দানাদার কলার আধিক্য দেখা দেয়। একে দানাদার কলাযুক্ত প্রদাহ বা গ্রানুলোমা (granuloma) বলে। এর কারণ টিউবারকুলোসিস বা সিফিলিস, ইত্যাদি। অবশ্য কুষ্ঠরোগেও এ রকম দেখা যায়। বীজাণু নয় এ রকম বস্তু, যেমন টালকাম পাউডার কণা, বালু বা সিলিকার কণা শরীরে প্রবেশ করে, এ ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি করে।

গ্রানুলোমা বা দানাদার প্রদাহঃ এর সঠিক বর্ণনা কমই আছে। এতে ম্যাক্রোফাজ ধরনের কোষের আধিক্য। তবে কেউ কেউ বলেন, এখানে এপিথিলয়েড কোষও বহুনিউক্লিয়াস আছে এমন কোষ থাকে। টিউবারকুলয়েড ও গ্র্যানুলোমা, এক অর্থেও ব্যবহার করা হয়।

দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহস্ফীতির সাধারণ রূপ

বিভিন্ন স্থান ও কলা অনুযায়ী স্থায়ী প্রদাহস্ফীতির বহুবিধ ভিন্নতা দেখায়। এটা নির্ভর করে, কোন্ জায়গায় প্রদাহটা, তার উপরে নির্ভর করে রূপ নেয়।

তাৎক্ষণিক বা গুরুতর প্রদাহস্ফীতির লক্ষণও কিছু কিছু স্থায়ী প্রদাহে

দেখা যায়। যেমন পুঁজের মধ্যে বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ অনেক জায়গায়, যেমন ফুসফুসের আচ্ছাদক প্লুরার প্রদাহে, অস্থির অষ্টিওমায়লাইটিসে এ লক্ষণ দেখা যায়। ফাইব্রিন থাকে প্রচুর, অণুবীক্ষণে দৃশ্যমান অবস্থায়।

শুধু বহুনিউক্লিয়াস কোষই নয়, এ্যাসিড রঞ্জক ভালবাসে, এমন ইয়োসিন রঞ্জিত কোষও অনুরূপ প্রদাহে দেখা যায়। এলার্জি ও অতিসংবেদনায়ও এই কোষের আধিক্য থাকে।

রস নিষ্ক্রমণ এই প্রদাহে খুব বেশী হতে দেখা যায়। এর জন্য প্রোটিনের অভাবও ঘটতে পারে। যেমন হয় টিউবারকুলোসিস-জাত পেরিটোনিয়ামের স্ফীতিতে।

ভাঙ্গনের কাজঃ মারাত্মক বা তাৎক্ষণিক প্রদাহে যেমন প্রদাহাবস্থা দূর করতে, কিছু ভাঙ্গনের কাজও চলে, এখানেও তাই। এই কাজের প্রধান ভারপ্রাপ্ত কোষ বলা যায় ম্যাক্রোফাজ কোষ। এগুলি অস্থিমজ্জার ভিতরে জন্মায়। রক্তে যে একনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট মনোসাইট কোষ থাকে, সেগুলি বিভাজন স্থগিত রাখে ও এদের বদলে আসে ম্যাক্রোফাজ।

যেখানে ম্যাক্রোফাজের সংখ্যা বেশী তাকে বর্ধনশীল (proliterative) ভাঙ্গনের কাজ বলা যায়। কথা দুটির বৈপরীত্য লক্ষণীয়। কারণ এই ভাঙ্গন তো গড়ার কাজও বটে, তাই এ চিত্র।

একনিউক্লিয়াসযুক্ত কোষের আধিক্য বিশেষ ধরনের সংবেদনশীলতায় অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী (delayed type) ধরনের সংবেদনশীলতায় দেখা যায়। এই কোষগুলি যখন আরো বড় হয়ে বহু কোন বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, তার নিউক্লিয়াস লম্বাটে ও ফ্যাকাসে হয়ে, বহিঃত্বকের এপিথিলিয়াম কোষের সঙ্গে এই কোষের দৃশ্যতঃ মিলের জন্যই এই কোষগুলিকে এপিথিলয়েড কোষ বলে। ম্যাক্রোফাজ কোষ যখন অন্য বস্তুকে গ্রাস করেনি, তখন তা এপিথিলয়েড কোষে পরিণত হতে পারে। এপিথিলয়েড কোষ অন্য বস্তু গ্রাস না করলেও, জলীয় বস্তু গ্রহণ করতে পারে। টিউবারকুলোসিসে যে গ্র্যানুলোমা হয়, তাতে এপিথিলয়েড কোষকে থাকতেই হয়। ছোট ছোট কণাগুলিকে এই কোষ আত্মস্থ করতে পারে। এদের আয়ু হপ্তা চারেক মাত্র।

ম্যাক্রোফাজ কোষ, যখন কিছুতে দ্রবীভূত হবে না, এমন বস্তুকে আত্মস্থ করে, তখন সেই বস্তু কোষে জমা হয়ে, কোষটি রাক্ষুসে কোষে পরিণত হয়।

এ কোষে, দেখতে ফ্যাকাসে নিউক্লিয়াস থাকলেও ডি-এন-এ বিপাক ব্যাহত হয় না। কোষ বিভাজনও হয়ে, নতুন রাক্ষুসে কোষ সৃষ্টি হয়।

বাইরে থেকে শরীরে ঢুকেছে, যেমন ক্যাটগাট কি সিল্কে রাক্ষুসে কোষ জন্মাতে সাহায্য করে। তা ছাড়া কোলেস্টেরল কি ইউরিক এ্যাসিড কেলাসের চারিদিকেও এই কোষ দেখা যায়।

অনেক রকমের রাক্ষুসে কোষ দেখা যায়। এর মধ্যে একরকমের আছে যার নিউক্লিয়াসটা ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে অথবা গোল। এদের বলে ল্যাঙ্গহানের কোষ। টিউবারকুলোসিস বীজাণুর আক্রমণে এ রকম কোষ দেখা যায়। ভিন্ন গোত্রের কোন বস্তু থাকলে, তার জন্য এক বিশেষ ধরনের রাক্ষুসে কোষ দেখা যায়। এর নাম ভিন্ন গোত্রের সাড়া জাত রাক্ষুসে কোষ (Foreign body giant cell)।

কিভাবে সারে—আরোগ্য ঃ যে দানাদার কলা আরোগ্যের সূচক, তাতে নানা রকমের কোষ থাকে। ঐগুলি হল—

১। ত্বকের কোষ, যা দিয়ে রক্ত ও নাসিকানালিকা তৈরি হয়।

২। ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষ, যা কোলাজেন তৈরি করে।

৩। গোল ছোট কোষ, যা লিম্ফোসাইট ও প্লাজমা কোষ তৈরি করে।

দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে পুঁজের চারিদিকে দানাদার কলা তৈরি হবার সময় থাকে। একে পুঁজ উৎপাদক পর্দাও বলা হয়। এ পর্দায় প্রচুর রক্তনালিকা থাকাতে, এখানে রক্তপাত যথেষ্টই হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল পাকস্থলীর ক্ষত থেকে কখনো কখনো রক্তপাত হওয়া। ঠিক একই কারণে ফুসফুসে শ্বাসনলীর প্রদাহ, যাকে ব্রংকিয়েকটেসিস বলে, সেই রোগেও, কাশির সঙ্গে মাঝে মাঝে রক্ত ওঠে। ফুসফুসের ক্যানসারেও অনুরূপ প্রদাহ সৃষ্ট হয়ে রক্ত ওঠে।

ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষ কোলাজেন তৈরি করে, যা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে যেমন, সেরে ওঠাতেও ওমনি প্রয়োজন। তন্তুজাত কলার উদ্ভব দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে দেখা যাবেই। যে জায়গায় রক্তনালিকা আছে, তার সঙ্কোচন ঘটে দীর্ঘ-স্থায়ী প্রদাহে। আর এর মূলেও আবার রয়েছে ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষের কোলাজেনের মত তন্তুজাতীয় কলা সৃষ্টি করার ক্ষমতা। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে যা দেখা যায় তা হল হৃৎপিণ্ডে ভালভের সঙ্কোচন (stenosis)। পাকস্থলির বহির্মুখের সঙ্কোচন (pyloric stenosis) ইত্যাদি। ছোট ছোট ধমনীর

সঙ্কোচনও এতে ঘটে। একে প্রান্তিক ধমনীর সঙ্কোচন (endarteritis obliterans) বলে।

দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের দিকচিহ্নস্বরূপ কোষ, লিম্ফোসাইট ও প্লাজমা কোষ। এদের "ছোট গোল কোষ" (round cell) বলেও বর্ণনা করা হয়। রক্ত-নালিকার চারিপাশেই এগুলিকে দেখা যায়। এরা রক্ত থেকে উদ্ভূত বলেই মনে হয়।

লিম্ফোসাইটকে অন্য রকমের বিবিধ কোষের জনক বলে মনে করা হয়, যেমন প্লাজমা কোষ, ম্যাক্রোফাজ, ফাইব্রোব্লাষ্ট ইত্যাদি। মনে করা হয় এদের ডি-এন-এটাই আবার অন্য কোষের গঠনে ব্যবহার হয়।

রোগ প্রতিরোধে প্লাজমা কোষের ভূমিকা বড় কম নয়। রোগ প্রতিরোধ ও অনাক্রম্যতার মূলে গ্লোবিউলিন জাতের বস্তু ইমিউনোগ্লোবিউলিন। এ বস্তু প্লাজমা কোষেই তৈরি হয়।

দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের ফলাফল ঃ অবশ্যই তা নির্ভর করে, এই প্রদাহ চলছে কতদিন ও কতটা তার ব্যাপ্তি। টিউবারকুলোসিসের মত রোগে রেটিকিউলো-এণ্ডোথিলিয়াল কোষ বলা হয়, প্রতিরোধের কার্যে লিপ্ত শরীরের অংশবিশেষে থাকে যে কোষগুলি, অর্থাৎ অস্থিমজ্জা, প্লীহা, যকৃত ইত্যাদি জায়গার বিশেষ অংশে থাকা কোষনিচয়ের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। সেই সাড়ার সঞ্চার দেখা যায় রক্তের বিশিষ্ট ধরনের শ্বেতকণিকায়।

যে জায়গাগুলির কথা বলা হল, সেখানকার কোষগুলির বিভাজন ও বৃদ্ধি ঘটে বলে, সেই ইন্দ্রিয়গুলিতে কোষ বিভাজনজনিত স্ফীতি (hyperplasia) দেখা দেয়। যে জায়গায় দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ ঘটেছে, সেখানে যে লসিকাগ্রন্থী আছে, সেগুলিও কোষ বিভাজনজনিত স্ফীতির বশবর্তী হয়ে ওঠে। তার ফলে কোষ মধ্যস্থ যে পথ (sinus), সেগুলিও প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

রক্তে কোন বীজাণু থাকলে রেটিকুলো সিষ্টেমের ব্যবস্থাপনার মধ্যে বীজাণুগুলি আটকা পড়ে যায়। দেখা যায় বীজাণুগুলি লসিকাগ্রন্থী, প্লীহা, যকৃত, ইত্যাদি জায়গায় ধরা পড়ে গেছে। এজন্য প্লীহায় অজস্র কালাজ্বরের বীজাণু দেখা যায়। আর প্লীহার যে স্ফীতি হয় তাতে অজস্র নতুন কোষ তৈরি হয়, পরজীবী বীজাণুদের ধ্বংস করার চেষ্টায়। বীজাণুগুলিকে ছড়িয়ে পড়তে না দিয়ে বীজাণুবিরোধী অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে, যা বীজাণুগুলিকে নষ্ট করতে বিশেষ গ্লোবিউলিন রস তৈরি করে তাদের মেরে ফেলে।

অনাক্রম্যতা ঃ অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে প্রাণীদেহের সাড়া
হয়ে, অনাক্রম্যতা দেখা দেয়। দীর্ঘ-প্রদাহ-জনক রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে
পর্যন্ত তাই অনাক্রম্যতাসূচক গ্লোবিউলিন (immune globulin) রোগ
নির্ণয়ক বস্তুর একটি। অনাক্রম্যতার সূচক হিসাবে তাই রক্তে গামা গ্লোবিউ-
লিনের বৃদ্ধি ঘটে।

তথাকথিত এ্যান্টিবডি বা যাকে হয়ত অনাক্রম্যতাসূচক বৈপরীতি বলা
যেতে পারে, তা দেরীতে ঘটা সংবেদনশীলতার সঙ্গে তুলনীয়। বহু পরীক্ষা,
যেমন টিউবারকুলিন বা মাণ্টু (Mantoux) পরীক্ষা, কুষ্ঠের লেপ্রোমিন
(Lepromin) এই পর্যায়ে পড়ে। সংবেদনশীলতার শুধু রোগনির্ণয় সূচক
পরীক্ষা ছাড়া অন্য অনেক দিক হয়ত আছে, যেগুলি আমাদের অজানা।
অনুরূপ সংবেদনশীলতার ফলে যদি শরীরের কোন কলা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, সেটাকে
অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহেরই ঘটানো বিকার বলতে হবে। টিউবারকুলোসিস
রোগে এ ধরনের সংবেদনশীলতা না থাকলে কি তা এত দীর্ঘস্থায়ী রোগ হত ?
এর উত্তর জানা নেই।

অনাক্রম্যতা ও রোগ প্রতিরোধের সঙ্গে থাকে কিছু কিছু শরীরের
সাংগঠনিক পরিবর্তন। যেমন, প্লীহার কোষবৃদ্ধির ফলে তা এত বড় হয়
যে, সহজে হাত দিয়ে তা অনুভব করা যায়। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি
রোগে, কোন কোন হৃৎ রোগে প্লীহা বাড়ে।

রক্তে কি পরিবর্তন হয় ঃ কোন ধরনের বীজাণুর আক্রমণে রক্তের,
বিশেষ করে শ্বেতকণিকার কি পরিমাণগত পরিবর্তন হয়, সেটা নির্ভর করে
কি ধরনের বীজাণুর আক্রমণ তার উপরে। যে কোন রকমের দীর্ঘস্থায়ী
প্রদাহে, রক্তাল্পতাটা প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সাধারণতঃ লোহিত-
কণিকার সংখ্যাল্পতা দেখা গেলেও, রক্তকণিকার আয়তনের পরিবর্তন হয় না;
যে রকম পরিবর্তন কোন কোন ধরনের রক্তাল্পতায় দেখা যায়। তবে বার
বার যদি রক্তপাত হতে থাকে, যেমন পাকস্থলীর ক্ষতে, তাহলে সেক্ষেত্রে
বৃহৎকোষী (macrocytic) লোহিতকণিকা বিশিষ্ট রক্তাল্পতা দেখা দেয়।

রক্তের প্লাজমায় পরিমাণগতভাবে এ্যালবুমিনের হ্রাস ও গামা-গ্লোবিউ-
লিনের বৃদ্ধি ঘটে। সেই সঙ্গে লোহিত কণিকার পাললিকতার (sedimen-
tation) হার বৃদ্ধি পায়। টিউবারকুলোসিস বা দীর্ঘস্থায়ী গাঁটে গাঁটে

বাতের অসুখে, এটা লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া ক্লান্তি, অক্ষুধা, ওজন কমা, মাথাধরা, জ্বর এসব লক্ষণও থাকে।

এই সবকিছুকে সাধারণ বিষক্রিয়া (toxaemia) বলে অভিহিত করা হয়। তবে এগুলি আক্রমণকারী বীজাণুদের দেহ নিষ্ক্রান্ত বিষের (toxin) জন্যই ঘটে।

শ্রেণীবিভাগ করতে হলে, বলতে হয়, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ নিম্নলিখিত ধরনের হতে পারে।

(a) **অনির্দিষ্ট**: পুঁজ তৈরি করতে পারে এমন বীজাণু, এদের মধ্যে আছে ষ্ট্যাফাইলো পায়োজেনিস, কি কোলাই।

(b) **বিজাতীয় বস্তু**: যেমন ক্ষত সেলাই করার ক্যাটগাট।

(c) **বিশিষ্ট বীজাণু**: টিউবারকুলোসিস বীজাণু, কি সিফিলিসের উৎপাদক ট্রিপানোমা প্যালিডা বীজাণু।

(d) **সংবেদনশীলতা, এ্যালার্জি**: আত্মশরীরকলা বিরোধী প্রতিষেধ বস্তুর উদ্ভবজনিত। এগুলির মধ্যে আবার কয়েকটি বিশেষ রোগের আলোচনা করা হচ্ছে।

অষ্টিওমাইলাইটিস: লাঠি বা রডের মত লম্বা হাড়ে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। স্ট্যাফাইলোকক্কাস পায়োজেনিস এর প্রধান বীজাণু। রক্তে পরিচালিত হয়ে বীজাণুগুলি, যেখানে অস্থির বৃদ্ধি হয়, তার কাছেই ক্ষতের সূচনা করে। প্রদাহ সুরু হলে, অস্থি জায়গাটা কঠিন বলে, শিরা-ধমনীর স্ফীতি সম্ভব হয় না। তাই রক্তাল্পতা হয়ে, অস্থিকলার জায়গা বিশেষ মরে যায়। সেখানে পুঁজ জমা হয়ে অস্থি আচ্ছাদক (periosteum) পর্দায় তা জমে আরো রক্তাল্পতার কারণ হয়ে অস্থির বহিরাংশকে ক্রমশঃ বিপন্ন করে তোলে। এতে অস্থির সমগ্র বা দীর্ঘ এলাকার মৃত্যু হতে পারে। মৃত অস্থি বিজাতীয় বস্তু হিসাবে কাজ করে।

শেষ পর্যন্ত অস্থি-আচ্ছাদক ভেদ করে পুঁজ বার হয়, ও চামড়ার কোন জায়গায় ছেঁদা হয়ে পুঁজ বার হয়ে আসে। অস্থির আচ্ছাদকে যে উত্তেজনা সৃষ্ট তাতে নতুন অস্থি তৈরি হতে থাকে। একে বলে ইনভোলিউক্রাম, এর ভিতরে থাকে মৃত অস্থি, সিকোয়েষ্ট্রিন। ক্রমে ইনভোলিউক্রামে বড় ছেঁদা হয়ে মৃত হাড় সিকোয়েষ্ট্রিন নিষ্কাষিত হয়। সারার আগে বার করার কাজটা ঘটে। নিজে থেকে না হলে এ কর্ম সাধনের জন্য সার্জারির প্রয়োজন হয়।

পুঁজ বার হয়ে যেতে না পারলে, প্রদাহ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে। তাছাড়া মৃত হাড়ের টুকরো, বিজাতীয় বস্তু হিসাবে কাজ করেও এই প্রদাহের কাল আরো দীর্ঘতর করে।

দীর্ঘস্থায়ী বৃক্ককের প্রদাহঃ একে পায়লো-নেফ্রাইটিস (pyelo-nephritis) এই নামে অভিহিত করা যেতে পারে। দীর্ঘদিন রক্তচাপ বেশী থাকলে, এ ধরনের প্রদাহ হতে পারে।

যে বীজাণু দায়ী, সেগুলি হল গ্রাম নামাঙ্কিত-রঞ্জক-গ্রহণ করে না, এই রকম অন্ত্রের বীজাণু। কিভাবে এ বীজাণুর আক্রমণ ঘটে, তা সঠিক জানা না থাকলেও, প্রস্রাবের গতি রুদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব আছেই। খরগোসে, এক-দিকের মূত্রনালী (tireter) বন্ধ করে, ই-কোলাই জাতীয় বীজাণু রক্তে সঞ্চার করলে, এই রোগাক্রমণ হয়ে থাকে।

তাছাড়া প্রস্রাব করাতে ক্যাথেটার শলাকা প্রয়োগ করলে, মূত্রথলিতে বীজাণু আক্রমণ হতে পারে। এই আক্রমণ মূত্রনালিকার মাধ্যমে, উপর পর্যন্ত উঠে বৃক্ককে আক্রমণ করে। একে উঠতি (ascending) বীজাণু আক্রমণ বলা যেতে পারে। অবশ্য এর সুরু মারাত্মক প্রদাহ হিসাবে দেখা দিয়ে, ক্রমে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে পরিণত হতে পারে। প্রথম অবস্থায় অজস্র ছোট ছোট বিস্ফোটক হিসাবে সুরু হতে পারে। এ জন্যে কিডনি বা বৃক্ককের মধ্যভাগে, জায়গায় জায়গায় পুঁজ থাকাতে ছিট ছিট মত দেখায়। কোন কোন ক্ষেত্রে মূত্রনালিকা এমনকি বৃক্কক পর্যন্ত জলবদ্ধ হয়ে যায়। তাকে আন্তর্জাতিক ভাষায় হাইড্রোনেফ্রোসিস (hydronephrosis) বলে।

কিডনি বা বৃক্ককে যদি পূর্ববর্তী ক্ষতচিহ্ন থাকে, তা হলে সেখানে পায়লোনেফ্রাইটিস হওয়া সম্ভব। আর একবার হলে, সেইখানে বার বারই হতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে, ছোট ছোট ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। সেখানে বিভিন্ন কোষ, যেগুলি বিভিন্ন প্রদাহে থাকে, তাদের দেখা যায়। কোন কোন জায়গায় বৃক্কের ভিতরের গ্লোমরিউলাস ঈষদচ্ছ দেখায় (hyaline)। যে সব টিবিউল (tubules) জখম হয়েছে, সে জায়গাগুলি ইয়োসিন রঞ্জক পদার্থ গ্রহণ করে থাইরয়েডের মত দেখায়।

বৃক্কের অসুস্থতার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। কিন্তু এর সঠিক কার্যকারণ নির্ধারিত হয়নি।

খাদ্যনলীর দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ

পাকস্থলী ঃ মারাত্মক পাকস্থলীর ক্ষত, সেরে উঠবে না দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতে পরিণত হবে, তা বলা শক্ত। দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে, ক্ষতের যে বিকার, তা ভিতর পর্যন্ত ছড়িয়ে পাকস্থলীর মাংসপেশীকে নষ্ট করে দেয়। তখন ক্ষতের ভিতরটা ক্ষতচিহ্নের তন্তুজাতীয় কলায় পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে দানাদার কলা, পুঁজের কোষ, ম্যাক্রোফাজ, প্লাজমা কোষ, লিম্ফোসাইট ইত্যাদি কোষ দেখা যায়।

পেশীর যেটুকু যায়, সেটা তন্তুজাতীয় কলায় ক্ষতচিহ্নে রূপান্তরিত হয়। এর উপরে এপিথিলিয়াম কোষ জন্মায়। তবে এ থেকে টিউমার জন্মাতে পারে (শতকরা 8% ভাগ ক্ষেত্রে)।

অন্ত্র ঃ সিগেলা বীজাণুর অথবা এণ্ট্যামিবা হিষ্টোলিটিকার মত পর-জীবীর আক্রমণে অন্ত্রে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ দেখা যেতে পারে। এখানেও পেশী নষ্ট হতে পারে ও স্থায়ী প্রদাহের কোষগুলি দেখা যায়।

বৃহদন্ত্র ঃ উপরোক্ত বীজাণুগুলির আক্রমণেই বৃহদন্ত্রে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ হয়। বৃহদন্ত্রের ক্ষত-প্রদাহ, যাকে আলসারেটিভ কোলাইটিস (ulcerative colitis) বলে, তা বহুদিন চলে রোগীর মৃত্যুও ঘটাতে পারে। এ প্রদাহ প্রধানতঃ মিউসিন-শ্রাবী, মিউকাস ঝিল্লীতে দেখা যায়। এতে বৃহদন্ত্র সঙ্কুচিত হয়ে, চামড়ার মত শক্ত হয়ে যায়। এতে পেশীবৃদ্ধি হয়ে, তন্তুজাতীয় কলারও বৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায়।

কোষ পরিবেশে জলীয় বস্তুর বৃদ্ধি লিম্ফোসাইট কোষ জমতে দেখা যায়। বহুনিউক্লিয়াস-যুক্ত কোষ, আনুপাতিক হারে কমে যায়। পায়খানার সঙ্গে রক্ত, পুঁজ ও মিউসিন দেখা যায়। দীর্ঘদিন প্রদাহ চললে, এপিথিলিয়াম কোষ বৃদ্ধি হয়ে আঁচিলের মত অর্বুদ (polyp) দেখা দেয়। এ কখনো ক্যানসারেও পরিণত হতে পারে।

বিজাতীয় পদার্থের বিরুদ্ধে শরীরের সাড়া

বস্তুর রাসায়নিক সংগঠন ঃ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, সাধারণ লোহার তুলনায় স্টেনলেস স্টিল ক্ষতি করে অল্পতর।

বস্তুর বহির্গঠন ঃ পালিস করা চকচকে জিনিসে, অপরিচ্ছন্ন এবড়ো-

খেবড়ো জিনিসের তুলনায় কম ক্ষতি হয়। প্রয়োজনে পিন ইত্যাদি লাগানোর সময় এটি মনে রাখা দরকার। অস্থির সার্জারি করতে গিয়ে এজন্য পিন কি স্ক্রু লাগাবার সময়ে এমন ধরনের স্টেনলেস স্টিল ব্যবহার করা হয়, যাতে দেহকলার উপর তার প্রভাব কম পড়ে।

অঙ্গার বা কার্বন : খুব ছোট ছোট আকারের, যেমন উল্কিতে যে রকম ব্যবহার করা হয়, সে রকম হলে, চর্মকলার অভ্যন্তরের ম্যাক্রোফাজ কোষ সেগুলিকে বরাবরের মত আত্মস্থ করে রাখে। ফুসফুসেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটতে পারে। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রঙ্কিয়োলে স্ফীতি ঘটে।

খনিজ পদার্থ : বলা হয়েছে যে, স্টেনলেস স্টিলে প্রতিক্রিয়া খুবই সামান্য হয়। অন্য বস্তু, যেমন বন্দুকের গুলির চারিদিকে একটি তন্তুজাতীয় কলার ঘেরাটোপ সৃষ্টি করে। চোখে লোহার কোন জিনিস প্রবিষ্ট হলে এত প্রতিক্রিয়া হয় যে, তাতে অন্ধ হয়ে যায়।

প্লাষ্টিক স্পঞ্জ : স্তনের অস্ত্রপচার করার পর, ইচ্ছা করেই এই জাতীয় বস্তু ব্যবহার করা হয়। কারণ এই বস্তু চারিধারে তন্তুকলার উদ্ভব হয়ে, স্তনকে সুদৃশ্য ও স্বাভাবিক করে তোলে। অবশ্য প্রদাহস্ফীতি এর জন্য হয়। ও সেইজন্য ম্যাক্রোফাজ ও রাক্ষুসে কোষ ইত্যাদি দেখা যায়। সিলিকোনেও প্রতিক্রিয়া খুব কম হয়।

রবারের সঙ্গে সিলিকোনের রাসায়নিক মিল আছে। এজন্য বহুস্থানে প্রতিক্রিয়া হবে না বলে রবার ব্যবহার করা হয়, যেমন চোখের লেন্স, কর্ণপটাহ ইত্যাদি।

ক্যাটগাট : সার্জারিতে সেলাই করতে যে ক্যাটগাটের ব্যবহার হয়, তাতে প্রতিক্রিয়া হয়ে পুঁজও দেখা দেয়। এর জন্য সাধারণ ক্যাটগাটের আয়ু দু-তিন দিনের বেশী হয় না। সে জায়গায় ক্রোমিক ক্যাটগাট দিন দশেক পর্যন্ত থাকে।

বালু বা সিলিকা : এ বস্তুটি শরীরকলার পক্ষে সুখকর নয়। তাই এর প্রতিক্রিয়া হয় খুবই। যদি 5 মিলিমাইক্রন আয়তনের কণিকা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে যায়, তাহলে ফুসফুসের এ্যালভিয়োলাসের (কোষসংচক্র) ম্যাক্রোফাজ কোষ এগুলিকে গ্রহণ করে ফুসফুসের লিম্ফগ্রন্থীতে নিয়ে যায়। এখানে তন্তুকলা ও রাক্ষুসে কোষের উদ্ভব হয়। কারণ শরীরের পক্ষে এগুলি একেবারে বিজাতীয় বস্তু। খনিকর্মীদের এই ধরনের অসুখ খুবই দেখা যায়।

এই সব কণিকা শরীরের অন্য জায়গায় গেলে, সেখানে টিউবারকুলোসিসে বিকারতাত্ত্বিক যে অণুবীক্ষণিক চিত্র দেখা যাবার কথা, সেই চিত্র দেখা যায়। তবে এ চিত্র একটু রূপান্তরিত সারকয়েড়ের ধরনের হয়। এ্যাসবেসটস, বেরিলিয়াম কি গায়ের পাউডারের ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেটেও এই একই ধরনের ছবি দেখা যায়।

11 প্রতিরোধে শরীরের সাড়া

বলা বাহুল্য, প্রতিরোধ কথাটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা। এই ক্ষমতা অর্জনের যে জৈবিক ইতিহাস, সেখানে দেখা যায় যে জন্মের পর চাই কি ভ্রূণাবস্থা থেকেই মেরুদণ্ডী প্রাণীমাত্রেই শরীর কোষের মাধ্যমে বোঝে কোন বস্তুটি তার নিজস্ব, আর কোনটি বিজাতীয়। বিজাতীয় বস্তুর বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া তাই বিবর্তনে হয়েছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, যার ফলে প্রাণীশরীরের স্থিতাবস্থা রক্ষিত হয়।

প্রতিবস্তু বা এ্যান্টিবডি শরীরে সৃষ্ট হতে পারে এটা দেখান বেরিং ও কিটাসাতো 1890 সালে। তাঁরা দেখালেন যে, প্রাণীদেহে যদি ডিপথিরিয়া বা টিটেনাস বীজাণু ঢোকানো হয়, তাহলে এই প্রাণীদেহে বিশেষ বীজাণু-বিষ নষ্ট করার ক্ষমতার উদ্ভব হতে দেখা যায় ও সেই প্রাণী ওই রোগে অনাক্রম্যতা অর্জন করে। এর পর টিউবারকুলিন প্রয়োগে কি প্রতিক্রিয়া হয়, তা যখন কক দেখালেন, ও শরীরে বিজাতীয় প্রোটিন প্রয়োগের মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার কথা রিশে (Richet) তারপর যখন বললেন, তখন এ সবগুলির পিছনে একটা একিকরণ সূত্র যেন দেখা গেল। এই একত্ববাদের যে চিন্তা, তার সরিক হয়ে উঠল অতিসংবেদনশীলতা, এ্যালার্জি, এসব জিনিসও।

শরীরের-রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সংজ্ঞা হিসাবে তা হলে বলা যায়, যে বিজাতীয় বস্তুর বিরুদ্ধে যে প্রতিবস্তু বা এ্যান্টিবডি শরীরে সৃষ্ট হয় তাই শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা। একে অনাক্রম্যতা ও ইংরাজিতে ইমিউনিটি (immunity) বলে। এখন এটাও বোঝা গেছে যে, এর মূলে আছে ইমিউনোগ্লোবিউলিন নামের বিভিন্ন আনবিক ভারের গামা গ্লোবিউলিন। এদের প্রস্তুতির সৃজন দুটি। প্রথমটি হল থাইমাস গ্রন্থীতে অবস্থিত লসিকা গ্রন্থীগুলি। আর অন্যটি হল অন্ত্রে বা অস্থিসংযোগে অবস্থি লসিকাগ্রন্থী।

বস্তু-প্রতিবস্তু-সৃজক বস্তু বা এ্যান্টিজেন

সংজ্ঞা ঃ প্রতিবস্তুসৃজক বস্তু তাকেই বলা যেতে পারে, যা শরীরে অনু-প্রবিষ্ট হলে প্রতিবস্তু সৃজন করে। সৃষ্ট হলে এই বস্তু ও প্রতিবস্তুর মিশ্রণে,

সঠিক লক্ষণীয় পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আর প্রতিবস্তুও, তার উৎসৃজক কোন বস্তুর উত্তেজনাতেই সৃষ্ট।

একটু ব্যাপক অর্থে বলা যায়, যে প্রতিবস্তু এমনই, যে এর উপস্থিতির জন্য শরীর-এর সৃজক বস্তুর সঙ্গে আচরণের ভিন্নতা দেখায়। এ ভিন্নতা প্রতিরোধমূলক। শরীরের এই অনাক্রম্যতা বা প্রতিরোধমূলক আচরণের স্মৃতিও থাকে।

আবার যে বস্তু অন্য প্রোটিনের সঙ্গে মিশে তবেই প্রতিবস্তু সৃজন সক্ষম হয়, সেই ধরনের বস্তুকে বলা হয় হ্যাপটেন (hapten)।

প্রতিবস্তুসৃজক বস্তুর (এ্যান্টিজেন) চরিত্র

এগুলি প্রোটিন জাতীয় হয়, তার আনবিক গুরুত্ব হয় বেশী। তবে আবার প্রোটিনের মধ্যেও, যেগুলিতে টাইরোসিন ও ট্রিপটোফ্যান নামের এ্যামাইনোগুলির অভাব, সেগুলি প্রতিবস্তু তৈরি করতে পারে না। প্রোটিন অণুর ভিতর কঠিনতা না থাকলে, তা উপযুক্ত প্রতিবস্তু তৈরি করতে পারে না। টাইরোসিন বা ট্রিপটোফ্যান সেটাই দিতে পারে। রক্তের হিমোগ্লো-বিনের এ ক্ষমতা কম। তবে এক প্রাণীর শরীরে প্রতিবস্তু সৃষ্টি করতে না পারলেও সেই জিনিসই অন্য প্রাণীর শরীরে প্রতিবস্তু সৃষ্টি করে, এ হতে পারে। যেমন প্রাণীর নিজের চামড়া, তার নিজের শরীরে কোন রকম প্রতিবস্তু সৃষ্টি করে না। কিন্তু (এক রকম দেখতে যমজ ভিন্ন) অন্যের দেহে গুরুতর রকমের প্রতিবস্তু সৃষ্টি করে।

কি বা কোন্ বিশিষ্ট ধরনের প্রতিবস্তু তৈরি হবে, সেটা নির্ভর করে, প্রযুক্ত বস্তুর অণুতে কোন একটি বিশেষ গঠন সংস্থানের উপর। একে সেই অণুর নির্ধারক স্থান (determinant site) বলা হয়।

প্রোটিনের কোন অবক্ষয় (denaturation) হলে তার সৃষ্ট প্রতিবস্তুর ধরনটাও পাল্টায়। অনুরূপভাবে হ্যাপ্টেন সংযোগ হলেও তাই হয়। হ্যাপটেনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি হ্যাপটেনই সেখানে নির্ধারক হয়ে ওঠে। শর্করা, কি তৈল বা চর্বিজাতীয় বস্তু, একা প্রতিবস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু সংযুক্ত অবস্থায় জোরালো রকমের প্রতিবস্তুসৃজক হয়ে ওঠে।

এর কয়েকটি উদাহরণ ঃ

(1) নিমোনিয়া রোগের কারণ যে নিমোকক্কাস, তাদের শরীর ঘিরে যে ঘেরাটোপ (capsules) থাকে, তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় রোগটা কত মারাত্মক আর তার কতখানি প্রতিবস্তু উৎপাদন ক্ষমতা। বিটা হিমোলিটিক ষ্ট্রেপটোকক্কাসেও তাই হয়।

(2) বিশেষ ওষুধে যে চামড়ায় প্রদাহ হতে দেখা যায়, সেখানে চামড়ার প্রোটিনের সঙ্গে সাদাসিদে ওই রাসায়নিক বস্তু হ্যাপটেন হয়ে প্রতিবস্তু উৎপাদক বস্তু হয়ে উঠে প্রদাহ সৃষ্টি করে।

(3) বিভিন্ন কলায় এইরকম হ্যাপটেন বা প্রতিবস্তু উৎপাদক বস্তু হিসাবে কাজ করে। যেমন রক্তের ABO পদার্থ শর্করা-সহযোগে প্রোটিন (glycoprolein)। আর ভাসারম্যান বা ফরসম্যান বস্তুতে তৈলজাতীয় বস্তু। এ ধরনের বস্তুকে হেট্রোফিল (Hetrophile) বস্তুও বলে।

এ্যালোএ্যান্টিজেন বা এ্যালা-বস্তু : বলা হয় তাকেই, যা একটি প্রজাতীর সকলের শরীরে প্রতিবস্তু উৎপাদন করে না, কারো কারো শরীরে করে। উদাহরণ হল, রক্তের ABO শ্রেণী বস্তু।

প্রতিবস্তুর ধরন

রোগ-প্রতিরোধ বস্তু হিসাবে ইমিউনো গ্লোবিউলিন বা গামাগ্লোবিউলিনের কথা, অনেকদিন থেকে জানা। এখন আমরা ভিন্ন ধরনের প্রতিবস্তুর কথা জানি। এর মধ্যে একরকম হল যাকে কোষজ (cellular) প্রতিবস্তু বলে। কোষগুলি এখানে লিম্ফোসাইট কোষ। একজনের চামড়া অন্যদেহে অধিরোপন করলে, তা থাকবে না নিষ্কাষিত হবে, সেটা নির্ভর করে এই শ্রেণীর প্রতিবস্তুর উপরে। এছাড়া দেরীতে প্রকাশ পায় যে সংবেদনশীলতা, তার প্রতিবস্তু, (delayed hypersensitivity), কিম্বা বীজাণুবিরোধী প্রতিবস্তু, এ সবেরই চরিত্র কাছাকাছি।

ভাইরাস আক্রমণ প্রতিহত করতে যে প্রতিবস্তু, তাকে ইন্টারফেরন (interferon) বলে।

প্রতিবস্তুর শ্রেণীবিভাগ

রক্তরসে (Plásma) যা থাকে : এগুলি গামা গ্লোবিউলিন জাতের : এগুলি শরীরের বাহিরে দেখানো যায় ;

* পিণ্ড বাঁধে এমন, অর্থাৎ এ্যাগ্লুটিনিন
* তলানি জমে এমন, প্রিসিপিটিন
* দ্রবীভূত হয় এমন, লাইসিন, এম্বোসেপ্টার
* অপসোনিনন
* রোধক ; ব্লকিং
* নিরপেক্ষতা সৃজক ; নিউট্রালাইজিং অনুঘটক বিরোধী ও বিষবিরোধী প্রতিবস্তুও এই পর্যায়ের।

যেগুলি শরীরের ভিতরেই কেবল দেখানো সম্ভব :

* প্রতিবস্তু, যা রোগে অনাক্রম্যতা দেয়
* প্রতিবস্তু যা অতি সংবেদনশীলতার জন্য দায়ী

কোষে যা থাকে :

* কোষবন্দী প্রতিবস্তু
* ইন্টারফেরণ

প্রতিবস্তু কি ধরনের হবে তা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। এগুলি হল—

প্রতিবস্তু সৃষ্টি করতে পারে এমন বস্তুর সঙ্গে পূর্বের যোগাযোগ : সৃজক বস্তু যদি প্রথম শরীরে অনুপ্রবেশ করে, তা হলে চারদিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে রক্তরসে (সরাম) ইমিউনোগ্লোবিউলিন জাতীয় প্রতিবস্তু দেখা যায়। এটা ছ-দিন থেকে তিন মাসের মধ্যে চরম পর্যায়ে পৌঁছয়।

শুধু একই বস্তুর দ্বিতীয়বার দেহে অনুপ্রবেশ ঘটলে, তখনই বস্তুর নিজস্ব
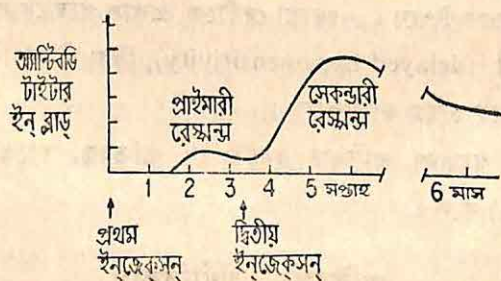
চিত্র 4

নিরপেক্ষতা সৃজনের প্রভাবে প্রতিবস্তু কমে যায়। কিন্তু দু-তিন দিনের

মধ্যেই প্রতিবস্তু অতি উচ্চ পর্যায়ে পৌছয়। তার পর আস্তে আস্তে নেমে গেলেও, মাত্র একবারের অভিজ্ঞ দেহের চেয়ে উঁচু পর্যায়েই থাকে।

দ্রুবার অনুপ্রবেশ করানো বা ইনজেকশান দেয়া থেকে আরো একটা লক্ষণীয় বিষয় হল যে, অল্প পরিমাণ বস্তুই, এই একাধিক প্রয়োগে, বেশী পরিমাণ প্রতিবস্তু সৃষ্টি করে। ঐ প্রতিবস্তু G পর্যায়ের ইমিউনো গ্লোবিউলিন। রোগ-প্রতিষেধ, ও অনাক্রম্যতার দিক থেকে বলা যায় যে, দেহের পূর্ব অভিজ্ঞতা অনাক্রম্যতা ও রোগ-প্রতিরোধকে সাহায্যই করে। একে প্রতিরোধ্যতার স্মৃতি (immunological memory) বলা হয়। আর তা থাকে লিম্ফোসাইট কোষে।

বার বার ইনজেকশানে কিন্তু ফলাফল অন্যরকম হতে পারে। যেমন একাধিক ইনজেকশানে যে প্রতিবস্তু সৃষ্টি হয়, তা শুধু ইনজেকশান দেয়া বস্তুরই মাত্র বিরুদ্ধে না হয়ে তা আরো বহু বস্তুরই বিরুদ্ধে হতে পারে। তাই একে অনন্য প্রতিক্রিয়া (anamnestie reaction) বলা হয়। ভিডাল অথবা ভাইল ফিলিক্স (Vidal, Weil Felix) পরীক্ষার ফল বোঝবার সময়, এ কথাগুলি মনে রাখতে হবে। বিশেষ করে রোগী TAB টীকা নিয়েছে কি না সেটা জানতে হবে।

কি বস্তু কি প্রতিবস্তু সৃষ্ট করে, তার আলোচনায় মোটামুটি বলা যায় যে, অপেক্ষাকৃত মোটা দানার বস্তু, বেশী প্রতিবস্তু সৃষ্টি করে দ্রবণীয় বস্তুর তুলনায়। অন্য বস্তুর মিশ্রণেও তা হয়। এজন্য মৃত মাইকোবীজাণু (mico bacteria) যাকে ফ্রয়েণ্ডের সংমিশ্রক বলে, (Freund's adjuvant) তার প্রয়োগে যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিবস্তুর উদ্ভব হয়। কেউ বলে এই সংমিশ্রকের প্রদাহ সৃজনের ক্ষমতার জন্যই এটা হয়।

পরিমাণঃ মনে হওরা স্বাভাবিক যে, বেশী পরিমাণ বস্তু, বেশী পরিমাণ প্রতিবস্তু উৎপাদন করবে। কিন্তু তা হয় না। এমনকি খুব বেশী ডোজ বা পরিমাণ প্রয়োগের ফলে, প্রতিবস্তু সৃজনের ব্যাপারটাই যেন পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে, বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমনকি, তার পরে স্বাভাবিক পরিমাণ প্রয়োগেও দেহ সাড়া দিতে চায় না অনাক্রম্যতার পক্ষাঘাতের ফলে। এই ধরনের পক্ষাঘাত দানাদার বস্তুতে ততটা হয় না, যতটা হয় দ্রবণশীল বস্তুতে। খুব কম পরিমাণেও আবার সাড়া না জাগিয়ে শরীরে তা একটা সহনশীলতার (tolerance) সৃষ্টি করতে পারে।

কোন পথে ঃ এ্যান্টিজেন বস্তু প্রয়োগ করা হচ্ছে, তার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করে। যেমন, বীজাণু শিরার মধ্যে ইনজেকশান দিলে, ইমিউনোগ্লোবিউলিন সৃষ্টি হয়। কিন্তু চামড়ার নিচে বা উদর ঝিল্লীতে দিলে, প্রতিবস্তু ও শারীরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অতি-সংবেদনশীলতারও উদ্ভব হয়।

সময় ঃ কতটা সময় ধরে বস্তুর প্রয়োগ হয়েছে, তার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করে। যেমন প্রথমে তৈরি হয় M-ধরনের ইমিউনো-গ্লোবিউলিন। তারপর আসে G-ধরনের। M ও G-র মধ্যে একটা বিরোধিতাও লক্ষণীয়। M তৈরি হয় প্রাথমিক সাড়ায়। আদিম প্রাণী, তাই হাঙ্গরদের শুধু M-ধরনের প্রতিবস্তুই দেখা যায়। গর্ভস্থ ভ্রূণদের শরীরেও M-ইমিউনোগ্লোবিউলিন দেখা যায়।

অন্য প্রতিবস্তুর উপস্থিতি ঃ শরীরে অন্য ইমিউনোগ্লোবিউলিন থাকলে, নতুন প্রতিবস্তু তৈরি করাটা তত সহজ হয় না। এর কারণ অজ্ঞাত। এইজন্য সদ্যজাত শিশু, যে মার কাছ থেকে যথেষ্ট প্রতিবস্তু পেয়েছে, তাকে ডিপথিরিয়া টক্সয়েডে কম সাড়া দিতে দেখা যায়। এই সুযোগটি নিয়ে Anti Rh গ্লোবিউলিন, জন্মের 48 ঘণ্টার মধ্যে Rh + শিশু, যে Rh – মায়ের গর্ভে জন্মেছে তাকে দিলে, ভবিষ্যতে এর প্রতিবস্তু হবার ভয় কম থাকে।

বয়স ঃ ভ্রূণাবস্থায় যে কোন বিজাতীয় প্রোটিন প্রাণীকে দিলে প্রতি-বস্তুর উদ্ভব হয় না। এমনকি পরবর্তী জীবনে সেই প্রোটিনের প্রতিবস্তু তৈরি করতে পারে না। একে প্রতিরক্ষা বা অনাক্রম্য অবস্থার সহনশীলতা (immunological tolerance) বলে।

এইভাবে মানবশিশু M-ধরনের এক বছরে, G-ধরনের পাঁচ বছরে ও A-ধরনের গামা গ্লোবিউলিন দশ বছর বয়সে তৈরি করতে পারে।

পুষ্টি ঃ প্রতিবস্তুর উদ্ভব পুষ্টির কমবেশীর উপর নির্ভর করে না। তবে ইঁদুরদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পাইরিডক্সিন বলে যে এ্যামাইনো এ্যাসিড আছে, তার ঘাটতি হলে অনাক্রম্যতা বাধাগ্রস্থ হয়।

এ্যানেরজি (Anergy) ঃ ক্ষেত্রবিশেষে কোষ মাধ্যমে প্রাপ্ত অনা-ক্রম্যতা ব্যহত হতে দেখা যায়। এই অবস্থার নাম, এ্যানেরজি। এই জন্যই দেখা যায়, হয়ত এক্স-রে প্রয়োগের ফলে, কিম্বা ক্যানসার রোগগ্রস্থ প্রাণীর,

পূর্বে থাকা অনাক্রম্যতার তারতম্য হয়। এর কারণ, অনাক্রম্যতার যে দিকটি কোষ মাধ্যমে প্রাপ্ত, সেদিকটি ব্যহত হয়, ক্যানসারে বা রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগে।

বিপাক পরিপন্থী রাসায়নিক বস্তুঃ কিছু বস্তু আছে, যেমন 6-মারক্যাপটোপিউরিন, যা অনাক্রম্যতার প্রাথমিক অবস্থারই বিরোধী। কোন বস্তু ইনজেকশান দেবার দু'দিনের মধ্যে, মারক্যাপটোপিউরিন প্রয়োগ করলে প্রতিবস্তুর আবির্ভাব ব্যহত হয়।

লিম্ফোসাইট না থাকলেঃ কোন কারণে, লিম্ফোসাইটের ঘাটতি যদি হয়, তাতে অনাক্রম্যতা ও রোগ-প্রতিরোগ ক্ষমতার ব্যাঘাত ঘটে। শরীরে এক্স-রে প্রয়োগে, লিম্ফোসাইট কমে গেলে, এ রকমটা হতে পারে।

ইমিউনোগ্লোবিউলিনের চরিত্রঃ ইলেক্‌ট্রাফোরেসিসের সাহায্যে গ্লোবিউলিনের বিভিন্ন অংশগুলি আলাদা আলাদা হয়ে যায়। অনাক্রম্যতার জন্য দায়ী প্রধানতঃ এর গামা (γ) অংশটি। আলফা (α) ও বিটা (β) অংশের যে কোন কাজ নেই, তা নয়। এমনকি একটি বিশিষ্ট প্রোটিন ইনজেকশান দিলেও, তার প্রতিবস্তুতে একাধিক গামা গ্লোবিউলিন থাকে।

প্রতিবস্তুর রাসায়নিক চরিত্রঃ প্রতিবস্তুর অণুর ভার নির্ধারণ করার ফলে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে এদের ফেলা সম্ভব হয়েছে। আণবিক ভার 1,50,0C0 যে অণুর, তাদের বলা হয়েছে 7S পর্যায়ের। S-এর অর্থ হল আলট্রা সেন্ট্রিফিউজের আবিষ্কর্তা সেডবার্গ একক বা ইউনিট অনুসারে। আর যে গ্লোবিউলিন খুব বড় ধরনের, 10^6 এই পর্যায়ের ভার, সেগুলিকে 19S পর্যায়ের বলা হয়। অনুরূপভাবে, ইলেকট্রোফোরিসিস যন্ত্রের সাহায্যে, প্রতিবস্তুকে γ^1, γ^2, β^1, β^2 ইত্যাদি শ্রেণীতে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এগুলি আবার β^2M, γ^1M ইত্যাদি অথবা 19S এই রকমের শ্রেণীবিভাগও করা হয়েছে। আসলে প্রতিবস্তু মাত্রেই গামা গ্লোবিউলিন পর্যায়ের।

দেখা গেছে যে চারটি পেপটাইড শৃঙ্খল এই অণুতে থাকে। হালকাগুলিতে 217টি এ্যামাইনো এ্যাসিড থাকে। ভার 25000। এর থেকে ভারীগুলির ওজন আরো বেশী। 50,000, 1,50,000 বা তার বেশীও ওজন হতে পারে। অনেকগুলিতে প্রোটিন ছাড়া শর্করাও থাকে অণুতে। অণু বিন্যাসের কয়েকটি ছবি দেয়া হল।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দেখলে ইমিউনোগ্লোবিউলিনগুলি Y বা T-এর
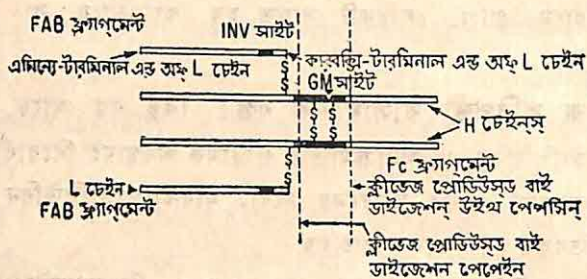
চিত্র 5

মত দেখায়। গামা, অর্থাৎ ইমিউনোগ্লোবিউলিনও শরীরে ইনজেকশান

টাইপ K টাইপ L

IgG K γ λ γ

IgA K α λ α

IgM K μ λ μ

IgD K δ λ δ

IgE K ε λ ε

চিত্র 6

দিলে, অন্য প্রোটিন যেমন প্রতিবস্তু উৎপাদন করে, এরাও তেমনি করতে
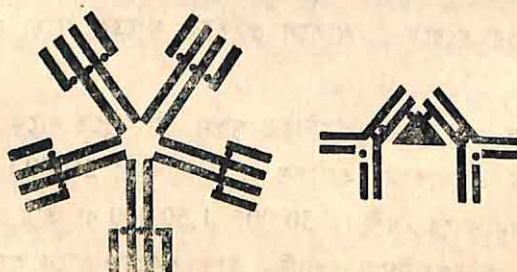
চিত্র 6

পারে। এই পদ্ধতিতে প্রতিবস্তু উৎপাদন করে, তারপর তা ইলেক্‌ট্রো-ফোরেসিস সহযোগে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যে বিভিন্ন ভারের গামা গ্লোবিউলিনের চরিত্র ভিন্ন। মানবদেহের প্রতিবস্তুগুলিও বস্তুগুলির বিশিষ্ট প্রতিবস্তু উৎপাদনের ক্ষমতাদায়ক অণুসংগঠনের উপরে নির্ভর করে। ভারী শৃঙ্খলগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলিকে বলে γ, α, μ, δ, ξ ও সেই অনুসারে পাঁচ রকমের প্রতিবস্তু আছে। এগুলি হল, I_gG, I_gA, I_gM, I_gD, ও I_gF। শৃঙ্খলগুলির নাম কাপা (X) ও ল্যেম্ভা (λ), এগুলি হালকা। তবে একই সঙ্গে দুটি হালকা শৃঙ্খল থাকে না।

বিভিন্ন ইম্যিউনোগ্লোবিউলিনের চরিত্রঃ I_gG—ইলেকট্রো-ফোরেসিস ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে ধীরগামী। রক্তরসের 20% ভাগ। 3% শর্করা জাতের বস্তু থাকে। ফুলের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে ভ্রূণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই ভগ্নাংশই সবচেয়ে দীর্ঘজীবী। এর অর্ধজীবন পাঁচ দিন।

I_gA—রক্তরসে 0·2 – 0·4% পরিমাণ থাকে। শরীর থেকে নিঃসারিত মিউসিন, মাতৃদুগ্ধের পূর্ববর্তী কলোষ্ট্রাম, এই সব জায়গায় I_gA বেশী থাকে। এতে 7·5% শর্করা। ছবিতে তুলনামূলকভাবে I_gA ও I_gM দেখলে আণবিক বিন্যাস বোঝা যাবে।

I_gD ও I_gE—ইলেকট্রোফোরেসিস বিশ্লেষণ মাধ্যমে এই দুটি অপেক্ষাকৃত হালকা ইমিউনোগ্লোবিউলিনের হিসাবে দেখা দেয়। প্রথমটির কি কাজ জানা নেই। পরেরটি অতি-সংবেদনশীলতা, এ্যালার্জি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। এর আণবিক ভার 2,00,000-এর কাছে।

I_gM—এই গ্লোবিউলিন 19S পর্যায়ের। শতকরা দশভাগ শর্করা নিয়ে এই ভগ্নাংশটির আনবিক ওজন 900,000। এতে আবার কতকগুলি 7S ভগ্নাংশের একক আছে। তা ছাড়া থাকে অপেক্ষাকৃত ভারী একটি শৃঙ্খল।

প্রতিবস্তুর বৈশিষ্ট্য

প্রতিবস্তুর বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে তার এ্যামাইনো এ্যাসিড ক্রমবিন্যাসের উপর। মায়লোমা রোগীর রক্তরস বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, কিছু জায়গার এর এ্যামাইনো ক্রমন্বয় একই রকমের। হঠাৎ কোন কোন জায়গায় ভিন্নতা থাকে। বৈশিষ্ট্যের কারণও এই ভিন্নতা। তবে শুধু রাসায়নিক

বিশ্লেষণেই এর সামগ্রিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে সঠিক বিচার বস্তু-প্রতিবস্তুর পারস্পরিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেই জানা যায়।

বস্তু-প্রতিবস্তুর সংযোগ

বস্তু-প্রতিবস্তুর সংযোগে কি ধরনের শক্তি প্রয়োজন হয় তা ভাল জানা নেই। তবে আণবিক সংযোগে যাকে কোভেলেণ্ট সংযোগ বা বণ্ড বলে, তা এ নয়। এই যোগবন্ধন ভাঙ্গা সহজ ও এই উপায়ে বিষ-প্রতিবিষ যোগ থেকে শক্তিশালী বিষও বার করা যায়।

বস্তু-প্রতিবস্তুর সংযোগে যে স্থায়ী জিনিস জন্মানো সম্ভব হয়, তাকে বলে সংযোগ ব্যগ্রতা বা এ্যাভিডিটি। অতি-সংযোগব্যগ্র বা এ্যাভিড প্রতিবস্তু যেখানে, অনাক্রম্যতাও সেখানে বেশী বলা যায়।

বিভিন্ন ধরনের প্রতিবস্তু

এ্যাগ্লুটিনিন—আঠায় জড়ানো ধরনের প্রতিবস্তু ঃ উৎপাদক বস্তু যদি অপেক্ষাকৃত বড় টুকরো দিয়ে গঠিত হয়, তা প্রতিবস্তুর সংযোগে, খালি চোখে দেখা যায়, এমন টুকরো টুকরো জমাট বস্তু হয়ে জমে যায়। বস্তু টুকরোগুলি যদি এক একটি বীজাণু হয়, তাহলে তাদের বহির-শরীরের পৃষ্ঠদেশ (Surface) বস্তু বা এ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করে। এর পরিবর্তে ট্যানিন রঞ্জিত লোহিত কণিকা, কি কলোডিয়ন বা পলিষ্টেরিনকে প্রতিবস্তু সৃষ্টি করতে পারে, এমন বস্তু মাখিয়ে নিলে, তারপর তাকেই জমাট বাঁধিয়ে,

চিত্র 8
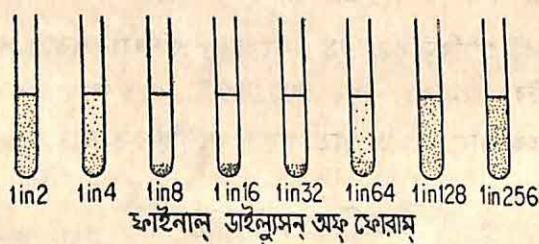
কতটা প্রতিবস্তু আছে তা দেখার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের লোহিত কণিকা জমাট বাধানোর যে পন্থা, এ অতি সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মতা

দশগুণ বলা যেতে পারে। রিউমাটয়েড আর্থাইটিস ইত্যাদি রোগে এ পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়েছে।

এই পদ্ধতি পরীক্ষামাধ্যমের pH-এর উপর, তার উত্তাপ ও তার তড়িৎ-বস্তুর (electrolyte) উপর নির্ভর করে। বস্তু বা প্রতিবস্তু কোনটিরই মাত্রাধিক্য হলে এ পদ্ধতি কার্যকর হয় না। এ জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে তরলতার উপযুক্ত মান তৈরি করে এ পরীক্ষা করা হয়।

প্রেসিপিটিন ঃ বস্তু প্রতিবস্তুর পরীক্ষায় যখন দ্রবণশীল নয়, এমন কিছু জমাট বাঁধার ফলে তৈরি হয়, তাকে প্রেসিপিটিন বলে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবস্তু সৃজনকারী বস্তুটি দ্রবণশীল থাকে। এজন্য বীজাণুরও দ্রবণশীল বস্তু বার করে
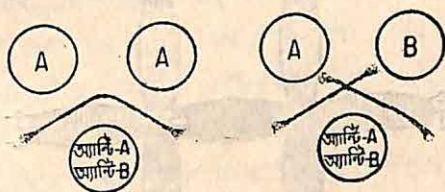
চিত্র 9

নিয়ে তাই ব্যবহার করতে হয়। পরীক্ষার উপায় হিসাবে আগারের জেলি, যার মধ্যে দ্রবণশীল বস্তু ও প্রতিবস্তু দুই দ্রবিত অবস্থায় সঞ্চারিত হতে পারে, তাই ব্যবহার করা হয়। ওডিন (oudin) ও অক্টারলোনির (ouchter-lony) আবিষ্কৃত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

প্রেসিপিটিনও এ্যাগ্লুটিনিনের মতই pH ও বিদ্যুৎনির্ভর। বিদ্যুৎবাহক রসায়ন ভিতরে না থাকলে, অণু বা অণুর অংশ পরিবাহিত হয়ে এ্যাগ্লু-টিনেশান ঘটতে পারে না। এজন্য সমবলী লবণের দ্রাবণ ব্যবহার করতে হয় মাধ্যম হিসাবে। কতটা পরিমাণ বস্তুর সঙ্গে কতটা প্রতিবস্তুর সংযোগ হবে, সেটা নির্ভর করে প্রতিবস্তুর রাসায়নিক গ্রহণক্ষমতা বা ভ্যালেন্সির (valency) উপরে। প্রতিবস্তুর এ ক্ষমতা দ্বিমুখী ও বস্তুর বহুমুখী হতেই সাধারণতঃ দেখা যায়। তবে বস্তু প্রতিবস্তুর মধ্যে কোনটা কি পরিমাণে রয়েছে তার উপরেও এই গ্রহণক্ষমতা বা ভ্যালেন্সি কমবেশী হতে পারে। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, কোন বস্তুর এমন গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, যা ভিন্নমুখী একাধিক প্রতিবস্তু সৃজন করতে পারে।

প্রেসিপিটিন পরীক্ষায় ব্যবহার হয়, বহু জায়গায়; স্ট্রেপটোকক্কাসের শ্রেণীবিভাগ থেকে আরম্ভ করে, কোন জায়গায় রক্ত কি বীর্যের দাগ লেগেছে কি না, তা দেখতে, সিফিলিসের জন্য V.D.R.L. কি Khan পরীক্ষায়।

এ্যাম্বোসেপ্টার (amboceptor): বা অপূর্ণমাত্রিক প্রতিবস্তু বলে এক ধরনের প্রতিবস্তু থাকে, সেগুলি কম্প্লিমেণ্ট (complement) বলে এক ধরনের প্রোটিনের মধ্যস্থতায় বস্তুকে যদি ধরে, তাহলে কম্প্লিমেণ্ট রক্তের লোহিতকণিকা (যা পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়) ভাঙ্গতে পারে না। ভাসারম্যান (wasserman) রিএ্যাকশান এইভাবে দেখা হয়।
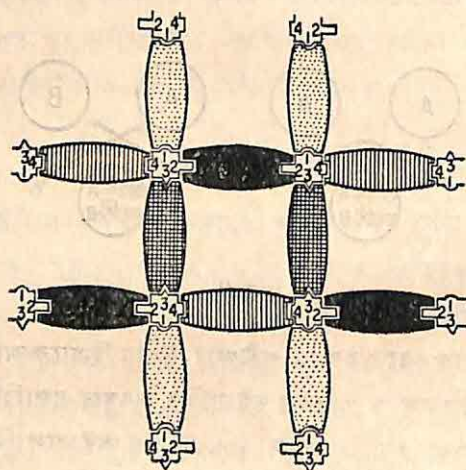
চিত্র 10

ভাসারম্যান রিএ্যাকশানে প্রতিবস্তুর সঙ্গে যোগের বস্তুটি হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী। যে রক্তরস পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটিকে 56°C উত্তাপে আধঘণ্টা গরম করে, তার নিজস্ব কম্প্লিমেণ্টকে নিস্তেজ করে নেয়া হয়। তারপর উপযুক্ত পরিমাণ কম্প্লিমেণ্ট, বস্তু ও রক্তরসে অবস্থিত প্রতি-বস্তুকে শরীরের উত্তাপের মত 37°C-তে দু'ঘণ্টা রাখলে, প্রতিবস্তু (যদি তা থাকে) তাহলে তা, কম্প্লিমেণ্টের সাহায্যে বস্তুকে ধরবে। ফলে হিমো-লাইসিন, অর্থাৎ যা রক্তকণিকাকে ভাঙ্গতে পারবে। আর সে কাজ করতে না পারলে রক্তকণিকা ভাঙ্গবে না। একেই পজিটিভ বা যোগাত্মক ফল বলে, অর্থাৎ রক্তকণিকা না ভাঙ্গা।

যে এ্যাম্বোসেপ্টারের কথায় এত কথা উঠল, তা IgG বা IgM ধরনের ইমিউনোগ্লোবিউলিন। যে পরীক্ষাটির কথা বলা হল, সেটি সিফিলিসের রোগনির্ধারণের। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, প্রতিবস্তুর একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে, যার জন্য বস্তু ও লোহিতকণিকা ইত্যাদি, পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। একে সংযুক্তিঘটক প্রতিবস্তু বলা হয় (immune adherence antibody)।

অপসোনিন ঃ এ নাম দেয়া হয়েছে যেগুলি থাকলে বীজাণুরা শ্বেত-কণিকাদের গ্রাস করার পক্ষে উপযুক্ততর হয়ে ওঠে। অপসোনিনের মোড়ক থাকলে, বীজাণুদের গ্রাস করা সহজসাধ্য হয়।

ব্লকিং বা রোধক প্রতিবস্তু ঃ এই ধরনের প্রতিবস্তু উপযুক্ত বস্তুর সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হয় তা দেখা যায় না। কিন্তু পরে অন্য কোন বস্তু-প্রতিবস্তুর যোগাযোগকে অসম্ভব করে তোলে। রক্তের এক বিশেষ অসঙ্গতিতে এটি লক্ষ্য করা যায়। এর পরীক্ষার জন্য কুম্বের পরীক্ষা (Coomb's test) করতে হয়। এতে আগে বিশেষ ঘেরাটোপে আচ্ছাদিত লোহিতকণিকাতে মনুষ্য গ্লোবিউলিনের প্রতিবস্তু যোগ করলে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। রোধক প্রতিবস্তুর একটিমাত্র বাহু থাকে বলে মনে করা হয়।

কোষনাশক প্রতিবস্তু ঃ টিস্যু কালচারে জন্মানো বিশেষ কোষকে এই ধরনের প্রতিবস্তু নষ্ট করতে পারে। থাইরয়েড গ্রন্থীর রোগ যা হাসিমোটোর নামাঙ্কিত, তাতে এই প্রতিবস্তু পাওয়া যায়।

নিরপেক্ষণকারী (neutralising) **প্রতিবস্তু ঃ** অনুঘটকের মত অনেক বস্তু আছে, যার আচরণে কোন লক্ষণীয় বিশিষ্টতা থাকে। যেমন তা হয়ত কিছুকে হজম করে ফেলতে পারে। এ ধরনের ক্ষমতাকে উপযুক্ত প্রতিবস্তু, কার্যহীন নিরপেক্ষ অবস্থায় পরিণত করে দিতে পারে।

কোষ সংযুক্ত প্রতিবস্তু (cell bound antibodies) **ঃ** এই ধরনের প্রতিবস্তু আর অতি-সংবেদনশীলতা এক সঙ্গেই থাকে। কিভাবে যে অতি-সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট কোষ কাজ করে তা জানা নেই। হয়ত বিশেষ ধরনের প্রোটিন যেমন লিম্ফোকাইনেজের মাধ্যমে এ কাজ হয়। এটি একটি বিশেষ প্রোটিন।

প্রতিবস্তুর বৈচিত্র্য বহুবিধ। যেমন—

1. ম্যাক্রোফাজ কোষের চলাচলে যা বাধা সৃষ্টি করে। আণবিক ভার : 25—55,000।

2. সমাবেশ পটু : 10,000 আণবিক ভার। এই প্রতিবস্তু অন্য কোষকে নিয়ে আসতে সাহায্য করে।

3. লিম্ফোটক্সিন : ভার 8,000—1,50,000। ফাইব্রোব্লাষ্ট জাতীয় কোষকে প্রয়োজন হলে নষ্ট করতে পারে।

4. অতি-সংবেদনশীলতায় যে রকম চামড়া ফুলে ওঠে, তার অনুকল্প প্রতিবস্তু।

5. রাসায়নিক আকর্ষক : বহুনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট শ্বেতকণিকাকে আকর্ষণ করে।

6. কোষ বিভাজক : এ প্রতিবস্তু লিম্ফোসাইটকে কোষ বিভাজনের উত্তেজনা দেয়।

7. ইণ্টারফেরন : এ জাতীয় প্রতিবস্তু ভাইরাস-বিরোধী।

প্রতিবস্তু কোথায় তৈরি হয়

থাইমাস : লিম্ফ কোষগ্রন্থী তৈরি হয় থাইমাসে। থাইমাস কোষ দেখতে লিম্ফ কোষের মত।

বারসা : পাখীদের পায়ুর (cloaca) উপস্থ এলাকায় লিম্ফগ্রন্থি সৃষ্ট হয়। অন্য প্রাণীতে এ গ্রন্থী তৈরি হয় জোড়ের মুখে।

লিম্ফ কোষ : শরীরের সর্বত্রই ছড়ানো থাকে লিম্ফগ্রন্থী। এই গ্রন্থীর মধ্যে সাইনাস বা চলাচলের পথের মত আছে। এরই ধারে থাকে একরকম কোষ। এ ছাড়া থাকে রেটিকুলাম কোষ, যা রেটিকুলিন তন্তু বহন করে। এ সবই গ্রন্থীর ভিতরে থাকে। বাইরের দিকে (corlex) থাকে লিম্ফোসাইট ঠাসা আলাদা আলাদা বীজকোষ (tollicle)। এগুলি থেকে নবকোষ জন্মায়। এছাড়া থাকে ম্যাক্রোফাজ, যারা DNA প্রস্তুতে ভূমিকা নেয়। মধ্যাংশে সাইনাস থাকে।

লিম্ফ কোষকে উৎপত্তির জায়গা অনুসারে T লিম্ফোসাইট ও B লিম্ফোসাইট হিসাবে ভাগ করা হয়। তাদের কাজ ভিন্ন।

রক্তের লিম্ফোসাইট : এই কোষগুলির মধ্যে ছোট কি বড় দু'রকম কোষ আছে। জন্মসূত্র অনুসারে T ও B এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

থাইমাসে যাদের উদ্ভব, তারাই T শ্রেণীর। রক্তে এদেরই সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। বারসায় উদ্ভূত লিম্ফোসাইটগুলিকে B লিম্ফোসাইট বলে। এগুলি কম ঘোরাফেরা করে। এদের আয়ুও হ্রস্বতর।

মানুষের ক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণীর কোষে তফাৎ করতে হলে তারও উপায় আছে। ভেড়ার লোহিতকণিকায় এই লিম্ফোসাইট মিশিয়ে রাখলে দেখা যায়, শতকরা তিরিশ ভাগ লিম্ফোসাইটের চারিদিকে, এই লোহিতকণিকা-গুলি মালার মত আটকে যায়। এইগুলি T লিম্ফোসাইট। আবার IgG ও IgM-কে যদি আভা দেখায় এমন রঞ্জক পদার্থ লাগিয়ে, তা লিম্ফোসাইটে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে 10% থেকে 30% ভাগ কোষ এই রঙের আভা দেখায়। এগুলি B লিম্ফোসাইট। এইভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, দীর্ঘস্থায়ী লিম্ফেটিক লিউকিমিয়া রোগে (chronic) B কোষই অংশ নেয়।

প্লীহা ঃ প্লীহার গঠনের সঙ্গে লিম্ফগ্রন্থীর গঠনের মিল আছে। এখানে লিম্ফ কোষের পাশাপাশি কিছু খাদক কোষ থাকে। লিম্ফোসাইট কোষের পরিণতি।
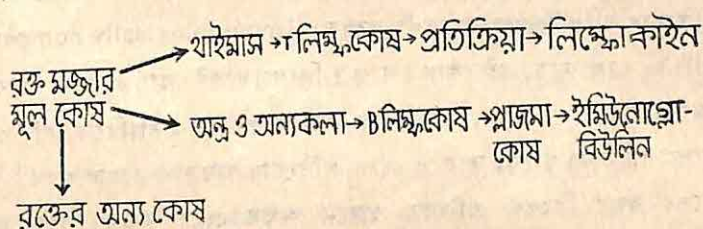
লিম্ফোসাইট কোষ সম্পর্কে বর্তমানে এত কথা যে জানা গেছে, তা সম্ভব হয়েছে কয়েকটি বস্তু হাতে আসাতে। যেমন ঃ

ফাইটো-হিম্যাগ্লুটিনিন—বিশেষ ভাল জাতের একটি বস্তুর দানা থেকে এটি পাওয়া। এর সাহায্যে রক্তের লোহিতকণিকা থেকে শ্বেতকণিকা আলাদা করে, শ্বেতকণিকা, প্রধানতঃ লিম্ফোসাইটের চাষ করা যায়। এই-ভাবে কালচার বা চাষ করায় এই কোষ প্রথমে অপরিণত ব্লাষ্ট কোষে পরিণত হয়ে, তারপর পরিণত হয়। এইভাবে অনেক কিছু জানা যায়। কোষের স্মৃতিতে যে বিশেষ প্রতিবস্তু তৈরি করার স্মৃতি থাকে, তা ক্রমান্বয়ে প্রতিবস্তু হতেই থাকে। তাছাড়া ক্যানসার রোগীর ক্যানসার প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে কি না, তাও বোঝা যায়, প্রতিবস্তু তৈরির কোষ কত জন্মাল, তার উপর।

প্রতিরক্ষার ধাপ ঃ প্রতিরক্ষাও হয় ধাপে ধাপে।

পরিচিতি ঃ যে বস্তুর বিরোধী প্রতিবস্তু তৈরি করতে হবে, প্রথমে কোষকে নিশ্চিত হতে হবে যে বস্তুটি অপরিচিত। তারপর, এ বস্তু সম্পর্কে স্মৃতিও আবশ্যক।

প্রস্তুতি ঃ বস্তুটি কি, তা চেনার পরের কাজ হল প্রতিবস্তু সৃষ্টির প্রস্তুতি।

প্রতিবস্তু তৈরি ঃ এটি শেষ ও পরিপূর্ণ ধাপ। এ কাজ হয় বিশেষ ধরনের প্রোটিন তৈরির মাধ্যমে।

কোন বিশেষ জায়গায় যে প্রতিবস্তু তৈরি হবেই এমন কথা নেই। প্লীহা, যকৃত, লসিকাগ্রন্থী, সবখানেই প্রতিবস্তু তৈরি হতে পারে। মোটের উপর তৈরিটা হয় লিম্ফো-রেটিকুলার কোষরাজি, অর্থাৎ একনিউক্লিয়াস কোষ, লিম্ফকোষ ইত্যাদিতে।

কোন বস্তুর বিরুদ্ধে প্রতিবস্তু সৃষ্টির যে প্রয়োজন, সেই প্রতিবস্তু নিজেই সৃজন করুক না করুক, তার যোগ্যতা যে কোষের আছে, সেই কোষকে বলে প্রতিরোধ বা প্রতিরক্ষা পারদর্শী কোষ (Immunologically competant cell)। দেখা যায়, এই কোষ হল ক্ষুদ্র লিম্ফোসাইট কোষ। এর কয়েকটি প্রমাণও আছে। যেমন, সারাদেহে এক্স-রে প্রয়োগ ইত্যাদিতে, যদি দেহে লিম্ফোসাইট না থাকে, তাহলে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও ব্যহত হয়। কিন্তু বিশেষ বস্তুর বিরুদ্ধে প্রতিবস্তু সৃজনে অক্ষম দেহে নতুন লিম্ফোসাইট সঞ্চারিত করলে, আবার প্রতিবস্তু সৃজন সে দেহে সম্ভব হয়। কিভাবে বিশেষ কোষ বিশেষ বস্তুকে চেনে, সেটা জানা নেই। T ও B লিম্ফোসাইট, দুয়ের গায়েই ইমিউনোগ্লোবিউলিন থাকে। কিন্তু এ থেকেও নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

ইমিউনোগ্লোবিউলিন স্রষ্টা কোষ ঃ প্লাজমা কোষে যে ইমিউনো-গ্লোবিউলিন থাকে, এটা দেখা গেছে, বর্তমানের আইসোটোপ লাগানো বস্তু ব্যবহার করে। তাছাড়া কোন বিশেষ প্রাণীর লিম্ফোসাইট কোষ, যা প্রতিবস্তু তৈরিতে রত, তাদের হয়ত ঢালা হল আগার প্লেটে। এ প্লেটে হয়ত রয়েছে সেই প্রাণীর লোহিতকণিকা। এবার কম্প্লিমেন্ট প্রয়োগ করে, উপযুক্ত উত্তাপে রাখলে, রক্তকণিকা বস্তু ও প্রতিবস্তুর সংযোগে ভেঙ্গে গিয়ে, সে জায়গাটা পরিষ্কার দেখাবে।

যদি লসিকাগ্রন্থীর কাছাকাছি জায়গার চামড়ায় প্রতিবস্তু সৃজনের উপযোগী কোন বস্তু ইঞ্জেকশান করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, লসিকা-গ্রন্থীর বহিরাংশে যেখানে বীজকোষ ছিল সংখ্যায় কম, ও সুপ্ত অবস্থায়, তারা সংখ্যায় বেড়ে যেন জেগে ওঠে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে যে সেইসব কোষ ইমিউনোগ্লোবিউলিন তৈরি করে, সব ভাসিয়ে দেবে, তা নয়। কিন্তু সেই গ্রন্থীগুলি তৈরি হয়ে রইল, এই কাজের জন্য।

প্রতিবস্তু ইমিউনোগ্লোবিউলিন সৃষ্টির থিওরিসমূহ : কি করে যে একটা নতুন ধরনের প্রোটিন তৈরি হতে পারছে এটা একটা সমস্যা। এর একাধিক থিয়োরি আছে।

নির্দেশক থিয়োরি (Instructive) : এ থিয়োরিটি প্রাচীন। এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিবস্তু উৎপাদনকারী বস্তু ছাঁচের মত। ইমিউনোগ্লোবি-উলিন যা আছে তাকে এই ছাঁচের প্রভাবে বদলে নেয়া হয়। এ থিয়োরির ত্রুটি হল যে এতে ধরে নিতে হবে যে প্রতিবস্তু যতক্ষণ তৈরি হচ্ছে, ততক্ষনই বস্তুকে (antigen) হাজির থাকতে হবে। কিন্তু এটা অবাস্তব। কেন না ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবস্তু সারা জীবন ধরেই তৈরি হতে দেখা যায়, বস্তুর উপস্থিতি ছাড়াই। তাছাড়াও দেহের প্রতিরক্ষা তখনই চরমে পৌছয়, যখন গ্লোবিউলিন সৃজক বস্তু অপসৃত হয়ে গেছে। তবে বস্তুর প্রোটিনের অংশবিশেষ RNA-র সংযুক্ত হয়ে প্রোটিন প্রস্তুতিকে দীর্ঘকাল প্রভাবান্বিত করে, এটা সম্ভব।

নির্বাচন থিয়োরি (Selective) : এ থিয়োরি জার্ন (Jerne) ও বার্নেটের (Burnet)। এ থিয়োরিতে ধরেই নেয়া হয়েছে যে ভ্রূণ সংগঠিত হবার সময় কিছু কোষ, যারা প্রতিরক্ষার উপযুক্ত, তাদের দেহগঠনে মিউটেশানধর্মী পরিবর্তন হতে দেখা যায়। এতেই এক নতুন শ্রেণীর কোষ জন্মায়। এরই ফলে পরবর্তীকালে, যে কোন অপরিচিত বস্তু শরীরে ঢুকলে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবস্তু সৃজনের ক্ষমতা সেই কোষগুলির থাকে। মনে হবে যে, এ ধরনের মিউটেশানধর্মী পরিবর্তন যদি হতে থাকে, তাহলে তো এমন অবস্থা হতে পারে, যখন নিজের দেহের নিজস্ব কোষের বিরুদ্ধেই প্রতিবস্তু তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয় না। এর কারণ হল, ভ্রূণাবস্থায় কোষ-গুলির নিজস্ব বস্তু যেন চিনতে শেখে ও সেই কোষগুচ্ছ (clone) হয়ে ওঠে

নিষিদ্ধ (forbidden) গুচ্ছ। এই চিন্তার মাধ্যমে প্রতিরক্ষায় সহিষ্ণুতা (immunological tolerance) কিভাবে হয়, তা বোঝা যায়।

প্রতিরক্ষায় সহনশীলতা (immunological tolerance) ঃ যদি গর্ভস্থ ভ্রূণের দেহে কোন বস্তু ইঞ্জেকশান করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তবে ভ্রূণের কোষ, সেই বস্তুকে নিজস্ব বলে মেনে নেয় ও ভবিষ্যতে তার বিরুদ্ধে প্রতিবস্তু তৈরি করতে পারে না। এইভাবে ভ্রূণাবস্থায় ভ্রূণই যেন আত্ম (self) ও অনাত্ম বা পর (non-self) এটি চিনতে শেখে ও সেই অনুযায়ী বিরোধী প্রতিবস্তু উৎপন্ন হবে কি না হবে সেটা ঠিক করে। এইটি প্রথম দেখান বার্ণেট।

বার্ণেটই দেখালেন যে, বিশেষ বস্তুর সংস্পর্শেই কি করে বিশেষ কোষ-গুচ্ছের অবলুপ্তি ঘটে। দেহকোষের আত্ম কি পর যে উপলব্ধির কথা বললাম, তা ভ্রূণাবস্থা থেকে আরম্ভ হয়ে পরিণত বয়স পর্যন্ত থাকে। এ জন্যই পরিণত বয়সেও প্রতিরক্ষায় পারদর্শী কোষ তৈরি করতে দেহ সমর্থ থাকে। যাতে প্রয়োজনমত আবশ্যক বস্তুর বিরুদ্ধে প্রতিবস্তু তৈরি করতে পারে।

প্রতিরক্ষায় সহনশীলতা (immunological tolerance) ঃ এটি হতে পারে বিবিধ উপায়ে।

(1) ভ্রূণাবস্থায় কোন বস্তু প্রয়োগে শরীর এ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়।

(2) পরিণত প্রাণীর দেহে অতিরিক্ত পরিমাণে কোন বস্তু প্রয়োগে।

(3) অতিমাত্রায়, কি স্বল্পমাত্রায়, কি বার বার একই বস্তু প্রয়োগ করলে।

(4) লসিকাগ্রন্থী ও সংশ্লিষ্ট রেটিকুলার সিস্টেম যদি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটা হতে পারে, কোষের ক্ষতি করে এমন কোন ওষুধে।

(5) কোন প্রাণীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা যদি ভেঙ্গে দেয়া হয়, যেমন জন্ম-মাত্রেই থাইমাস বাদ দিয়ে।

(6) পিক্রিল ক্লোরাইডের মত কোন বস্তু যদি খাওয়ানো হয়।

অনেক সময় প্রতিরক্ষার এই উদাসীন ভাব দূর হয়, একটু ভিন্নতর কোন বস্তু প্রয়োগ করে। তাছাড়া শরীরগত প্রতিরক্ষা যদি ব্যাহত হয়, কোষগত প্রতিরক্ষাকে উত্তেজিত করা যেতে পারে। প্রতিরক্ষায় সহনশীলতার দুটি কারণ। এক ঃ দেহে সহনশীল কোষের জন্ম। দুই ঃ অংশগ্রহণকারী কোষের কার্যকারীতার অবলোপ।

12 সংক্রমণ ও প্রতিরোধ

রোগ সংক্রমণকে প্রতিহত করা প্রাণ ধর্ম। একে অন্য কথায় অনাক্রম্যতা বলা হয়। আগে যদি সেই বীজাণুর আক্রমণ হয়ে থাকে, তা হলে পুনর্বার সেই বীজাণুর আক্রমণ হলে দেখা যায় যে সেই প্রাণী বীজাণুর পুনরাক্রমণে বাধা দিয়ে রোগমুক্ত থাকে। একে বিশিষ্ট ধরনের অনাক্রম্যতা (specific immunity) বলে।

এই দেখেই চামড়ার অংশবিশেষে ইচ্ছাকৃত বসন্ত ভাইরাসের আক্রমণ ঘটিয়ে বসন্ত রোগে অনাক্রম্যতা সৃজন করা হত। এর যে বিপদ ছিল, 1976 খ্রীষ্টাব্দে জেনারের গো বসন্ত ভাইরাস প্রয়োগ করে টীকা দেবার পদ্ধতি আবিষ্কার হলে, তা দূরীভূত হল।

আলোচনার আগে একটা কথা বলে নেয়া প্রয়োজন যে, সব বীজাণু, সব প্রাণীকে আক্রমণ করে না। যেমন ল্যান্সফিল্ডের B গ্রুপের ষ্ট্রেপটোকক্কাস গরুকে আক্রমণ করলেও মানুষকে করে না। আবার তেমনি, বিশেষ বীজাণু বিশেষ অঙ্গকেই আক্রমণ করবে। যেমন, কলেরা বীজাণু খাদ্যনলীতে রোগ উৎপাদন করলেও চর্মতলে নিষ্ক্রিয়। কিন্তু টিউবারকুলোসিসের মত বীজাণুও আছে, যার আক্রম্য জায়গা ফুসফুস হলেও, খাদ্যনালীতেও রোগ সৃষ্টি করে।

আক্রমণে স্বাভাবিক অনাক্রম্যতাকে অতিক্রম করে সাফল্য লাভের জন্য, বীজাণু-সংখ্যাও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকা দরকার। বীজাণুর সংখ্যা খুব অল্প হলে, সেই বীজাণুর বিরুদ্ধে বিশিষ্ট ধরনের অনাক্রম্যতা না থাকলেও শরীরকোষ ও রক্তকোষের নিজস্ব ক্ষমতায় রোগ আক্রমণ ঘটে না।

স্বাভাবিকভাবে মারাত্মক নয়, এমন বীজাণুও, আক্রান্ত প্রাণী যদি কোন কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে, তাকে আক্রমণে বিপর্যস্ত করতে পারে। একে সুযোগ-সন্ধানী সংক্রমণ বলে (oppertunistic infection)।

অনাক্রম্যতার অনেকখানিই নির্ভর করে, প্রাণীর সেই বীজাণু সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর। এর রূপ হতে পারে বিভিন্ন।

পূর্বযোগাযোগ ব্যতিরেকে অনাক্রম্যতা ঃ আক্রমণকারী বীজাণু নষ্ট করবার ক্ষমতা সকল প্রাণীরই থাকে, তা ওই প্রাণীর শরীরে ওই বীজাণুর প্রতিবস্তু থাকুক বা নাই থাকুক। এতে কোষগত ও শরীরগত দুটি দিকই থাকে।

কোষগত দিক ঃ নিজস্ব নয়, এইরকম যে কোন কণিকা রক্ত ও অন্য কলার কোষেরা গ্রাস করে নেয়। বহুনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট রক্তের শ্বেতকণিকা ও মনোসাইট কি হিষ্টিওসাইট কোষ (রেটিকিউলো এণ্ডোথিলিয়াল পর্যায়-ভুক্ত) এতে প্রধান অংশ নেয়।

বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত শ্বেতকণিকার ত্রুটি ঃ যাদের রোগ সংক্রমণ বেশী হয়, তাদের রক্তের শ্বেতকণিকা বীজাণু গ্রাস করায় ও তাদের নষ্ট করায় অপটু। শ্বেতকণিকার এ কাজে যে শক্তি প্রয়োজন, তা আসে শর্করা ভাঙ্গা, যাকে গ্লাইকোলিসিস বলে, তারই মাধ্যমে।

আবার বীজাণু ও শ্বেতকণিকার মধ্যে যে স্বাভাবিক রাসায়নিক আকর্ষণ থাকে, তার কমতি থাকলেও বীজাণু অপসারণ ব্যহত হতে পারে।

বীজাণু গ্রাসের জন্য কমপ্লিমেণ্টের উপস্থিতি প্রয়োজন। এর অনুপস্থিতি বা হ্রস্বতার জন্যও বীজাণু আগ্রাসন বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।

গ্রানুলোমা সূচক অসুখ ঃ এই নামটির মাধ্যমে এক ধরনের অসুখকে ধরা হয়, যাতে শ্বেতকণিকা বীজাণু গ্রাস করছে, কিন্তু মেরে ফেলতে পারছে

না। কিছু শিশু যারা প্রায়ই অসুখে ভোগে, তারা এই পর্যায়ের। এটি X ক্রোমোসোমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি দুর্বল (recessive) অনুক্রমতা স্ত্রী বাহিত এই অনুক্রম।

এই রোগ মনে করা হত শুধু পুরুষদেরই হয়। কিন্তু বর্তমানে মেয়েদের মধ্যেও দেখা গিয়েছে। এই রোগে কয়েকটি অনুঘটকের হ্রস্বতা লক্ষণীয়; যেমন NADH অক্সিডেজ, গ্লুকোজ-6 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ, গ্লুটাথিওন পারক্সিডেজ ইত্যাদি।

আগ্রাসন বৃদ্ধি পায় এমন অবস্থা ঃ অনেক মময় BCG ইঞ্জেকশানের কিন্তু অন্য বিবিধ বস্তু দেবার পরে শ্বেতকণিকার আগ্রাসন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

শারীরগত দিক

রক্তরসের মধ্যে যে বীজাণুনাশক পদার্থ থাকে, এ আমরা জানি দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু কোন কোন নিহিত বস্তুর জন্য এটা ঘটে, ভাল করে জানা না থাকলেও কমপ্লিমেণ্ট, অপসোনিন ও প্রপারডিন এই তিনটি বস্তু কি কি কাজ করে খানিকটা জানা হয়ে গেছে।

কমপ্লিমেণ্ট ঃ বস্তুটি সম্পর্কে প্রথম ভাবনাচিন্তা করেন বোরদে (Bordet)। তিনি বলেন যে বস্তু-প্রতিবস্তুর সংযোগকে সাহায্য করবার জন্য প্রয়োজন হয় কম্প্লিমেণ্টের। থাপে থাপে বসার মত এই যোগাযোগ ঘটে। মাঝে যেন একটা অনুঘটকের মত কিছুটা ভেঙ্গে আর কিছুটা গড়ে এটা কাজ করে। কেউ যুক্তাক্ষর বা ছোট ও বড় অক্ষরের যোগের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। তাতেও যেমন অক্ষরের কেস থেকে অক্ষর নিয়ে এসে, অর্থাৎ শেখা অক্ষরের দল ভেঙ্গে আবার গড়তে হয়। তাই বলা হল, কাজ কিছুটা অনুঘটকের মত।

প্রতিরোধ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোহিতকণিকার কোষ ভাঙ্গা নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে। বিশিষ্ট প্রতিবস্তুর জন্যই এটা ঘটে। যে বস্তুর প্রতিবস্তু হিসাবে এই ব্যাপারটা ঘটে, তা অর্থাৎ সেই বস্তু, হয় লোহিতকণিকার বহি-প্রাচীরের প্রতিবস্তু অথবা তার সঙ্গে সংযুক্ত হাপটেন-সহ বস্তুর প্রতিবস্তু। এই প্রাচীর ভাঙ্গার প্রথম ধাপে থাকে এষ্টারেজ ও প্রোটিয়েজ অনুঘটক। কয়েকটি জটিল প্রক্রিয়া, যার পুরোটা জানা নেই, তার মাধ্যমে লোহিত

কোষের সংযোগ স্থানটির এমনই পরিবর্তন হয়, যে কোষ ভেঙ্গে যায়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে কোষ প্রাচীরের ছেঁদাগুলিও দেখা যায়।

এখানে কম্‌প্লিমেণ্ট কিভাবে কাজ করে তা দেখা যাক।

প্রথম কথাটি হল যে একটি আঘাত যথেষ্ট। অর্থাৎ একটিমাত্র গ্রাহক-কেন্দ্রের উত্তেজনাতেই লোহিতকণিকা ভেঙ্গে যেতে পারে।

ইমিউনোগ্লোবিউলিন এমের একটি অণুর সাহায্যেই কমপ্লিমেণ্ট কৃত কোষের ক্ষতসাধন করতে পারে। অন্য ইমিউনোগ্লোবিউলিনের পরিমাণ একটু বেশী লাগে।

কোষ ভাঙ্গার জন্য কমপ্লিমেণ্টের সব অংশগুলিরই প্রয়োজন হয়।

কাজের সময়ে কম্‌প্লিমেণ্টের দ্রবণশীল অনেকগুলি অংশের উদ্ভব হয়। এগুলি বস্তু-প্রতিবস্তু কাজের সুবাদেই উৎপন্ন হয়। তবে অন্যভাবেও হতে পারে। যেমন কিছু অনুঘটকের সাহায্যে। কম্‌প্লিমেণ্টের বিভিন্ন ভগ্নাংশ-গুলির বিভিন্ন কাজ আছে। যেমন:

অপসোনিনের কাজ: এই বস্তুর উপস্থিতিতে কোষবিশেষ বীজাণু ইত্যাদিকে গ্রাস করতে পারে।

প্রতিরোধমূলক সংযুক্তি (Immune adherance): কোষের সঙ্গে বীজাণু ইত্যাদির লেগে থাকা, কোষ সেগুলিকে গ্রাস করতে প্রয়োজন।

রাসায়নিক আকর্ষণ: একটি ভগ্নাংশ বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষের রাসায়নিক আকর্ষণকে উত্তেজনা দেয়।

এনাফাইলোটক্সিন: কম্‌প্লিমেণ্ট এ বস্তুর প্রস্তুতিতেও সাহায্য করে। এ বস্তু মাষ্ট (must) কোষকে হিষ্টামিন প্রস্তুতিতে সাহায্য করে। এরও আবার দুটি বিভিন্ন ভগ্নাংশ আছে। বস্তু-প্রতিবস্তুর পারস্পরিক কার্যের মাধ্যমেই এনাফাইলোটক্সিন প্রস্তুত হয়।

দেখা যাচ্ছে, কম্‌প্লিমেণ্ট রক্তরসের একটি প্রয়োজনীয় জিনিস। এর দ্বারা বীজাণুকোষ ভেঙ্গে যায়। পরোক্ষভাবে প্রদাহস্ফীতিকেও রূপ দেয়। যেমন শিরা ধমনীকে স্ফীত করে, শ্বেতকণিকাকে আকর্ষণ করে, বীজাণুকে গ্রাস করার সাহায্য করে। এর বিভিন্ন অংশ C2, C5, C4, ইত্যাদির জন্মগত স্বল্পতা কোন কোন প্রাণীতে দেখা যায়।

কম্‌প্লিমেণ্টের কার্যপদ্ধতির আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে, এর কাজের জন্য অনেকগুলি মধ্যবর্তি বস্তু আবশ্যক। C1, C2, C4

ইত্যাদির উল্লেখও করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে কোন কোন বীজাণুর অন্তর্বর্তি বিষ (endotoxin), কি কেউটে-গোখ্রা সাপের বিষ কম্প্লিমেন্টের শেষ পর্যায়ের কাজ করে দেয়। এ থেকে দেখা গেল যে কম্প্লিমেন্টের কাজের একটা বিকল্প পথও আছে।

বীজানুবিষ/ জাইমোসান
IgA
↓
প্রাক-অণুঘটক ——————→ C3 প্রাক কার্যকর অণুঘটক
C3 প্রাক কার্যকর ———→ C3 কার্যকর
সর্পবিষ—→সর্পবিষ-প্রাক কার্যকর
সংযোগ
C3 → C3a → C3b
C5-C9 সবগুলির উদ্বোধন
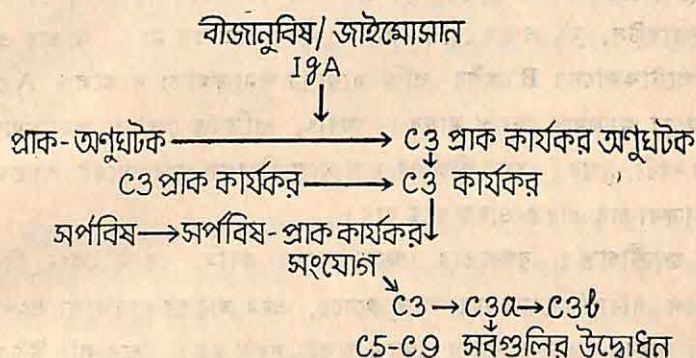
মোটামুটি জানলেও এর অনেকগুলি ধাপই জানতে বাকি।

সহজাত অপসোনিন : রক্তরসে একটি বিশেষ প্রোটিন আছে, যা মারাত্মক নয়, এমন বীজাণুকে এমন একটি রসে নিসিক্ত করে, যাতে বহু-নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষেরা তাদের গ্রাস করতে পারে। সিক্‌ল কোষ রক্তাল্পতায় এই ধরনের অপসোনিনের স্বল্পতা দেখা যায়। এজন্য এদের নানা রোগে ভুগতে দেখা যায়।

প্রপারডিন : রক্তরসে এই প্রোটিন যে আছে তা প্রথম 1954 সালে পিলেমার দেখান। তিনি দেখান, সুরাসারে জাইমোসান বলে যে শর্করা-জাতীয় উপাদান আছে, তার সাহায্যে কপ্লিমেণ্টের C3 থেকে C9 পর্যন্ত ভগ্নাংশকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে কেউ এ কথাও বলেন যে প্রপারডিন আসলে অনেকগুলি স্বল্পমানের প্রতিবস্তু, যা আলাদা-আলাদাভাবে থাকতে পারে না। বর্তমানে সামগ্রিক প্রপারডিনও পরিশ্রুত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এও হতে পারে যে, কপ্লিমেণ্টের যে বিকল্প পথের উল্লেখ করা হয়েছে, সেইটিই প্রপারডিন। কিন্তু রোগ-প্রতিরোধে প্রপারডিনের ভূমিকা উল্লেখ-যোগ্য, এ কথা বলাই বাহুল্য।

রোগ প্রতিরোধে জিনের ভূমিকা

প্রজাতীগত ঃ বিশেষ প্রজাতীর প্রাণীর বিশেষ বিশেষ রোগে অনাক্রম্যতা থাকে। যেমন মানুষের বা প্রাণীদের অনেক রোগে পূর্ণ অনাক্রম্যতা আছে। যেমন ডগ-ডিস্টোম্পার রোগ। আবার তেমনি কোন কোন মানুষের রোগ অনেক প্রাণীরই হয় না। এর উদাহরণ সিফিলিস। পোলিও-মাইলাইটিস, কুষ্ঠ, এ সব রোগও অন্য প্রাণীর সহজে হয় না। আবার একই স্ট্রেপটোকক্কাসের B শ্রেণীর প্রতি মানুষের অনাক্রম্যতা থাকলেও A শ্রেণী বীজাণুর আক্রমণে ভোগে মানুষ। অর্থাৎ, প্রতিবস্তু যেহেতু অনাক্রম্যতার জন্য দায়ী, বস্তুর (যেমন বীজাণুর) সামান্য জিনগত পরিবর্তনেই আক্রম্যতা অনাক্রম্যতার এদিক-ওদিক হয়ে যায়।

জাতীগত ঃ বৃক্ষলতার ক্ষেত্রে আমরা জানি, কোন কোন বিশেষ রোগে পরিপূর্ণ অনাক্রম্যতা লাভ করেছে, এমন জাতের গাছপালা উৎপাদন করা সম্ভব। এটা প্রাণীদের ক্ষেত্রে অতটা সহজ নয়। তবে লুরি টিউবার-কুলোসিসে কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন খরগোস, বিশেষ প্রজনন প্রথায় উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অত সরল নয়। তবু দেখা গেছে, তথাকথিত সিকল কোষ রক্তাল্পতা যাদের থাকে, তারা ম্যালেরিয়ায় সহজে আক্রান্ত হয় না। আবার এও দেখা যায়, ইয়োলো ফিভার রোগে আফ্রিকানদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ইউরোপীয়দের থেকে বেশী।

ব্যক্তিগত ঃ মনে হয় কেউ কোন রোগে বুঝি ভোগে কম। কিন্তু অনাক্রম্যতা হিসাবে এটা প্রমাণ করা শক্ত। তবে এটা দেখা গেছে যে, রক্তের বিশেষ গ্রুপের লোকের বিশেষ রোগ কম হয়, কি বেশী হয়। তবে এর কতটা তার জিন গঠনের উপর নির্ভরশীল তা বলা শক্ত। তাই ব্যক্তিগতটা আবার জিনগতও বটে।

অনাক্রম্যতা ও দেহের পূর্বপরিচিত বস্তুসমূহ—অর্জিত অনাক্রম্যতা

এই ধরনের অনাক্রম্যতা কোষজাত (cellular) বা শারীররসজাত (humoral) হতে পারে। যখন শরীর নিজেই প্রতিবস্তু তৈরি করে নেয়, তখন তাকে সক্রিয় (active) অনাক্রম্যতা বলা হয়। এও আবার অর্জিত

হয়ে থাকতে পারে স্বাভাবিকভাবে অথবা পরোক্ষভাবে। যখন প্রতিবস্তু অন্য কারো রক্তরস, অর্থাৎ যার রক্তরসে এই প্রতিবস্তু আছে তাই যদি অন্যের শরীরে সঞ্চালিত করা হয়, তাহলে প্রাপকের শরীরও ওই প্রতিবস্তু পেয়ে যায়। এটা সম্ভব হতে পারে, রোগে ভুগে কেউ সেরে উঠেছে, এমন কারো রক্তরস, যার অনাক্রম্যতা নেই এমন কারো দেহে সেই রক্তরস দিয়ে। অথবা এই বস্তু ইন্‌জেকশান দেয়া হয়েছে এমন ঘোড়া বা অন্য প্রাণীর রক্তরস ইন্‌জেকশান দিয়ে। এই অনাক্রম্যতাকে পরোক্ষ বলে। ঐ প্রতিবস্তু কোষবদ্ধ।

প্রত্যক্ষ অনাক্রম্যতা

স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ অনাক্রম্যতা ঃ এটা অর্জিত হয় বিশেষ রোগে ভুগে সেরে উঠল। তখন রক্তে বিশিষ্ট প্রতিবস্তু দেখা দেয়। রোগ কখনো কখনো এত মৃদু হতে পারে যে, ভুগলাম বলে মনেও না হতে পারে। টিউবারকুলোসিস বা পোলিওমাইলাইটিসেও ঐ ধরনের অনাক্রম্যতা অর্জিত হতে পারে। এর ফলে একটা বড় মড়ক সামলে গিয়ে সে দেশের বহু লোক বেঁচে যেতে পারে, রোগে খুব না ভুগেই।

অর্জিত কার্যকর অনাক্রম্যতা ঃ যদি ভ্যাকসিন বা টক্সয়েড ইঞ্জেকশান দেয়া হয়, তাতে কার্যকর অনাক্রম্যতা জন্মাতে পারে। আর এ অনাক্রম্যতা যে অর্জিত, তা বোঝা যায়, কারণ এর ইমিউনোগ্লোবিউলিন প্রাণীকে নিজ দেহে তৈরি করে নিতে হয়।

অপরোক্ষ অনাক্রম্যতা ঃ ইমিউনোগ্লোবিউলিন স্থানান্তরণের সাহায্যে ঃ স্বাভাবিক ও কৃত্রিম দুভাবেই এটা সম্ভব।

স্বাভাবিক অপরোক্ষ অনাক্রম্যতা ঃ জন্মের সময়ে প্রতিবস্তু সৃজনের ক্ষমতা শরীরের থাকে না। তবু দেখা যায় তখনও শরীরে প্রচুর গামা-গ্লোবিউলিন রয়েছে। এগুলি মার কাছ থেকে পাওয়া। গর্বাবস্থায় গর্ভ-ফুলের যে রক্ত চলাচল, তারই মাধ্যমে ভ্রূণ এ গামা-গ্লোবিউলিন লাভ করে। জন্মের পরে মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমে শিশুদেহে স্থানান্তরিত হয় মাতৃস্তন থেকে। আবার গিনিপিগ ও খরগোসের ক্ষেত্রে গর্ভফুলের বদলে জরায়ুর রক্ত-চলাচলের মধ্যে দিয়ে তা ভ্রূণশরীরে প্রবেশ করে। কিন্তু ঘোড়া গরু ইত্যাদি জন্তুতে মাত্র স্তন্যদুগ্ধেই গামা-গ্লোবিউলিন স্থানান্তরণ ঘটে।

I_gG ইমিউনোগ্লোবিউলিন যত সহজে স্থানান্তরিত হতে পারে I_gA, I_gM, I_gE-র পক্ষে এটা অত সহজ নয়। এ ইমিউনোগ্লোবিউলিনগুলি কোন কোন রোগে রক্ষা বা অনাক্রম্যতা কোনটিই দিতে পারে না। ভ্রূণের শরীরে প্রতিবস্তু নষ্ট, বড়দের শরীরের মত অতটা সহজে হয় না।

কোষ স্থানান্তরণে লব্ধ অপরোক্ষ অনাক্রম্যতা ঃ প্রতিরোধক টীকা দেয়া প্রাণীর লসিকাগ্রন্থীর কোষ যদি অন্য প্রাণীর শরীরে স্থানান্তরিত করা হয়, আর যদি সেই প্রাণীকে ওই কোষ সহ্য করানো যায়—এটা সম্ভব দেহে রঞ্জন-রশ্মি প্রয়োগ বা অনুরূপ কিছু করে—তাহলে ওই প্রাণী যে প্রতিরোধ ক্ষমতা, স্থানান্তরিত হয়েছে, তার অধিকারী হয়।

আমরা আলোচনা করেছি যে, বীজাণুদের, তাদের বিষক্রিয়া অনুযায়ী দুভাগে ভাগ করা যায়। এই বিষ (বা toxin)-কে অন্তর্বিষ (endotoxin) বা বহির্বিষ (exotoxin) বলে। এই দু ধরনের বিষের বিভিন্নতা নিম্নের সারণিতে দেয়া হল।

বিষের বিশেষত্ব	বহির্বিষ	অন্তর্বিষ
বিমুক্তি (কিভাবে বার হয়)	প্রচুর, যেখানে চাষ হয় সে মাধ্যমে বার হয়ে আসে।	বীজাণুদেহ বিনষ্ট হলে ঃ অল্প পরিমাণে বার হয়।
গঠন	প্রোটিন জাতীয় (সরলতর)	জটিল মিশ্রণে, প্রোটিন চর্বি শর্করা ইত্যাদি থাকে।
মারক মাত্রা	অল্প, কাজও নির্দিষ্ট রূপের।	বেশী, কাজে অনির্দিষ্টতা।
উত্তাপ সহন	উত্তাপ সহ্য হয় না।	উত্তাপসহ।
কত প্রজাতী	বিভিন্ন প্রজাতীর এক বিষ।	প্রতি প্রজাতির বিশিষ্ট বিষ।
প্রতিবস্তু সৃজন ক্ষমতা	যথেষ্ট।	অপেক্ষাকৃত অল্প।
প্রতিবস্তুর রূপ	প্রতিবিষ প্রতিবস্তু।	বিভিন্ন ধরনের, কিছু প্রতিবীজাণু কিছু ভিন্নতর প্রতিবস্তু।

বিষের বিশেষত্ব	বহির্বিষ	অন্তর্বিষ
রোগে প্রতিবস্তুর ভূমিকা	ভাল রক্ষাকর্তার ভূমিকা নেয়।	বিভিন্নতা আছে, কিছুতে রক্ষা ভালই পাওয়া যায়, কিছুতে নয়।
বস্তু-প্রতিবস্তু মিলন	এর প্রকৃতি সরল। দেখায় তলানি জমার মত।	জটিলতা আছে। নানা-রূপে দেখা দেয়, যেমন ছানা কাটার মত, তলানি জমা, কমপ্লিমেণ্ট সংযুক্তি ইত্যাদি।

বীজাণু, অথবা বীজাণুর বহির্বিষ বা অন্তর্বিষ এর প্রত্যেকটির বিরুদ্ধেই বিশিষ্ট প্রতিবস্তু দেহ তৈরি করতে পারে। কোন্‌টি কতটা মারাত্মক, আত্ম-রক্ষার খাতিরে, ঠিক তাই বুঝে বিশেষ প্রতিবস্তু তৈরি হয়ে থাকে। কাজেই অনাক্রম্যতাকেও সেই অনুযায়ী ভাগ করে বোঝার চেষ্টা করতে হয়।

প্রতিবিষ অনাক্রম্যতা

অনেক বীজাণুই খুব শক্তিশালী বহির্বিষ নিঃসরণ করতে পারে। এ বিষও আবার প্রতিবস্তু অর্থাৎ প্রতিবিষ সৃজন করতে সক্ষম। প্রতিবিষ বিষকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। দেহে প্রতিবিষ থাকলে, বিষ প্রভাবিত পরতে পারে, এমন দেহাংশে পৌছনোর আগেই তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এ প্রতিবস্তু I_gG গঠিত।

ডিপথিরিয়া এমন এক বীজাণু, যা যেখানে আক্রমণ করে, সেখানে স্থানীয়-ভাবে তো বটেই, এমন কি রক্তস্রোতের মাধ্যমে, আক্রান্ত জায়গার অনেক দূরের দেহাংশেও ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু আক্রান্তের শরীরে প্রতিবস্তু থাকলে, কোন ক্ষতিই হতে পারে না।

তাই অনেক সময় দেখা যায়, হয়ত কারো গলায় মারাত্মক বীজাণু বাস করছে, তবু এই আশ্রয়দাতার কোন ক্ষতিই হচ্ছে না। তার কারণ এই ব্যক্তির শরীরে উক্ত বীজাণুর বহির্বিষের প্রতিবিষ রয়েছে। অবশ্য শুধু প্রতিবিষই নয়. কিছু পরিমাণে প্রতিবীজাণু প্রতিবস্তুও থাকে। দুটিই

একসঙ্গে কাজ করে ক্ষতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। পরিমাণ সাযুষ্যে বীজাণু ও প্রতিবস্তুর সহাবস্থান সম্ভব হয়।

দেহে ডিপথিরিয়া প্রতিবস্তুর উপস্থিতি জানার পরীক্ষা ভিয়েনার বেলা শিক (Bella Sich) আবিষ্কার করেন। এ পরীক্ষা তাই তাঁর নামাঙ্কিত। এ পরীক্ষায় ওই বিষের সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ (যা 1 : 1000 একক প্রতিবিষের নিরোধ করতে সক্ষম) চর্মতলে ইঞ্জেকশান দেয়া হয়। শরীরে প্রতিবস্ত না থাকলে, ওই ব্যক্তির ইঞ্জেকশান দেয়া জায়গায় প্রদাহস্ফীতি দেখা দেয়। একই যোগচিহ্নত ফল বলা হয়। না হলে ফল বিয়োগচিহ্নিত। যোগাত্মক ফলের অর্থ হল যে পরীক্ষিতের দেহে ওই বীজাণু-বিরোধী প্রতিবস্তু নেই।

যদি শিক পরীক্ষায় বিয়োগচিহ্নিত শিশুর ডিপথিরিয়ার আক্রমণ ঘটে, তাহলে সে আক্রমণ মারাত্মক হয় না।

টক্সয়েড ইঞ্জেকশান দিলে সক্রিয় অনাক্রম্যতা সৃজন করা সম্ভব। ফটকিরি দেয়া টক্সয়েড (Alum precipitated Toxoid. A. P. T.) একরকম ভ্যাকসিন বিশেষ। এ দিতে হয় ভাগ করে দুবারে।

ডিপথিরিয়া আরোগ্যের সুনির্দিষ্ট ওষুধ ছিল না বলে, ঘোড়াকে ইঞ্জেকশান দিয়ে তৈরি ডিপথিরিয়া প্রতিবস্তু আছে যে রক্তরস বা সিরামে, তাই রোগীকে দেয়া হত আরোগ্যের জন্য।

শিক টেষ্ট বা পরীক্ষার কথা আলোচনা হয়েছে। স্ট্রেপটোকক্কাস পায়োজেনিস স্কারলেট ফিভার বলে যে জ্বরব্যাধির স্রষ্টা, তার ঠিক অনুরূপ পরীক্ষাকে বলে ডিক টেষ্ট।

টিটেনাস : এই বীজাণুর আক্রমণ ক্ষমতা খুব বেশী নয়। কিন্তু এই বীজাণুর যে শক্তিশালী বহির্বিষ আছে তা স্নায়ুতন্ত্রীর সামনের কোষকে (anterior horn cell) প্রভাবিত করে। একবার এ কোষের ভিতরে গেলে, তারপর আর বহির্বিষ প্রতিবস্তুতে কোন কাজ হয় না। এজন্য এ রোগেও প্রতিবস্তু প্রয়োগ করতে হয় খুব দ্রুততার সঙ্গে। ঘোড়ার শরীরে এ প্রতিবস্তু তৈরি করা যায়। মানুষের দেহের প্রতিবস্তুও ব্যবহৃত হতে পারে।

ফর্ম্যালডিহাইড প্রয়োগে এই বিষ বা টক্সিন টক্সয়েডে পরিণত হয়। তখন, তা প্রতিরোধ বা চিকিৎসা উভয় কাজেই প্রযুক্ত হয়।

ক্লসট্রিডিয়াম ওয়েলসাই নামে যে বীজাণু আছে, তা গ্যাস গ্যাংগ্রিন বলে

এক মারাত্মক ব্যাধির জনক। এ বিষও স্নায়ুর মারাত্মক ক্ষতি বিধায়ক। খুব তাড়াতাড়ি এ্যান্টিটক্সিন প্রয়োগ করলে এই ক্ষতি নিবারণ করা সম্ভব।

ক্লসট্রিডিয়াম গোষ্ঠীরই ক্লসট্রিডিয়া বটুলিনাম আর ধরনের ওই জাতের বীজাণু। বিশেষ বীজাণু কোন্ জাতের, তা না জানলে, সাধারণ প্রতিরক্তরস বা এ্যান্টিসিরাম ব্যবহার করা হয়।

প্রতিবিষ অনাক্রম্যতার মূলকথা

(1) রক্তে সঞ্চালিত যে অনাক্রম্যতা দায়ক গ্লোবিউলিন অর্থাৎ ইমিউনোগ্লোবিউলিন, তাকে এ্যান্টিটক্সিন প্রতিবিষ বলে।

(2) রক্তে কতটা প্রতিবস্তু আছে, তার মাপ থেকেই অনাক্রম্যতার পরিমাপ পাওয়া যায়।

(3) বিষ-প্রতিবিষের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি সরল।

(4) টক্সয়েড দিয়ে টীকা দিলে, তার দেয়া আক্রম্যতা বিশ্বাসযোগ্য।

(5) অপ্রত্যক্ষ অনাক্রম্যতা, যা এ্যান্টিসিরাম জাত, তা সুরুতে দিলে, রোগ চিকিৎসায় সাহায্য হয়।

বীজাণু-বিরোধী অনাক্রম্যতা

বীজাণু-বিরোধী অনাক্রম্যতার জটিলতা অনেক বেশী। এর কারণও সহজে বোঝা যায়। অবশ্য বীজাণুর ভিতরে অন্তর্বিষ ও বাইরে বহির্বিষ তৈরি হয় বটে, তবু বীজাণুবিরোধী প্রতিবস্তু তৈরিতে, এ ছাড়াও বীজাণু দেহের অন্য অংশেরও প্রতিবস্তুর প্রয়োজন। এইজন্য এই প্রতিবস্তু I_gM ও I_gG ধরনের।

আক্রমণকারী বীজাণুর দেহের গঠন

বীজাণুরা এককোষী জীবন্ত প্রাণী। দেহ প্রোটিন, শর্করা ও চর্বি জাতের বস্তু দিয়ে তৈরি। এই দিক থেকে, এদের গঠন এক কথায় বলা যায় মোজেক গঠনের। আক্রমণ করার ক্ষমতাটা কোষের বহিরাংশের উপর নির্ভর করে। নিমোকক্কাসের ঘেরাটোপে যে শর্করাজাতীয় উপাদান থাকে, তার কথা ভাবলেই এর প্রমাণ মেলে। টাইফয়েড বীজাণুতে দেখা যায়, তার বহির্শরীরের অর্থাৎ O চিহ্নিত অংশই মারাত্মক। আবার কোন

মারাত্মক বীজাণুর বাহির শরীরে, এই মারাত্মকতা সূচক Vi বস্তু একটি বিশেষ জায়গায় থাকে।

বাহির শরীরে এই ধরনের বস্তু যে মাধ্যমে বীজাণুর চাষ করা হচ্ছে, সেখান থেকেও বীজাণুকে নিতে দেখা যায়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দেখা যায় যে ভাইরাসও এ ধরনের কাজ করে থাকে। ভাইরাস যে দেহ আক্রমণ করে সেখান থেকেও অনুরূপভাবে আশ্রয়দাতার ক্ষতিকর জিনিস আহরণ করে।

একই বীজাণু প্রজাতীতে, তাদের গঠনে যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা যায়। এর ফলে তাদের মারাত্মকতারও তারতম্য ঘটে। কঠিন বস্তুকে মাধ্যম করে বীজাণুর চাষ করলে, সেই মাধ্যমে তাদের কলোনির চেহারার ভিন্নতা লক্ষ্য করে, কোন্ কলোনির বীজাণু কতটা মারাত্মক, তাও বোঝা যায়। যেমন, যে বীজাণুর কলোনি মসৃণ, তা মারাত্মক ও খসখসে কলোনির বীজাণু নিরীহতর হয়। এর একটি কারণ হল, খসখসে কলোনিতে বীজাণুগাত্রের বস্তুর অবলোপ। নিমোকক্কাস বীজাণুচাষে যে এটা হয়, এ কথা বহুদিন থেকেই জানা।

বীজাণুর মধ্যে অল্প কয়েকটি বস্তু থাকে, যে বস্তুর উপরে তা কতটা মারাত্মক বা তার আক্রমণ সুদূরপ্রসারী হবে কি না, সেটা নির্ভর করে। আক্রমণের পর প্রতিবস্তু নিরূপণও রোগ পরীক্ষার পন্থা হয়ে উঠতে পারে। টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড রোগে, এই ধরনের পরীক্ষা, যাকে ভিডাল (Widal) পরীক্ষা বলে, তা রোগনির্ণয় ও রোগের বিরুদ্ধে শরীর কতটা প্রতিরোধে সক্ষম হয়ে উঠছে, তা বোঝা যায়। রক্তরস কতটা পাতলা করে ভিডাল পরীক্ষায় ফল দেখা যাচ্ছে, তা নির্ধারণ করে রোগীর প্রতিরোধ বাড়ছে কি না সেটা বোঝা যায়।

শরীরে বীজাণু ধ্বংস করার উপায় দুটি। হয় শরীর কোষ তাদের খেয়ে ফেলে, আর তা না হলে শরীর রসে তাদের মৃত্যু ঘটে। খেয়ে ফেলাকে অপসোনিন সহজ করে। বীজাণু কোন জায়গায়, যেমন লোহিতকণিকার গায়ে লেগে থাকলে, শ্বেতকণিকা বা ম্যাক্রোফাজের পক্ষে ওই বীজাণুকে খেয়ে ফেলা সহজতর হয়।

বীজাণু-বিরোধী অনাক্রম্যতা

নিমোকক্কাসের ক্ষেত্রেঃ এই বীজাণুকুলের অন্তর্বিষ বা বহির্বিষ জাতীয় কোন বিষ নেই। এর মারাত্মক দিকটা নির্ভর করে শর্করা জাতীয় জিনিস যা এদের শরীরের বহিরাংশে, তার উপর। এই বস্তুটিকে SSS Specific Soluble Substance বলা হয়। এই বস্তু অগ্রাসী কোষগুলিকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। এইভাবেই তা মারাত্মক হয়। এই জন্য নিমোকক্কাসের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা অর্জিত হতে পারে রোগে ভুগে, অথবা ওই শর্করার টীকার মাধ্যমে। নিমোকক্কাসের প্রতিবস্তুর ধরন কতকটা অপসোনিনের মত। তবে আজকাল সালফা ও এ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পরে এই বীজাণুকে আর মারাত্মক ভাবা হয় না।

স্ট্রেপটোকক্কাস আক্রমণেঃ এই বীজাণুর আক্রমণ কতটা মারাত্মক হবে সেটা নির্ভর করে বীজাণু শরীরের বাইরের দিকে যে M-প্রোটিন আছে, তার উপর নির্ভর করে। নিমোকক্কাসে যে SSS থাকে, তার কাজের মতই M-প্রোটিনের কাজ। অন্য কোষের আগ্রাসনকে বাধা দেয়া। এ বীজাণুর প্রতিবস্তুর রক্ষা করার ক্ষমতাও যথেষ্ট। এ বীজাণু অনুঘটক জাতীয় অনেক-গুলি বিষাক্ত বস্তুর জনক। এগুলির নাম হল, হিমোলাইসিন, হায়ালু-রোনিডেজ, ষ্ট্রেপটোকাইনেজ ইত্যাদি। এগুলিরও প্রতিবস্তু সম্ভব। তবে তা বীজাণুর আক্রমণকে প্রতিহত করে না। এ বীজাণুর রকমফের বড় বেশী বলে প্রকৃষ্ট অনাক্রম্যতা সৃজক কোন টীকা সম্ভব হয়নি।

ষ্টাফাইলোকক্কাসঃ এ বীজাণু বহুনিউক্লিয়াস যুক্তরক্তের শ্বেতকণিকা গ্রাস করে ফেলে। আবার এর ভিতরে আছে, লিউকোসিডিন নামে এক রকমের বিষ, যা শ্বেতকণিকাগুলিকেও নষ্ট করে ফেলে।

টাইফয়েডঃ এই রোগের বীজাণু কোষের আগ্রাসন প্রক্রিয়াতে যেমন ধ্বংস হয়, তেমনি শরীর রসের জারনেও জারিত হয়। এ বীজাণুর টীকা দিলে, প্রতিবস্তু অপসোনিন ও কম্লিমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনাক্রম্যতা দেয়। ফিনোল, অর্থাৎ কার্বলিক এ্যাসিডে রক্ষিত বীজাণুর H ও O-র প্রতিবস্তুর রক্ষাক্ষমতা প্রচুর। তবে এ্যাসিটোনে হত বীজাণু দিয়ে তৈরি তথাকথিত AKD টীকা আরো কার্যকর। বিশ্বযুদ্ধের আমলে বীজাণু দেহজাত Vi বস্তুজাত টীকার যে চল হয়েছিল, তা এখন বিস্মৃতপ্রায়। তবে এর

ব্যবহার রয়েছে স্যালমোনেলা বীজাণু (টাইফয়েড এই জাতের) চেনার ব্যাপারে।

হুপিং কাশি ঃ মসৃণ কলোনির বীজাণু দিয়ে তৈরি হুপিং কাশির টীকায় অনাক্রম্যতা সৃজনক্ষমতা ভালই থাকে।

টিউবারকুলিসিস ঃ টিউবারকুলোসিসে অনাক্রম্যতার ব্যাপারটা জটিল। বিভিন্ন ধরনের, যেমন এ্যাগ্লুটিনিন, প্রেসিপিটিন, ইত্যাদি ধরনের প্রতিবস্তু দেখানো গেছে, তবে এতে অনাক্রম্যতা বা রক্ষার সাহায্য খুব একটা হয় না। তথাকথিত মাণ্টু পরীক্ষায়, টিউবারকুলার প্রোটিনে কে কতটা সংবেদনশীল সেটা বোঝা যায়। সংবেদনশীলতা অনাক্রম্যতারও নিরূপক, এ কথা মনে করা হলেও তা পুরোপুরি ঠিক নয়। মনুষ্যদেহের বীজাণু—BCG যার নাম, সে বীজাণু হল জখম করে নেয়া শক্তিহীন বীজাণু। এ টীকার ব্যবহার হয়েছে প্রচুর। কতখানি রক্ষাক্ষমতা, তার সঠিক পরিমাপ হয়নি।

ভাইরাস সংক্রমণে ঃ শরীরের থেকে নিস্রাবিত বিভিন্ন রসে, যে রসে থাকে I_gA প্রতিবস্তু, সেই প্রতিবস্তু মিউসিন যেখান থেকে বার হয়, সেইখানে থাকে। এই প্রতিবস্তু প্রাথমিক রক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

শরীর রসে বীজাণু নিরোধক ঃ শরীর রসে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে এ্যাগ্লুটিনিন জাতীয় প্রতিবস্তু বীজাণুদের এ জায়গায় জড় করে ফেলে, তাতে বীজাণুদের ধ্বংস করা খাদক কোষেদের পক্ষে সহজ হয়।

প্রতিবস্তু অবশ্যই রোগ-প্রতিরোধ ও অনাক্রম্যতার নির্দেশক, তবু পরীক্ষাগারে যতটা প্রতিবস্তুর উপস্থিতি দেখানো যায়, আরক্ষা ঠিক ততটা হয় না। আবার এর উল্টোটাও দেখা যায়। অর্থাৎ পরীক্ষণীয় প্রতিবস্তু কম, তবু অনাক্রম্যতা বা আরক্ষার ক্ষমতা বেশী থাকতে দেখা যায়।

I_gA ইমিউনোগ্লোবিউলিন ঃ নাসিকা, লালাগ্রন্থী, খাদ্যনালি এসব জায়গায় মিউসিনের সঙ্গে এই প্রতিবস্তু দেখা যায়। দেখা গেছে পোলিও ভাইরাসে টীকা দিলে এই প্রতিবস্তু দেখা দেয়।

রোগ নির্ণয়ে প্রতিবস্তু ঃ তথাকথিত ভাসারম্যান বা কান পরীক্ষা করে সিফিলিস রোগ নির্ণয় করা হয়। টাইফয়েডে অনুরূপভাবে ভিডাল পরীক্ষায় রোগনির্ণয়ে সাহায্য হয়। এই রোগে প্রতি সপ্তাহে টিটার

(titre) (কতটা তরল করলেও লক্ষণীয়) বাড়তে থাকে (দ্বিতীয় সপ্তাহের পর)। তবে এ পরীক্ষা ত্রুটিহীন নয়।

কোষ মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত অনাক্রম্যতা : শরীররসে বীজাণু-বিরোধী প্রতিবস্তুর মাধ্যমে অনাক্রম্যতা ও রোগ-প্রতিরোধ অনেকখানি হলেও কোষ-মাধ্যমে প্রাপ্ত অনাক্রম্যতা একটা বড় ব্যাপার। দেখা গেছে সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট কোষ থেকে ইন্টারফেরণ, লিম্ফোটক্সিন ইত্যাদি বস্তু বার হয়ে আসে। এদের ও ম্যাক্রোফাজের এজন্য অনাক্রম্যতার ব্যাপারে বেশ হাত আছে।

কিছু কিছু বীজাণুর ক্ষেত্রে, কোষমাধ্যমে প্রাপ্ত অনাক্রম্যতাই লক্ষণীয়। এই ধরনের অনাক্রম্যতা যেখানে একেবারেই নেই সেই অবস্থাকে এ্যানারজি বলে (anergy)। এ অবস্থায় আক্রম্যতাও বেড়ে গিয়ে থাকাও সম্ভব হয়।

বীজাণু, ভাইরাসের বিরুদ্ধে কৃত্রিম বা উপলব্ধ অনাক্রম্যতা : যে বীজাণু টক্সিন বা বিষের মাধ্যমে আক্রমণ সৃষ্টি না করে, নিজেরাই আক্রমণকারী, তাদের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা সৃজন অপেক্ষাকৃত দুঃসাধ্য। এর কারণ প্রধানতঃ দুটি :

(1) বীজাণুর কোন বিশেষ বস্তুটি যে তাকে মারাত্মক করে, তাই অনেক ক্ষেত্রেই জানা নেই। কাজেই প্রতিবস্তু আর কোন বস্তুর বিরুদ্ধে করা হবে?

(2) প্রতিরক্ষার অনেকখানিই কোষমাধ্যমে সঞ্জাত। তাই রোগের আক্রমণ না ঘটলে, অনাক্রম্যতা দুরূহ।

এইজন্যই বিষ বা প্রতিবিষের উপরও বীজাণুদেহের, বিশেষ করে বীজাণু-দেহের বহিরাংশের বস্তুর প্রতিবস্তুর উপস্থিতিও অনাক্রম্যতায় প্রয়োজন। অনেক রোগে তাই মৃত বীজাণুর চেয়ে নির্জীব করা বীজাণুতে অনাক্রম্যতা হয় বেশী।

বীজাণু-বিরোধী অনাক্রম্যতার মূলকথা

(1) বীজাণু যেমন বহুবিধ, তেমনি তাদের মারাত্মকতা ও বস্তুরূপ ভিন্ন।

(2) সব বস্তুনিচয় একসঙ্গে করে প্রতিবস্তু তৈরি করা যায় না বলে সত্যিকার শক্তিশালী ভ্যাকসিন তৈরি করা শক্ত।

(3) বীজাণু-বিরোধী অনাক্রম্যতার মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ বীজাণুর পূর্ণ শরীরের প্রতিবস্তু।

(4) জীবাণুর বৈচিত্র্য এত রকমের যে, পূর্ণ অনাক্রম্যতা তাই দুরূহ।

(5) পরীক্ষাগারে বহুরকম প্রতিবস্তুই দেখানো যায়। কিন্তু শরীরে ততখানি অনাক্রম্যতা থাকে না।

(6) প্রতিবস্তুকে বীজাণু আক্রমণের নির্দেশনামা হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

(7) I_gA-র দেয়া স্থানীয় (কলাবিশেষে) অনাক্রম্যতা অনেক রোগেই দেখা যায়।

(8) কৃত্রিম বা সৃষ্ট অনাক্রম্যতার মধ্যে অনেকখানিই কোষ সঞ্জাত।

সৃষ্ট অনাক্রম্যতা ঃ প্রতিরক্তরস বা এ্যান্টিসিরাম প্রয়োগ করে, পরোক্ষ অনাক্রম্যতা সৃজন করা যেতে পারে। আর প্রত্যক্ষভাবে তা সৃজন করার জন্য বিভিন্ন টীকা অথবা টক্সয়েড।

টক্সয়েড ঃ বীজাণুর শরীরে যে বহির্বিষ থাকে, তার বিষাক্ততা একটা কিছু প্রয়োগ করে, অথচ তার ভিতরের বস্তুর (এ্যান্টিজেন) পরিবর্তন না ঘটিয়েই এটিকে তৈরি করা হয়। ফর্মালডিহাইডের মত কিছু প্রয়োগ করে এ করা যায়। ডিপথিরিয়া ও টিটেনাসে টক্সয়েড ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

টীকা বা ভ্যাকসিন ঃ হল জীবন্ত অথবা মৃত বীজাণুদেহ কোন তরল বস্তুতে রাখা। তাই প্রাণীর শরীরে ইঞ্জেকশান করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এর উদাহরণ কম নয়। BCG, বসন্ত, পোলিওমাইলাইটিস—এগুলি হল জীবন্ত বীজাণুর টীকা। আর টাইফয়েড, হুপিং কাশির, পোলিওর মৌখিক স্যাবিনের টীকা, এগুলি হল মৃত বীজাণু দিয়ে তৈরি টীকা।

জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ অনাক্রম্যতায় সুরক্ষিত করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। জীবন্ত বীজাণু দিয়ে তৈরি ভ্যাকসিনের একটি মাত্র প্রয়োগ, বা একটি খোরাকই যথেষ্ট হয়। এর কারণ সেই বীজাণু শরীরে বংশবৃদ্ধি করে নিতে পারে। এর ফলে কোষজাত অনাক্রম্যতাও জন্মায়। কিন্তু মৃত বীজাণু ব্যবহার করলে, দুই বা তিন ডোজ ভ্যাকসিন, কয়েকদিন পর পর দেবার দরকার হয়।

অনাক্রম্যতা জাগিয়ে রাখা ঃ মাঝে মাঝে অনাক্রম্যতা জাগিয়ে

রাখার উপযুক্ত উত্তেজক (Booster) ব্যবহার করতে বলা হয়। সব টীকাকেই সহজ ও যাকে দিতে হচ্ছে তার কষ্ট যাতে না হয় সেটা দেখা হয়।

পরোক্ষ টীকায় উপসর্গ

অন্য বীজাণুর আক্রমণ : অবশ্য সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করে ইঞ্জেকশান দিলে, এ সমস্যা এড়ানো সম্ভব।

ইঞ্জেকশান যেখানে দেয়া হল, সেখানে প্রদাহস্ফীতি খুব মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করা, কি জ্বর, এ সবও টাইফয়েড বা অনুরূপ ভ্যাকসিনে সম্ভব।

পোলিওর যে টীকায় ফটকিরি আছে, তা ব্যবহারে কোন ক্ষেত্রে পোলিও হতেও দেখা গেছে।

প্রতিবস্তু আছে এমন সিরাম বা রক্তরস প্রয়োগের ফলে, অতি সংবেদনশীলতা জনিত মারাত্মক শারীরিক অসুস্থতা, এমন কি মৃত্যুও হতে পারে।

স্নায়বিক ফলাফল হিসাবে মস্তিষ্ক বা তার ঝিল্লীর প্রদাহ হতে পারে।

মানুষের সিরাম বা রক্তরস যদি ব্যবহার করা হয়, তাতে ভাইরাসজাত যকৃতের প্রদাহ হতে পারে। তাছাড়া তাৎক্ষণিক পরে হয় এমন অতি-সংবেদনশীলতা দেখা দিতে পারে।

জীবন্ত ভ্যাকসিনে, রোগ ছড়ানোর সমস্যা আছে। তাছাড়া স্নায়ু ঝিল্লির প্রদাহ সম্ভব।

টক্সয়েড জাতীয় ভ্যাকসিনে অতিসংবেদনশীলতা একটি উপসর্গ হতে পারে।

অনাক্রম্যতায় স্বল্পতা ও তার আনুষঙ্গিক ব্যাধি

বার বার ছেলেটির নিমোনিয়ার আক্রমণ হচ্ছে দেখে 1952 সালে ব্রুটন তার রক্তে দেখলেন গামা-গ্লোবিউলিন খুবই কম। এর কারণ কি, বুঝতে গিয়ে মনে করা হল যে, থাইমাসই কোষগত অনাক্রম্যতার জন্য দায়ী।

গামা-গ্লোবিউলিনহীনতা : বলে একটি শব্দও তৈরি হল। এতে বোঝায় গামাগ্লোবিউলিন খুবই কম থাকার নানা রোগে ভোগা।

জন্মগত গামা-গ্লোবিউলিনহীনতা

জিনসংক্রান্ত এই ক্রটির উল্লেখ সর্বপ্রথম করেছিলেন ক্রটন। পুরুষই এ ক্রটিতে ভোগে। শৈশবে জন্মসূত্রে মার কাছ থেকে পাওয়া যত ইমিউনো-গ্লোবিউলিন শেষ হয়ে যাবার পর এ রোগ দেখা যায়, বছর ছয়েক বয়স থেকে। এদের শরীরে প্লাজমা কোষ দেখা যায় না। শরীরের বিভিন্ন জায়গার লিম্ফগ্রন্থি টনসিল, এ্যাপেনডিক্স ইত্যাদি যেন শুকিয়ে যেতে থাকে। তবে থাইমাস ও তার মাধ্যমে কোষজনিত অনাক্রম্যতা কিছুটা থাকে। আশ্চর্য এই যে, এদের গামা-গ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশান দিলে, তার বিরোধী প্রতিবস্তুও শরীরে তৈরি হয়ে যায়। গাঁটে গাঁটে প্রদাহ ও ধমনীর প্রদাহ এদের দেখা যায়। একটু বড় বয়সেই এ ধরনের ক্রটি দেখা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে মনে করা হয় যে জিনগত ক্রটিই এর জন্য দায়ী, যেটা পরি-লক্ষিত হতে একটু সময় লেগেছে। আবার আর এক ধরনের ক্রটি দেখা যায়, যাতে I_gG ও I_gA কম থাকে, কি I_gM বেশী থাকে। এই লোকেরা বিভিন্ন এ্যালার্জি আত্মকলা-সংবেদনশীলতার (autoimmune disorder) রোগে ভোগে।

টেলেনজিয়েকটেটিক এ্যাটেক্সিয়া ঃ সেরিবেলামে উদ্ভূত চলৎশক্তির ক্রটি, এই সঙ্গে ফুসফুসে বিভিন্ন রোগাক্রম, ইত্যাদি ক্রটি নিয়ে এই রোগীদের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। A ও E ধরনের ইমিউনোগ্লোবিউলিন এদের কম থাকে। এদের লিম্ফোমা বা অনুরূপ ক্যানসারও হতে দেখা যায়।

ইমিনোগ্লোবিউলিন ঘাটতি রোগে চিকিৎসা ঃ বিভিন্ন প্রতিবস্তু ধনীভূত অবস্থায় দিয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া গেছে। আর ক্রটিটা কোষজাত অনাক্রম্যতার হলে, থাইমাস অথবা অস্থিমজ্জার কোষ শরীরে সঞ্চার করেও কিছু উপকার পাওয়া যায়।

হজকিন-ডিজিজের মত লিম্ফকোষের ক্যানসারে, অনাক্রম্যতা সৃজক ইমিউনোগ্লোবিউলিনের অভাব হতে দেখা যায়।

কোন কোন ওষুধে, যেমন কর্টিজোন কি রঞ্জন-রশ্মি প্রয়োগেও অনা-ক্রম্যতার ঘাটতি দেখা যায়।

13 অতিসংবেদনশীলতা

অতিসংবেদনশীলতা বলতে বোঝায়, এমন অবস্থা, যাতে যখনই কোন বস্তু বা হ্যাপটেন শরীরের সংস্পর্শে আসছে, তখনই শরীর, তার মারাত্মক বিরোধিতা করছে। বিষয়টা পরিপূর্ণভাবে এখনও বোঝা যায়নি। সংবেদনশীলতা, বললে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া (hypersensitivity) বোঝায়। সেই জায়গায় এ্যালার্জি বলতে বোঝায় বিকারগ্রস্ত প্রতিক্রিয়া। মান্টু পরীক্ষা এর উদাহরণ। বীজাণু সম্পর্কিত যে সংবেদনশীলতা, তাকে বীজাণু সম্পর্কিত এ্যালার্জিও বলা হয়। সেদিক থেকে এ দুটির মধ্যে খুব একটা তফাৎ আছে, বলা যায় না। তবে আবার হাঁফানির মত রোগও আছে, যাকে এ্যালার্জিক রোগ বলা হয়।

সংবেদনশীলতাকে আবার তাৎক্ষণিক ও পরবর্তী বা দীর্ঘকালীন (delayed) বলে ভাগ করা হয়।

এগুলিকে আবার টাইপ **I, II, III** ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমটিতে অর্থাৎ তাৎক্ষণিকে I_gE ও পরের টাইপগুলিতে I_gG ও I_gM যথাক্রমে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।

তাৎক্ষণিক সংবেদনশীলতা

কোন বিশেষ খাদ্য, ধূলিকণা, বা বিশেষ ওষুধে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

এ্যানোফাইল্যাকসিস

এই শব্দটি রিসে (Richet) ও পোর্টিয়ার (Portier) ব্যবহার করেন 1902 খ্রীষ্টাব্দে। কুকুরের উপর পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে একরকম সামুদ্রিক প্রাণীর দেহজাত বিষ কুকুরকে দ্বিতীয়বার ইঞ্জেকশান দিলে, প্রথমবারের তুলনায় এবারে খুবই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এমন কি মৃত্যুও হয়। বিষাক্ত খুব নয়, এমন বস্তুতেও এ প্রতিক্রিয়া হতে দেখা যায়। একেই রিশে এ্যানোফাইল্যাকসিস অর্থাৎ অনাক্রম্যতার

বিপরীত এই নাম দেন। এখানে প্রথম ইঞ্জেকশান শরীরটাকে সংবেদনশীল করে তোলে, তার ফলেই পরবর্তি ইঞ্জেকশানে ফলাফল মারাত্মক হয়।

যেহেতু প্রথম ও পরবর্তী ইঞ্জেকশানে, আট দশ দিনের তফাৎ না থাকলে এ্যানোফাইল্যাকসিস হতে দেখা যায় না, তাই মনে করা হয় এর মধ্যেও অনাক্রম্যতার বস্তু-প্রতিবস্তু প্রতিক্রিয়া আছে।

শক ঃ শরীরে হিষ্টামিন প্রয়োগ করলে, যে রকম মারাত্মক অবস্থা হতে দেখা যায়, সেই রকম হতে দেখা যায়, সংবেদনশীল বস্তুর দ্বিতীয়বার প্রয়োগে। শকের অবস্থাটার জন্য প্রয়োজন, ইঞ্জেকশানের মাধ্যমে শক সৃষ্টি করার বস্তুর শরীরে খুব দ্রুত অনুপ্রবেশ। ইঞ্জেকশান শিরার মাধ্যমে দ্রুত হলে, শকটা আরো মারাত্মক হয়। গিনিপিগ, খরগোস, কুকুর, ইঁদুর, মানুষ সকলেই শকে জখম হয়।

মানবদেহে ঃ এ্যানাফাইলেকটিক শকে মানবদেহে হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। সর্বশরীরেই শোথ (oedema) দেখা দিতে পারে। চোখের পাতা ফোলা ও শরীরের ঝোলানো, অর্থাৎ নিম্নবর্তী জায়গায় জল জমা হয়ে ফুলতে দেখা যায়। অনেক সময়ে ঘোড়ার রক্তরস (সিরাম) ইঞ্জেকশান দিলে, এ ধরনের শক হয়। পেনিসিলিন বা অনুরূপ ওষুধ প্রয়োগে বা ইঞ্জেকশানেও শক হতে পারে। রক্তনালিকাগুলির ভেদ্যতা শকে বেড়ে যায়। যকৃতের শিরার মধ্যে দিয়ে রক্তচলাচল না হওয়ায়, রক্তচলাচল ব্যহত হবার জন্য মৃত্যুও হতে পারে।

দেহচর্মে ঃ সংবেদনশীল প্রাণীর দেহচর্মে ক্ষুদ্রতর রক্তনালিকার ভেদ্যতা বেড়ে যাবার জন্য সে জায়গাগুলো ফুলে ফুলে ওঠে। সংবেদনশীলতার পরীক্ষার জন্য কোন বস্তু চর্মের অভ্যন্তরে ইঞ্জেকশান দিয়ে, কতটা ফুললো দেখা হয়। তবে সংবেদনশীলতা ও স্ফীতির এলাকার মধ্যে সোজাসুজি সম্পর্ক নেই।

শক ও এ্যানাফাইল্যাকসিসের কার্যকারণ ঃ বস্তু-প্রতিবস্তু প্রতিক্রিয়াই এর মূলে। প্রতিবস্তুর রূপ কি ও কোন জায়গায় দেখা যাবে তার কাজ, এ নিয়ে ছিল বহু বিতর্ক। এ সম্পর্কে দেখা গেছে যে সংবেদনশীল প্রাণীর শরীরে প্রতিবস্তু থাকে, সেই বস্তুর যাতে সংবেদনশীলতা ঘটেছিল।

স্থূলজড়ের প্রতিক্রিয়া

দেখা গেছে যে গিনিপিগকে পূর্বাহ্নেই সংবেদনশীল করে তোলা হয়েছে কোন বস্তুর ইঞ্জেকশানের মাধ্যমে সেই গিনিপিগের জরায়ুর পেশী ওই বস্তুর সংস্পর্শে এলেই, সে পেশীর প্রবল সংকোচন ঘটে। উপযুক্ত তরল বস্তুর মধ্যে ওই পেশীর সংকোচনের সুনির্দিষ্ট পরিমাপ করে এই পরীক্ষা করা হয়।

সংবেদনশীলতার জন্য সুনির্দিষ্ট কোষ

অতিসংবেদনশীলতা কি বিশেষ কোষকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে আত্মপ্রকাশ করে? এর উত্তর হিসাবে কিন্তু নির্দিষ্ট হয়ে যায়নি কোন কোষ। গিনিপিগ, ইঁদুর, কুকুর ইত্যাদি প্রাণীতে, তথাকথিত মাষ্ট (Mast) কোষ, এর জন্য দায়ী মনে করা হয়। এই কোষ হিষ্টামিন জাতীয় বস্তু ছাড়ে। মানুষের বেলায় বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট শ্বেতকণিকাকে এই কাজের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। আর খরগোসে এর সঙ্গে প্লেটলেটকেও দায়ী করা হয়।

হিষ্টামিন: অতিসংবেদনশীলতা, শক, ইত্যাদি ব্যাপারে, সেই প্রাণীর রক্তে দেখা যায়। আবার হিষ্টামিন-বিরোধী বস্তুর প্রয়োগে এই অবস্থা আয়ত্তে রাখা সম্ভব।

সেরাটোনিন (5-হাইড্রক্সিট্রিপটামিন): বস্তুটিও শকের অবস্থায় কোন কোন প্রাণীর প্লেটলেট ইত্যাদি কোষ থেকে বার হয়ে আসে।

তাছাড়া, যে অনুঘটকগুলি কাইনিনের উত্তেজক হিসাবে কাজ করে, তাও শক, কি সংবেদনশীলতায় দেখা দেয়।

কি ধরনের প্রতিবস্তু এই শক, এ্যানাফাইল্যাকসিস ইত্যাদি ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে, তা ঠিকভাবে এখনো নির্দিষ্ট হয়ে যায়নি। তবে এটুকু জানা গেছে যে, মানুষে এই প্রতিবস্তু উত্তাপসহ নয় ও তা I_gE জাতের ইমিউনোগ্লোবিউলিন। একে রিয়াজিন নামও দেয়া হয়েছে। সাধারণ পরীক্ষায় এ ধরা পড়ে না। বিশেষ রেডিও-ইমিউনোইনহিবিশান জাতীয় জটিল প্রতিরোধ প্রক্রিয়াতেই কেবল ধরা যায়।

মানুষেও যে রকম, পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত প্রাণীদের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবস্তু সৃষ্টি করা ও পরীক্ষা করা সম্ভব। বলা যেতে পারে, যে গামা-1-

গ্লোবিউলিন বেশী হয় গিনিপিগে। গামা-2-গ্লোবিউলিন খরগোসে আর বিয়াজিন আছে, এমন I_gE প্রতিবস্তুর আধিক্য থাকে মানুষের।

এনাফাইল্যাকটিক শক কয়েকটি উপায়ে পরীক্ষামূলকভাবে করা সম্ভব। এগুলি হল ঃ

1. প্রতিবস্তু-বস্তুর মিশ্রণ, যদি শরীরে ইঞ্জেকশান করা হয়। অবশ্য এতে বস্তুর একটু আধিক্য থাকতে হবে।

2. কেওলিন, শ্বেতসার ইত্যাদি সহযোগে, রক্তরসকে যদি দেহের উত্তাপে রাখা হয়, তাহলে কাইনিন, এনাফাইলাটক্সিন, ইত্যাদি বস্তু উৎপাদিত হয়।

3. ফোর্সম্যান প্রতিবস্তু যাকে বলা হয়, তাই অনেক ক্ষেত্রে কোষজাত এ্যানাফাইল্যাকসিসের জন্য দায়ী, এ কথা মনে করা হয়।

5. অনুরূপভাবে, ট্রিপসিন পেপটোন ও কিছু ভারী ধাতব লবণ কাইনিনের মাধ্যমে এ্যানাফাইল্যাকসিসের সূচনা করতে পারে।

ধূলি, খাদ্যবস্তুর সংবেদনা

ধূলি অথবা কোন খাদ্যবস্তু, কিম্বা নাসিকার মধ্যে কোন বস্তু দেহে প্রবেশ করে অতিসংবেদনশীলতার সৃষ্টি করতে পারে। বস্তুটি একটি পূর্ণ বস্তু বা অর্ধবস্তু, অর্থাৎ সংযোগকারী হ্যাপটেন হতে পারে। প্রবেশ নিঃশ্বাসে অথবা অন্য পথে শরীরে প্রবেশ ঘটতে পারে।

এই ধরনের অতিসংবেদনশীলতা, বিশেষ পরিবারে, পারিবারিক বিশেষত্ব হিসাবে দেখা যায়। তবে পরিবারে যদি একজনের হাঁপানি থাকে, অন্য কারো হয়ত দেখা যায়, আমবাত। বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতাটাই শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ। কার দেহ কোন প্রতিক্রিয়া দেখাবে, সেটা ব্যক্তিনির্ভর।

এই বিশেষ ও প্রবল উত্তরাধিকারকে অর্থাৎ যা এই ধরনের প্রতিফলন দেখায়, তাকে বলে এ্যাটপি (atopy)। এর মূলে থাকে বিশেষ ধরনের I_gE তৈরি হওয়া ও কতকগুলি I_gA, I_gG, I_gM, তৈরি না হওয়া। তাই এ্যাটপিকে অনাক্রম্যতার একটি বিশেষ ন্যূনাবস্থাই বোঝায়।

সংবেদনশীলতার অতিক্রমণ

কোন বিশেষ বস্তু, যদি খুব সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ পরিমাণে ইঞ্জেকশান দেয়া হয়, আধঘণ্টা পরে পরে, তার ফলে মারাত্মক এ্যানাফাইল্যাকটিক শক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এর কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, শরীরে যে প্রতিবস্তু রয়েছে, তা ধীরে ধীরে ব্যবহৃত হয়ে যাচ্ছে বলেই তা আর শকের পর্যায়ে যেতে পারছে না। হে-ফিভার, হাঁপানি ইত্যাদি থেকে রক্ষার জন্য অল্প পরিমাণে বস্তু সপ্তাহে সপ্তাহেও ইঞ্জেকশান দিয়ে, সংবেদনশীলতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়। শরীরে উপস্থিত প্রতিবস্তু যেন বস্তুকে পাবার জন্য একটা প্রতি-যোগিতা শুরু করে।

রোগ আক্রমণ

রোগ আক্রমণ হলে, বীজাণু যে বস্তু দেহে আনে, তার প্রতিবস্তু তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়ে, একটা তাৎক্ষণিক সংবেদনশীলতা তৈরি করতে পারে। এর ফলে পরবর্তীকালে সেই বস্তু ইঞ্জেকশান দিলে, প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ক্যাসনি পরীক্ষা অনুরূপ পরীক্ষা। হাইডেটিড অসুখের পরীক্ষায় যার ব্যবহার।

আর্থাস প্রতিক্রিয়া ঃ আর্থাসের নামাঙ্কিত এই প্রতিক্রিয়ায়, কোন বস্তু যদি কোন প্রাণী বা মানুষের দেহে প্রতি সপ্তাহে ইঞ্জেকশান দেয়া হয়, তাহলে, ক্রমে ক্রমে পরবর্তী ইঞ্জেকশানের ফলে, একটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে দেখা যায়। স্থানীয় প্রতিক্রিয়ায়, স্ফীতি ও লাল হয়ে উঠতে দেখা যায়। এক ঘণ্টার মধ্যে, যেখানে ইঞ্জেকশান হয়েছিল, সেখানে স্ফীতি, ব্যথা, ইত্যাদি হতে দেখা যায়। সেই জায়গা ছাড়াও, প্রস্রাবে এ্যালবুমিন, রক্তে শ্বেতকণিকার প্রাচুর্য, এই সব পুরো শরীরের উপসর্গও দেখা দেয়।

আর্থাস উপসর্গে, যে প্রতিবস্তু দেখা যায়, তা I_gG ধরনের ইমিলনো-গ্লোবিউলিন।

রক্তরসজনিত ব্যাধি (Serum Sickness) ঃ তথাকথিত রক্তরসজনিত ব্যাধিতে মাত্র একটি ইঞ্জেকশানেই উপসর্গগুলি হাজির হয়। সাধারণভাবে, ইঞ্জেকশানের পর সাত থেকে চোদ্দ দিনে উপসর্গ দেখা দেয়। এগুলিতে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি ও যেখানে ইঞ্জেকশান হয়েছে, সেখানের প্রদাহ দেখা যায়। কখনো সারা গায়ে আমবাত বার হতেও দেখা যায়। তা ছাড়াও

গাঁটে গাঁটে ব্যথা, চোখের পাতা ফোলা, প্রস্রাবে এ্যালবুমিন ইত্যাদিও দেখা যায়।

পরীক্ষামূলকভাবে, প্রাণীদেহে এ উপসর্গ ঘটানো যায়।

বস্তু-প্রতিবস্তু সংযুক্তি যা তৈরি হল, তা রক্তনালিকার দেয়ালে জমতে দেখা যায়। সেইজন্য মনে করা হয়, আর্থাস প্রতিক্রিয়া ও রক্তরসের ব্যাধি, দুটির কার্যস্থল হল রক্তনালিকাসমূহ।

ঔষধের সংবেদনশীলতা

অনেক ওষুধ প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, সেই ওষুধে রোগী সংবেদনশীল ও সংবেদনশীলতার প্রতিক্রিয়া দেখায়। এটা ওষুধটির বা তার অংশবিশেষের হ্যাপটেন হিসেবে একটি বস্তু হয়ে উঠে, বস্তু-প্রতিবস্তু প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। এর উদাহরণ হল, বিভিন্ন পেনিসিলিন, এ্যাস-পিরিন, প্যারা-এ্যামাইনো-সেলিসিলিক এ্যাসিড ইত্যাদি। এ প্রতিক্রিয়ায় বংশানুক্রম লক্ষণীয়।

এ প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাৎক্ষণিক। এতে ওষুধ ব্যবহারের কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এতে শ্বাসনালীর স্ফীতি, হাঁপানি, রক্তচাপ পড়ে গিয়ে, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

পরে, অর্থাৎ কয়েকদিন বাদে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তার মধ্যে আমবাত বার হওয়া, বিভিন্ন ধরনের চর্মের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কিডনির প্রদাহ, অস্থি সংযোগ স্থলে বেদনা, এ সবও উপসর্গ হিসাবে দেখা দিতে পারে।

আরো পরবর্তীকালে এ্যানিমিয়া, লুপাস এরিথ্রিমেটোসাস ইত্যাদি উপসর্গ বা ব্যাধি দেখা দিতে পারে।

সামান্য পরিমাণ ওষুধ গাত্রচর্মে ইঞ্জেকশান দিয়ে কি প্রতিক্রিয়া হল, তাই লক্ষ্য করে বোঝা যায় সংবেদনশীলতা কতটা। এতে I_gE ও I_gG ধরনের গামাগ্লোবিউলিন জাতীয় প্রতিবস্তু অংশগ্রহণ করে।

তথাকথিত এ্যালার্জিক শ্বাসরোগ

যে সব বস্তু বায়ুচালিত, সেগুলিই ফুসফুসের সংস্পর্শে আসে, এজন্য বহু প্রকারের এ্যালার্জি সৃজক রোগ ফুসফুসে দেখা যায়।

ফুসফুসের এ্যালভিয়োলাস বা বায়ু সঞ্চার পথের প্রদাহ। এই প্রদাহ

ফুসফুসে ছোট ছোট কণিকা ঢুকে হতে পারে। এরা I_gG প্রতিবস্তুকেই উত্তেজিত করে। জ্বর, মাথাব্যাথা, শ্বাসকষ্ট এইসব উপসর্গ দেখা যায়।

হাঁপানির সঙ্গে ইয়োসিনে রঞ্জিত হতে পারে, এইরকম কোষ লিপ্ত। এই ধরনের এ্যালার্জি হলেও I_gG ও I_gG অংশ নেয়।

টিউবারকুলোসিসে প্রায় দশ থেকে চৌদ্দ দিন, রোগের সুপ্তাবস্থার পর, যেখানে ইঞ্জেকশান দেয়া হয়েছে, সেখানে প্রদাহ ও ক্ষত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণীর মৃত্যুও হতে পারে। অবশ্য মৃত্যুর কারণ সারা দেহে ছড়িয়ে পড়া মিলিয়ারি টিউবারকুলোসিস। প্রাণীটি বেঁচে গেলে, যদি পরে আবার টিউবারকুলোসিসের বীজাণু সংস্পর্শে আসে, তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

1. রোগের সুপ্তাবস্থা কমে অল্পদিনের মধ্যে গুপ্ত হয়ে যায়। এই অবস্থাকেই সংবেদনশীল অবস্থা বলে।

2. ক্ষত তাড়াতাড়ি সারে।

3. রোগ ছড়িয়ে যায় না। এ অবস্থাকে অনাক্রম্যতা বা প্রতিরোধের অবস্থা বলে। এসব অবস্থা শুধু জীবন্ত বীজাণুতেই কেবল নয়, মৃত, কি বীজাণু প্রোটিনেও দেখা দেয়। এরই সাহায্য নিয়ে তথাকথিত "মাণ্টু পরীক্ষা" করা হয়।

এ্যালার্জিক চর্ম প্রদাহ

চামড়ায় নানাবিধ এ্যালার্জিক প্রদাহ দেখা যায়। এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা অথবা গাছজাত বস্তু থেকে সুরু করে কোন খণিজ পদার্থ থেকে ধূলি পর্যন্ত বহু রকমের বস্তুই হতে পারে। জন্মগত প্রভাব যে একটা দেখা যায় না, তা নয়। তবে সেটাও ততটা সুদূরপ্রসারী নয়।

প্রতিক্রিয়াটা স্থানীয়। চর্মে প্রদাহ যে বস্তুতে দেখা যায়, সেই একই বস্তু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে হয়ত কিছুই হয় না।

পরীক্ষার জন্য স্পর্শের পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় সম্ভাব্য বস্তুগুলিকে চামড়ার উপর চব্বিশ ঘণ্টা রেখে প্রদাহ হল কি না দেখা হয়। অনেক সময়, দশ থেকে কুড়ি দিন পরে প্রদাহ দেখা দেয়। এটা দীর্ঘকালীন সংবেদনশীলতার পর্যায়ভুক্ত। রাসায়নিক দিক থেকে এ প্রতিক্রিয়া বস্তুর হ্যাপটেন ও চর্ম প্রোটিনের সংযোগ উদ্ভূত।

14 দেহকলার কলম অধিরোপন

গাছপালার কলম (graft) করে নতুন আম গাছ, সেই গাছে অতুলনীয় আম, ঐ আম আর আমরা কে খাইনি ? কিন্তু দেহকলার কলম, আর তার সাহায্যে ক্ষত সারানো—ব্যাপারটা যত সহজ মনে হয়, ঠিক ততখানিই শক্ত ব্যাপারটা।

কিছুদিন আগেও মনে হত শব্দের চেয়ে দ্রুততর গতিতে প্লেনের চলা অসম্ভব। সেই সময়ে বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক মেভোয়ার বলেছিলেন যে, ঠিক অনুরূপ একটি সমস্যা আমাদের সামনে, তা হল দেহকলার অধিরোপন করার সমস্যা।

কেন এটা সমস্যা, বলা দরকার। ধরা যাক একটি প্রাণীর দেহে, আর একটি প্রাণীর দেহকলা অধিরোপন করা হল। দেখা যাবে, অধিরোপিত দেহকলা টুকন, গ্রহণকারী বাতিল করে দেয়, বিশেষ প্রতিরোধমূলক অনাক্রম্যতার প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে।

অধিরোপন বা কলম করার সমস্যার কথা বলতে গেলে, কি কি ধরনের অধিরোপন হতে পারে, তা বলা দরকার। ঐগুলি হতে পারে 1. নিজ দেহকলা দেহে অধিরোপন ; 2. যমজদের পারস্পরিক দেহকলা অধিরোপন ; 3. একই প্রজাতীর প্রাণীর দেহকলা অধিরোপন ; 4. অন্য প্রজাতীর প্রাণীর দেহকলা অধিরোপন।

বাতিলের প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছি। ঐ প্রতিক্রিয়া ঘটে দুদিক থেকে : 1. গ্রহণকারীর নিজের শরীরের প্রতিক্রিয়া ; 2. অধিরোপিত কলার প্রতিক্রিয়া গ্রহণকারীর শরীরের সঙ্গে।

আবার এ অধিরোপিত কলা 1. ভ্রূণদেহের থেকে ; 2. স্বাভাবিক পরিণত বয়স্কের দেহ অথবা 3. টিউমার থেকে নেয়া হতে পারে।

নিজকলা নিজদেহে অধিরোপন

প্রাণীর নিজের দেহকলাই দেহের অন্য জায়গায় নিজে থেকেই অধিরোপিত হতে দেখি যখন ক্যানসার এক জায়গা থেকে আর একজায়গায় ছড়ায়।

ক্ষত সারাতে গিয়ে সার্জেনদের অনেক সময়েই কলা অধিরোপন করতে হয়। করার সময়ে সাবধানতা হিসাবে কয়েকটি জিনিসের প্রয়োজন। এগুলি হল :

1. অধিরোপিত দেহকলাকে স্বাস্থ্যকর হতে হবে। অর্থাৎ অযথা আঘাতগ্রস্থ না হয়।

2. কোন বীজাণু যেন না থাকে ! কেননা, সংক্রমণগ্রস্থ হলে অধি-রোপন কোন রকমেই সম্ভব নয়।

3. অধিরোপনের জায়গায় পুষ্টি, অক্সিজেন, এসব যথেষ্ট থাকা চাই।

4. অধিরোপিত স্থানে যতটা হরমোন প্রয়োজন, তা থাকতে হবে। একে হ্যালষ্টেডের নীতি বলে।

5. অধিরোপিত স্থানের সঙ্গে স্নায়ুসূত্রের যোগ না থাকলে দেহকলার মৃত্যু ঘটে।

6. অধিরোপিত কলা গৃহিত হবার জন্য, তার বিশেষ উত্তেজক থাকার প্রয়োজন।

7. উপযুক্ত উত্তাপ—খুব বেশী নয়। আবার কমও না হয়—থাকা দরকার।

অনাক্রম্যতা বা প্রতিরোধমূলক দিক থেকে নিজ দেহকলার উপর নিজ-দেহের প্রতিক্রিয়া হয় না। এজন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত সাবধানতা নিলে অধিরোপিত কলা লেগে যায়।

অধিরোপিত কলায় নতুন শিরা ধমনী জন্মায়। কেউ বলে এগুলি আগেকার রক্তনালিকা, আবার কারো মতে এগুলি হয় নতুন করে তৈরি। যে জায়গায় কলা অধিরোপিত হয়, সেখানকার রক্তনালিকাগুলি যেন নতুন করে শিকড় ছেড়ে পারস্পরিক যোগাযোগ ঘটায়।

একই প্রজাতীর এক প্রাণীর দেহ থেকে অন্যপ্রাণীর শরীরে কলা অধি-রোপনের সমস্যাটি গুরু ওজনের। পোড়া বা অনুরূপ ক্ষতে এই পদ্ধতির সাহায্য অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। তাছাড়া, অনাক্রম্যতা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবিধ শারীরিক ব্যবস্থা বুঝতেও অধিরোপনকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

অধিরোপিত কলার ভাগ্য

অন্য দেহ থেকে অধিরোপিত কলার পরিণতি হতে পারে চার রকমের।

1. অতি মারাত্মক বা অতি দ্রুত প্রত্যাখ্যান অনেক অধিরোপিত কলা অন্য শরীরে অতি দ্রুত প্রত্যাখ্যাত হয়। এই প্রত্যাখ্যানে বহুনিউক্লিয়াস-বিশিষ্ট শ্বেতকণিকা ও ফাইব্রিন বিশেষ অংশগ্রহণ করে।

2. অপেক্ষাকৃত কম দ্রুত প্রত্যাখ্যান: এই প্রত্যাখ্যানে প্রথমটায় দেহে অধিরোপিত কলা গ্রহণ করবে, এ রকম মনে হয়। কিন্তু এ থাকাটা সপ্তাহ দুয়েকের। তারপর লিম্ফোসাইট ও পরে লিম্ফোসাইটে পরিণত হবে, এইরকম কোষ দেখা দেয় প্রত্যাখ্যানের প্রথম ধাপে। তারপর অধিরোপিত কলার শিরা ধমনীগুলি বন্ধ হতে থাকে। ক্রমশঃ অধিরোপিত কলা মৃত হয়ে যায়। তারপর সেই মৃতকলা নিষ্কাষণ করার জন্য বহুনিউক্লিয়াস শ্বেত-কণিকা, ইয়োসিনপ্রিয় কোষ, ম্যাক্রোফাজের মাধ্যমে দানাদার কলা আস-পাশে ও তলদেশে সৃষ্ট হয়। প্রত্যাখ্যাত হবে, এমন অধিরোপিত কলা, কতদিন যে বাঁচবে, এটা নির্ভর করে কলার পরিমাণের উপর। কারণ এই প্রত্যাখ্যান কোষ নির্ভর। কত বেশী সংখ্যায় কোষ দরকার হচ্ছে, তার উপরেই নির্ভর করে প্রত্যাখ্যানে কতটা সময় লাগবে। এইসব কুকুরের বৃক্ক অধিরোপনের মাধ্যমে দেখা গেছে।

3. ধীর প্রত্যাখ্যান: প্রথমটায় মনে হয়, বুঝি অধিরোপিত কলা লেগেই গেল, এই নবাশ্রিত দেহে। কিন্তু সেই কলার শিরাধমনীগুলি বুজে এসে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হবার পর্যায়ে পৌছয়।

4. গ্রহণ ও গ্রহণসম্ভাবনা: অনাক্রম্যতা ও প্রতিরোধকে প্রতিহত করে, অধিরোপিত কলা যাতে গ্রহণ করাও যায়, এ চেষ্টা এখন খুবই বেড়েছে। এর কারণ হল বর্তমান যুগ অধিরোপনের যুগ। হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক ইত্যাদি প্রায় সর্বপ্রকার দেহাংশ ও কলা, আজ প্রয়োজনের খাতিরে অধি-রোপন করতে হচ্ছে। অনাক্রম্যতার দিকটাকে শিথিল, ও প্রায় পক্ষাঘাত-গ্রস্থ, কি পঙ্গু করার জন্য বিভিন্ন ওষুধ ও অন্য প্রক্রিয়াও প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর ফলাফল বলা যায় এখনো পরীক্ষাগারে।

অধিরোপিতের দীর্ঘজীবন

প্রাণীর নিজের দেহকলা নয়, এরকম কলা তাড়াতাড়িই হক, আর

দেরীতেই হক, প্রত্যাখ্যাত হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যতটা বেশীদিন থাকে, তার মধ্যে চিকিৎসার কাজ অনেকটাই হয়ে যায়। অধিরোপিত কলার দীর্ঘজীবীতা কয়েকটি ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল।

1. দেহের কোন কোন কলার জীবন অধিরোপনেও দীর্ঘ হয়।
2. দেহের বিভিন্ন জায়গায় অধিরোপনের দীর্ঘজীবনের তারতম্য হয়।
3. গ্রহীতার শরীরের অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার উপরেও এই তারতম্য নির্ভরশীল।

তরুণাস্থি ঃ তরুণাস্থি বহুমাস কি বছরও বেঁচে থাকে। এর কোষ বহুকাল জীবন্ত থাকে। এমনকি মৃত তরুণাস্থিও সহজে অপসারিত হয় না।

অচ্ছোদ পটল ঃ নিজস্ব জায়গায়, অর্থাৎ চোখের ঠিক জায়গায় লাগালে এই কলা থেকে যায়। কিন্তু অন্য জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল যে, প্রাণীর অচ্ছোদ পটল অধিরোপন করা হয়েছে, সেই প্রাণীরই চামড়া যদি অধিরোপিতের দেহে অধিরোপন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে অচ্ছোদ পটলটিও অনচ্ছ হয়ে নিষ্কাষিত হয়ে যায়। মনে করা হয়, অপর দেহের কোষকে, তা যেন বিদেশী শত্রু, এইভাবে দেহ তা গ্রহণ করে, এই দ্বিতীয় অধিরোপনের নবসৃষ্ট উত্তেজনায়।

ডিম্বকোষ ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রী ডিম্বকোষের অধিরোপন চামড়ার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

ভ্রূণ কোষ ও টিউমার কোষের অধিরোপিত হয়ে বাঁচার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

স্থানবিশেষে অধিরোপনের দীর্ঘজীবন

অচ্ছোদ পটলের ভিতর দিকে যে স্বচ্ছ কামরা সেখানে বিভিন্ন দেহকলা অধিরোপন করলে বেঁচে যায়। মেডয়ার দেখিয়েছেন যদি রক্তনালিকা না জন্মে অধিরোপিত কলায়, তবে তা অতি দীর্ঘজীবন লাভ করে। এখানে অনাক্রম্যতার প্রতিক্রিয়া খুব কম।

গ্রহীতার বিশেষত্ব

বস্তু-প্রতিবস্তুর প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে অধিরোপিত কলার বস্তু ও

গ্রহীতার কলা বস্তুর মধ্যে সঙ্গতি থাকলে অধিরোপিত কলা গ্রাহ্য হয়। এই বস্তুগুলিকে গ্রাহ্যবস্তু হিসাবে বিশেষ নাম দেয়া হয়েছে। একই রকম দেখতে, এমন যমজের একজনের দেহকলা, আর একজনের দেহে অধিরোপন করলে তা গ্রাহ্য হয়। ঘনিষ্ঠ প্রজনন জাত ইঁদুরে, একজনের দেহকলা অন্যের দেহে অধিরোপন করা যায়। তবে এর আবার একটি ব্যতিক্রমও আছে। একটি বিশেষ প্রজাতীর ইঁদুর আছে। এদের পুরুষ দেহের কলা স্ত্রীদেহে অধিরোপন করলে, সেই প্রাণীটির মৃত্যু হয়। এর কারণ, y ক্রোমোসোমে বিশেষ গ্রহীতা জিনের প্রভাব।

সন্তানসম্ভবা প্রাণী, কি ইউরিমিয়া ইত্যাদি রোগে অধিরোপিত কলা গ্রাহ্য হয়।

যে প্রাণীর দেহ থেকে অধিরোপিত কলা একবার অগ্রাহ্য হয়েছে, তার দেহে আর একবার উক্ত প্রাণীর দেহকলা অধিরোপন করলে, তা আরো দ্রুত অগ্রাহ্য হয়।

রক্তে কি থাকে

অধিরোপিত চর্ম অগ্রাহ্য হবার পর, রক্তে বিশেষ ধরনের ইমিউনো-গ্লোবিউলিন দেখা দেয়। এর মধ্যে কিছু আছে যা রক্তের লোহিতকণিকা-গুলি যূথবদ্ধ করে আটকে দেয়। তা ছাড়াও আরও বিবিধ ধরনের প্রতিবস্তু থাকে।

কোষে কি থাকে

অধিরোপন গ্রহণ-বর্জনঘটিত অনাক্রম্যতায় শরীরের বিভিন্ন কোষের কাজ আছে। ট্রিটিয়েটেড থাইমিডিন অর্থাৎ H_3 দেয়া থাইমিডিন প্রয়োগের পর ছবি নিয়ে দেখা গেছে যে এই প্রাণীর 30% কোষ H_3 গ্রহণ করে। তার মানে হল, এত কোষ, এ অনাক্রম্যতায় সক্রিয়। কোষ প্রতিরোধ অধি-রোপন প্রতিরোধের অর্ধেকটাই।

অধিরোপনে বস্তু-প্রতিবস্তু

এখানে বস্তু-প্রতিবস্তু প্রতিক্রিয়ায় যে বস্তু আবশ্যক, তাকে বলে অধি-রোপন বস্তু। এ বস্তুগুলি জিন নিরূপিত। ইঁদুরের ক্রোমোসোমে অন্ততঃ

পনেরোটি এরকম জিন সঞ্চারস্থান দেখা গেছে। এগুলিকে **H-1, H-2** ইত্যাদি বলা হয়। ঐ বস্তুগুলি দেহের প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে থাকে।

কিভাবে অধিরোপন প্রভাবিত হয়

সারা দেহে রঞ্জন-রশ্মি প্রয়োগ—সারা দেহে রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ করলে প্রতিবস্তু উৎপাদন প্রতিহত হয়, সেইজন্য অধিরোপনও দীর্ঘজীবী হয়।

নাইট্রোজেন মাষ্টার্ড, এমাইনপটেরিন ইত্যাদি রাসায়নিক বস্তুর ততটা প্রভাব না থাকলেও, অনুরূপ ওষুধ এজাথায়োপ্রিন এখন অধিরোপনে ব্যবহার করা হচ্ছে।

রেটিকিউলো এণ্ডোথিলিয়াল কোষের হ্রাস ঘটাতে পারলে অধিরোপন দীর্ঘায়ু হয়।

অনাক্রম্যতার নিবারিত অবস্থা (Immunological tolerance)

বস্তুর প্রতি অতি সহনশীল, এই অবস্থার দিকে প্রথম অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন বার্নেট 1948-49এ। তিনি দেখালেন ভ্রূণাবস্থায় যদি ভ্রূণের দেহে বিশেষ বস্তু হিসাবে কারো দেহকলা অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়, তাহলে পরবর্তী জীবনে, সেই দেহকলা অধিরোপন করলে, তা গৃহীত হবে, যেন সেই কলা তারই নিজদেহের। এই অবস্থা যেন দুটি যমজ, যারা সমদর্শন, তাদের মতই। মেডয়ার ভ্রূণাবস্থায় এ ধরনের পরীক্ষা করে, পরবর্তী জীবনে যখন সেই প্রাণীর দেহকলা, বড় হয়ে ওঠা সেই ভ্রূণটির দেহে অধিরোপন করলেন তখন সেই কলা গৃহীত হল।

এখন অধিরোপন একটা এমন জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কথায় কথায় তার ব্যবহার করা হচ্ছে। তার মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভ কি অচ্ছোদপটোল অধিরোপন করাটা, অপেক্ষাকৃত ছোট সমস্যা, কেন না সেগুলি দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে। কিন্তু চামড়ার অধিরোপন, যার প্রয়োজন অনেক বেশী হয়, তার সমস্যা আজও মারাত্মক।

বৃক্ক বা কিডনি অধিরোপন আজ এমনই একটি প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে উঠেছে, যে তার বহুল ব্যবহার আজ হচ্ছে। কিন্তু জিনের বিশেষ সঞ্চার-

ক্ষেত্রের HLA পরস্পর বিরোধিতার জন্য অধিরোপিত বৃক্ক পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

অস্থির অধিরোপনে, অধিরোপিত অস্থি যদি তখনই সংগ্রহ করা হয়ে থাকে ও লাগানো হয়ে থাকে তাহলে তা বাঁচার সম্ভাবনা একটু বাড়ে। তবে গ্রাহকের নিজ দেহের অস্থি গৃহীত হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

হৃৎপিণ্ডের অধিরোপনে সংবাদপত্রে যতটা হৈ চৈ শোনা গেল, সাফল্য ততটা নয়। এ সাফল্য সার্জারির সাফল্য হলেও কলা অধিরোপনের সাফল্যের সূচনা করতে পারেনি।

রক্ত চলাচল ক্রিয়ার ভিন্নতার জন্য অচ্ছোদপটোল প্রমুখ কলা অধিরোপিত হলে বাঁচার সম্ভাবনা ভাল। তবে শুষ্ক অবস্থায় ব্যাঙ্কে রেখে দিয়ে পরে ব্যবহারের সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকলেও, তার পূর্ণ সাফল্য আজও পরীক্ষাধীন।

অধিরোপিত কলা গ্রহণ না করার নীতি বা তাকে নীতি না বলে বিশেষত্বই যদি বলি, তা বিবর্তনে মেরুদণ্ডীরাই অর্জন করেছে। কিন্তু তা কেন সেটা সঠিক বোঝা যায় না।

15 অনাক্রম্যতা ও প্রতিরোধজনিত ব্যাধি

পূর্ব অধ্যায়ে অনাক্রম্যতার অনেকগুলি দিক নিয়ে আলোচনায় বলা হয়েছে, ভ্রূণাবস্থাতেই নিজের দেহের প্রোটিন ও তা নয়, অর্থাৎ নিজস্ব ও পরস্ব, এটা ভ্রূণই যেন বুঝতে শেখে, ও তা সারা জীবন যেন কোষের স্মৃতিতে থাকে। ফলে দেহ পরস্ব বস্তুর বিরুদ্ধে প্রতিবস্তু সৃষ্টি করে। কিন্তু নিজস্ব প্রোটিনের বিরুদ্ধে করে না। বার্নেটের আবিষ্কারের কথাও এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। বার্নেট দেখালেন, যে প্রাণী যখন ভ্রূণাবস্থায় থাকে, তখন যে যে প্রোটিন দেহের কাছে থাকার জন্য তার পরিচিত হয়ে ওঠে, সেগুলিই তার আত্মবৎ হয়ে ওঠে। এর ফলে, এগুলির বিরুদ্ধে জীবনে কোনদিনই আর সেই প্রাণী প্রতিবস্তু সৃষ্টি করতে পারবে না। তবে যদি এইসব "আত্ম-মন্য" প্রোটিনের কোন পরিবর্তন ঘটানো যায়, তাহলে তা প্রতিবস্তু সৃজক হয়ে উঠতে পারে।

এর উদাহরণ হল, চোখে ছানি পড়বার পর লেনসের প্রোটিন, অথবা চর্মপ্রদাহে (dermatitis) কোন হাপটেন সংযুক্তিতে পরিবর্তিত প্রোটিন, যা চামড়ায় এ্যালার্জির সৃষ্টি করে।

তথাকথিত এ্যালার্জি ও অনুরূপ যে ব্যাধি আমরা দেখি, তাতে নিজস্ব বা আত্মপ্রোটিন সম্পর্কিত দেহের সহনশীলতা, যে সহনশীলতার উদ্দেশ্য হল প্রতিবস্তু সৃজন না করার, সেই সহনশীলতা লুপ্ত হয়। বার্নেট দেখিয়েছেন যে, প্রতিবস্তু সৃষ্টির কোষকূলের যে কলোনি বা ক্লোন থাকে, সেখানেই এক নিষিদ্ধ ক্লোনের সৃষ্টি হয়। এগুলি লিম্ফোসাইট কোষভিত্তিক। এজন্য লিম্ফোমা জাতীয় লিম্ফ বা লসিকাগ্রন্থীর টিউমারে অথবা থাইমাস গ্রন্থিতে এরূপ নিষিদ্ধ ক্লোনের জন্ম হয়। সহনশীলতা ভেঙ্গে যাওয়া আর এক উপায়ে ঘটতে পারে। তা হল, যখন কোন বীজাণু অনুরূপ কিছুর সংযোগে এসে নিজস্ব প্রোটিন একটু বদলে যায়। তখন দেহ তার বিরুদ্ধে প্রতিবস্তু সৃষ্টি করতে গিয়ে নিজ দেহ প্রোটিনের বিরুদ্ধেই প্রতিবস্তু সৃষ্টি করে বসে।

আত্মপ্রতিবস্তু

আত্মপ্রতিবস্তু (auto-antibody) বিভিন্ন রকমের। তা কোন বিশেষ প্রত্যঙ্গ বিরোধী অথবা সাধারণ হতে পারে। প্রত্যঙ্গ বিরোধী প্রতিবস্তুর উদাহরণ হল, যেমন থাইরয়েড বিরোধী প্রতিবস্তু যা থাইরয়েডকে নষ্ট করে। আর সাধারণ আত্মপ্রতিবস্তু, কোষের অংশ বিশেষের প্রতিবস্তু। যেমন, মাইটোকণ্ড্রিয়া, দেহাভ্যন্তরস্থ পেশী, ইত্যাদির বিরোধী। আত্মপ্রতিবস্তু রক্তকণিকা বিরোধীও হতে পারে, যার ফলে বিশেষ ধরনের রক্তাল্পতা দেখা দেয়। এই পর্যায়ের রোগকে আত্মবিরোধী (auto-immune disorder) ব্যাধি বলা হয়।

এই ব্যাধি বৃক্কের বিশেষ ব্যাধি, যকৃতব্যাধি, নানাবিধ চর্মরোগ, রক্তাল্পতা, থাইরয়েড গ্রন্থীর রোগ, বিবিধ চক্ষুরোগ, ইত্যাদি নানা রোগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

বৃক্কের আত্মপ্রতিবস্তু জাত ব্যাধি

এই কলার গ্লোমরিউলাস বা পুঞ্জিকার ক্ষতি সাধিত হয়, যদি বহুমুখী প্রতিবস্তু প্রাণীর দেহে ইনজেকশানের মাধ্যমে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়, তাতে গ্লোমরিউলাসের বা পুঞ্জিকার ঝিল্লী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে, নেফ্রাইটিস রোগের সূচনা করে। বৃক্কের অভ্যান্তরস্থ এই ক্ষত, বিশেষ রঞ্জক ব্যবহার করে, অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে। এই বিশেষ পদ্ধতিকে ইমিউনোফ্লোরিসেন্স (immunoflore-scence) বলে। যাকে বলা চলে অনাক্রম্যতা চিহ্নিতকরণের উপযুক্ত রঞ্জক। বৃক্কঝিল্লীও ফ্রয়েণ্ডকৃত মিশ্রকবস্তু ইনজেকশান দিলেও এই ফলই হয়। গুডপাশ্চার (Goodposture) সিণ্ড্রোম নাম যে অসুখের কথা জানা আছে সেখানেও এই রকমের জখমই দেখা যায়।

রক্তরস ইনজেকশান জাত বৃককের প্রদাহব্যাধির অণুবীক্ষণদৃষ্টরূপে এই রকমেরই হয়। ষ্ট্রেপটোকক্কাস বীজাণুর আক্রমণের ফলেও বৃক্কের যে প্রদাহ হয়, তার চেহারাও একই রকমের।

যকৃতের ব্যাধি

যকৃতের বিভিন্ন ব্যাধিতে যেমন, দীর্ঘস্থায়ী যকৃতের প্রদাহে, ও যকৃতের সিরোসিস রোগে বিভিধার্থক প্রতিবস্তু দেখা যায়। এ জন্য এই ধরনের

যকৃতের ব্যাধিকে নিজকলা-বিরোধী-প্রতিবস্তু-সঞ্জাত বা আত্মপ্রতিবস্তু সঞ্জাত ব্যাধি (auto-immune disease) বলা হয়েছে।

চর্মরোগ

পুড়ে গেলে, কারো ক্ষেত্রে, ও কোন কোন চর্মরোগে, শরীরে চর্মবিরোধী প্রতিবস্তুর উদ্ভব হতে দেখা যায়। বিশেষ করে পেমফিগাস রোগে শরীরের রক্তরসে চর্মবিরোধী প্রতিবস্তুর অস্তিত্ব পরীক্ষায় দেখা যায়

লোহিতকণিকাজাত রক্তাল্পতা

যে ধরনের রক্তাল্পতায় লোহিতকণিকা ভেঙ্গে যায়, তাতে লোহিত-কণিকা বিরোধী প্রতিবস্তু দেখা যায়। ঐ প্রতিবস্তু লোহিতকণিকাগুলিকে জমাট বাঁধিয়ে সেগুলিকে ধ্বংস করার জন্য এই ধরনের রক্তাল্পতা জন্মায়। তবে এই প্রতিবস্তু বিভিন্ন ধরনের হয়। আত্ম ও পর চিহ্নিত করায় ক্ষমতা যা ভ্রূণজীবনেই কোষ লাভ করে, সেই নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিবস্তু তৈরি করে। সেই চিহ্নিত করার ক্ষমতায় যেন বিভ্রান্তি যেন দেখা যায় লিম্ফয়েড লিউকিমিয়ার মত কোন কোন রক্তকণিকার ক্যানসারে।

থাইরয়েড ঃ হাসিমোতো ব্যাধি

এই রোগে থাইরয়েড বিরোধী প্রতিবস্তু দেখা যায় বলে একে আত্ম-কলাবিরোধী ব্যাধির মধ্যেই ফেলা হয়। এ কথা মনে করা হয় যে, থাইরয়েড কৃত, থাইরোগ্লোবিউলিন অনেক সময় বাইরে বেরিয়ে এলে শরীর আর যেন তাকে চিনতে না পেরে, তার বিরোধী প্রতিবস্তু তৈরি করে। এরই ফলে থাইরয়েড গ্রন্থীর ক্ষতি হয়। ক্ষতি হলে গ্রন্থী আরো থাইরোগ্লোবিউলিন বার করে দেয় ও উপরোক্ত পাপচক্র চলতেই থাকে। এই রোগে শতকরা নব্বই জনের ক্ষেত্রে থাইরোগ্লোবিউলিন বিরোধী প্রতিবস্তু থাকে। এই গ্রন্থীর চারিধারের লিম্ফোসাইট কোষগুলি টিস্যু কালচারে বাঁচিয়ে রাখলে, তা থাইরয়েড কলার বিরোধিতা করে থাইরয়েডকে নষ্ট করে। রক্তরসে থাইরয়েড বিরোধী প্রতিবস্তু পেলে রোগনির্ণয় সন্দেহের অতীত হয় বলে প্রমাণিত হয়।

চক্ষু রোগ

দেখা গেছে একটি চোখ কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে, অন্য চোখটি যেন তার প্রতি সহানুভূতিসূচক (Sympathetic)-ভাবে নষ্ট হবার জন্য প্রদাহগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ প্রথম চক্ষুটি সপ্তাহখানেকের মধ্যে বাদ দিয়ে দিলে অপর চক্ষুটি রক্ষা পায়। মনে করা হয়, চোখের ভিতরের রঞ্জক বস্তু বার হয়ে এলে, শরীরে তার বিরুদ্ধে প্রতিবস্তু তৈরি হয়ে যাবার ফলেই এ রকমটা ঘটে। প্রতিবস্তু হওয়াটাকে চেপে দেয়, এমন ওষুধে (ACTH) অন্য চোখটি বাঁচে। ছানি অপারেশানের ত্রুটিতে চোখের লেন্সের আচ্ছাদক পদার্থের বিরুদ্ধে প্রতিবস্তু সৃষ্টি হয়েও চোখ নষ্ট হয়ে যায়। এগুলিকে আত্ম-কলা বিরোধী ব্যাধির (auto-immune) পর্যায়ে ফেলা হয়।

কোলাজেন ব্যাধি

1933 সালে, ক্লিঞ্জ প্রথম দেখান তন্তুজাতীয় কলা, যা কোলাজেন নামে অভিহিত ও এরই পাতলা একটি আচ্ছাদন, যা হৃৎপিণ্ডকে ঢেকে রাখে, সেই আচ্ছাদকের (পেরিকার্ডিয়াম) প্রদাহ গেঁটে বাত রোগে হতে দেখা যায়। 1942 সালে ক্লেমপারার একাধিক ব্যাধি, যেমন লুপাস, ইত্যাদি ব্যাধিতে, এইরকম কোলাজেনের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্য করে এগুলির নাম দেন, কোলাজেন ব্যাধি। এতে সুবিধা হল বহু ব্যাধি, যাতে কলা বা অঙ্গবিশেষের আচ্ছাদন (যা তন্তুজাতীয়) ক্ষতিগ্রস্থ হয়, সেই সব ব্যাধিগুলিকে এই নামে এক ছাতার তলায় আনা সম্ভব হয়েছে, ও আত্মকলা বিরোধী ব্যাধির পর্যায়-ভুক্ত করা গেছে।

বাতজ্বর (Rheumatic fever)

বাতজ্বরের কারণ অনেকদিনই জানা। গলায় ষ্ট্রেপটোকক্কাস পায়ো-জেনিসের আক্রমণের পরবর্তী ধাপে গাঁটে গাঁটে প্রদাহ ও হৃৎপিণ্ডের ভিতরের ভাল্‌ভ বা কপাটগুলিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। মনে হয়, আত্মকলা বিরোধী এই রোগে, ষ্ট্রেপটোকক্কাসের সঙ্গে তন্তুজাতীয় দেহকলা হ্যাপ্টেন হয়ে, তারই বিরুদ্ধে প্রতিবস্তু সৃজন সম্ভব করে।

তথাকথিত বাতজ্বর অর্থাৎ রিউম্যাটিক ফিভারের নির্ণায়ক বিকারবস্তুর

নাম এর আবিষ্কারকের নামে এ্যাসফ বডি বা এসফের পিণ্ড বলে পরিচিত। হৃৎপিণ্ডের পেশীতে এই পিণ্ড অণুবীক্ষণে দেখা যায়। মৃত, সংযোজক কলার চারিদিকে বিভিন্ন কোষের সমন্বয়ে এই পিণ্ড গঠিত। এর কোষগুলি বহু-নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট রাক্ষুসে কোষ। এ কোষগুলির উদ্ভব হয় হিষ্টিওসাইট কোষ থেকে। এছাড়া এসফ্ পিণ্ডে ম্যাক্রোফাজ, লিম্ফোসাইট ইত্যাদি কোষ থাকে। হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে জলস্ফীতির (oedema) কারণে এ রোগে মৃত্যু সম্ভব।

এ রোগ থেকে সেরে ওঠার পরেও, বিকারচিহ্ন হিসাবে হৃৎপিণ্ডের কপাট বা পটাহ (valve)গুলি এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে যে, তার ফলে রক্তের নিষ্ক্রমণ বাধা পেতে পারে, অথবা নিষ্ক্রান্ত রক্ত আবার ফিরে আসে (stenosis and regurgitation)। বিকারবস্তুগুলি পল্লবিত হয়ে তার পর যখন রোগ আরোগ্যে শুকিয়ে গেলে, এই স্থায়ী ত্রুটি থেকে যায়।

অনুরূপ বিকারবস্তু উপস্থিতির জন্য মাঝে মাঝে গাঁটে গাঁটে ব্যথাও হয়ে থাকে। ফুসফুসের আচ্ছাদনের প্রদাহ ও স্নায়ুও নিম্ন মস্তিষ্কে এই বিকারবস্তু কোরিয়া রোগের সৃষ্টি করে।

তবে এই জ্বরে হৃৎপিণ্ডের রোগ হলেও, তারা বৃদ্ধ বয়স অবধি বেঁচে থাকতে পারে।

বাতজনিত সন্ধি প্রদাহ

সাধারণ মানুষের কাছেও এই ব্যাধি অজানা ছিল না, এর ইংরাজি নাম রিউমাটয়েড আর্থাইটিস এই নামে। এ রোগ তরুণ বয়সের। মেয়েদেরই বেশী হয়। একাধিক ছোট ছোট সন্ধি এই রোগে আক্রান্ত হয়। সন্ধিগুলিতে যে ঝিল্লি সাইনোভিয়াল ঝিল্লি বলে পরিচিত, তার প্রদাহেই সুরু এ রোগের। এখানে লিম্ফোসাইট, প্লাজমা কোষ, বহুনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট কোষ প্রথমে জমা হয়।

তারপর এই ঝিল্লির চারিধারে গড়ে ওঠে দানাদার কলা। এর ফলেই সন্ধির ভিতরের জায়গাটা বন্ধ হয়ে গিয়ে, নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়, দেখায়ও বিভৎস, বিকৃত। নড়াচড়া বন্ধ হয় বলে, অস্থি, পেশী ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে যেতে থাকে। বাতের যে তথাকথিত পিণ্ডগুলি উৎপন্ন হয়, সেগুলি দীর্ঘস্থায়ী।

হৃৎপিণ্ডের পেরিকার্ডিয়াম ঝিল্লিতে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রদাহ হতে দেখা যায়। তবে হৃৎপিণ্ডের পেশীর প্রদাহ কমই হতে দেখা যায়।

ফুসফুসে বা প্লুরা ঝিল্লিতে প্রদাহ হয়ে ফুসফুসের চারিধারে জলও জমতে পারে। তবে ফুসফুসে এ ধরনের জখম, তাদেরই বেশী হতে দেখা যায়, যারা খনিতে কাজ করে। কারণ তাদের ফুসফুসে বিভিন্ন কণিকা ঢুকে, এ রোগকে ত্বরান্বিত করে।

এ রোগে লিম্ফগ্রন্থী, প্লীহা ও যকৃতের আয়তন বৃদ্ধি হয়। চোখের কন্‌জাঙ্কটাইভা অর্থাৎ অক্ষিঝিল্লির প্রদাহও দেখা যায়। সারা দেহে এ্যামাই-লয়েড পদার্থ জমা হতে পারে।

লুপাস এরিথিমেটোসাস

শরীরের চামড়ায়, সারা শরীরের যে কোন জায়গায় লাল হয়ে, আঁশ ছাড়িয়ে নেয়ার মত একটা অবস্থা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের বহুদিন থেকেই জানা ছিল। চামড়ার নিচের স্তর (dermis) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, চুলের গোড়াও শক্ত জিনিসে বন্ধ হয়ে যায়। এই স্তরে লিম্ফোসাইট জাতীয়, একনিউক্লিয়াস-বিশিষ্ট কোষগুলি এসে জমা হয়। কেবল চামড়ায় না থেকে, এ রোগ অন্য জায়গায়ও ছড়িয়ে পড়ে। তাতে বিভিন্ন গাঁটে প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লিতে প্রদাহ, ফুসফুসের ঝিল্লির প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে ও বৃক্ককে প্রদাহ ইত্যাদি দেখা যায়। সেই সঙ্গে জ্বর, রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যাল্পতা, ইত্যাদিও হয়। শতকরা 40% ভাগ রোগী পনেরো বছর পর্যন্ত বাঁচে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃক্ককের প্রদাহই মৃত্যুর কারণ।

সর্বাঙ্গীণ লুপাসের অণুবীক্ষণের চিত্রে দেখা যায় যে সারা শরীরে সংযোগ কলার তন্তুকলায় পরিবর্তিত হয়ে মৃত্যু। এই পরিবর্তন হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের আচ্ছাদক থেকে অস্থি সংযোগে পর্যন্ত প্রসারিত। ধমনী প্রাচীরও এই রোগে অনুরূপভাবে প্রভাবিত হয়। ধমনীগুলি ইয়োসিনরঞ্জিত ও মোটা মোটা দেখায়। বৃক্ককের গ্লোমরিউলাসও বেড়ে ওঠার চেষ্টা করে মরে যেতে থাকে। লিম্ফগ্রন্থিতেও বীজকোষগুলির চারিধারে কোলাজেন তন্তু জমা হয়। হৃৎপিণ্ডের কপাট বা কপাটিকাগুলিতেও এই পরিবর্তনজাত প্রদাহ দেখা যায়। এই বিকারের তথাকথিত চিহ্ন L. E. কোষ।

আত্মবস্তুবিরোধী প্রতিবস্তু রক্তরসে দেখা দেয়। লোহিতকণিকা নাশ-

জনিত রক্তাল্পতা দেখা যায়। রোগ নির্ণয় ক্ষেত্রে, নিউক্লিয়াস বিরোধী প্রতিবস্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য। এই পরীক্ষাকে L. E. কোষ পরীক্ষা বলে। এতে বহুনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট কোষ, রোগীর রক্তরসে মিশিয়ে রাখলে, ওই কোষে নিউক্লিয়াসের ভগ্নাংশ জমা হয়।

লুপাসে পাওয়া প্রতিবস্তু বহুপ্রকারের। যেমন লুপাসজাত বৃক্কের প্রদাহে, গ্লোমেরুলাস কোষ নিউক্লিয়াসের প্রতিবস্তু রক্তরসে পাওয়া যায়। নিউক্লিয়াসের বস্তুটি বলাই বাহুল্য DNA। এই DNA নিজস্ব বা পরস্ব অর্থাৎ কোন বীজাণু বা ভাইরাসের হতে পারে।

পলিআর্টিরাইটিস-নোডোসা

এই বিশেষ রোগটি বহুকাল ধরেই জানা যে, রোগে হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, যকৃত ও মাংসপেশীর মাঝারি ধমনীগুলির প্রদাহ ও মৃত্যু হয়। সেই সঙ্গে দেখা যায় স্নায়ুর প্রদাহ।

অণুবীক্ষণে দেখা যায়, দীর্ঘ এলাকা জুড়ে, জমাটবাঁধা ফাইব্রিনের মধ্যে থেকে রোগাক্রান্ত কলার মৃত্যু ঘটে। ধমনীগুলির প্রদাহস্ফীতি দেখা যায়। এই প্রদাহ আক্রান্ত কলার সর্বত্রই দেখা যায়। প্রদাহস্থলে বহুনিউক্লিয়াস-বিশিষ্ট কোষ, প্লাজমা কোষ, লিম্ফোসাইট, ইয়োসিন রঞ্জক কোষ ইত্যাদি সব রকম কোষই দেখা যায়। ধমনীর দুর্বল হয়ে যাওয়া প্রাচীর রক্তের চাপে স্থান বিশেষ ফুলে বর্তুলাকৃতি (aneurism) ধারণ করে, রক্তক্ষরণের উপযোগী দুর্বলতার সৃষ্টি করে। বৃক্ক, প্লীহা, এইসব জায়গায় জমাট রক্তের ডেলায় ধমনী নিরুদ্ধ হয় (infarction)। কর্টিকোষ্টেরয়েড কতকটা আরোগ্য করলেও, ধমনীপ্রাচীরগুলিতে দানাদার কলা তৈরি হয়ে, পরিপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না।

স্কেল্‌রোডারমা

লুপাসের বেলায় যে রকম, তথাকথিত স্কেল্‌রোডারমা, আগে চর্মরোগ বিশেষ হিসাবেই জানা ছিল। এরও দুটি রূপ ; স্থানীয় ও পরিব্যাপ্ত।

স্থানীয় লুপাসে চামড়ার অন্তর্বর্তী কলা ক্রমশঃ যেন ক্ষয় পেয়ে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। এই রোগকে মরফিয়াও বলা হয়।

পরিব্যাপ্ত রোগের, সুরুটা হয় চর্মরোগ হিসাবে। সুরু হয় মুখে হাতে।

যেখানের চামড়া রোগাক্রান্ত, সেই চামড়া শক্ত হয়ে যায়। ক্রমশঃ চামড়ার অভ্যন্তরভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। পেশীও সংক্রমিত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। সঙ্গে পেশীর প্রদাহও থাকে।

এই রোগে প্রথমটায় কোলাজেন তন্তু স্ফীত হয়ে ওঠে। তার চারিদিকে বর্তুলাকৃতি কোষগুলি জমা হতে থাকে শিরা ধমনীগুলির পাশে পাশে। কোলাজেনের পরিমাণ বৃদ্ধির, সেখানে চামড়ার স্বেদগ্রন্থী, কেশের শিকড়গুলি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় মেলানিন নামে চর্মরঞ্জকের আধিক্য ঘটে।

16 কয়েকটি মারাত্মক বীজাণু সংক্রমণ

বেশ কয়েকটি মারাত্মক বীজাণুর আক্রমণ যখন ঘটে, তখন আক্রান্ত জায়গায় পুঁজ হতে দেখা যায়। বর্তমানে যখন বহুবিধ এ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে রোগমুক্তি সম্ভব, তখনও সার্জারির মাধ্যমে পুঁজ নিষ্কাষণের প্রয়োজন একেবারে শেষ হয়ে যায়নি।

ষ্ট্রেপটোকক্কাস, ষ্টাফাইলোকক্কাস-পায়েজেনিস, নিমোকক্কাস, মেনিঙ্গোকক্কাস, গনোকক্কাস এই বীজাণুগুলিই পুঁজ সৃষ্টি করে। এ বীজাণুগুলি হল কক্কাস বা বিন্দুর মত দেখতে।

আর ব্যাসিলাই পর্যায়ের হল, (লাঠির মত) এসকেরিয়া কোলাই, প্রোটিয়াস বীজাণুকূল, সুডোমোনাস ইত্যাদি বীজাণু।

মোটামুটি বলতে গেলে, যেসব বীজাণুর নাম করা হল, তাদের আক্রমণ শরীরের যে কোন স্থানে হতে পারে। শুধু নিমোকক্কাস কেবলমাত্র ফুসফুসকেই আক্রমণ করে। অবশ্য প্রথমে রক্তের মাধ্যমে বাহিত বীজাণু এসে ফুসফুসকে আক্রমণ করে। ম্যানিঙ্গোকক্কাসও প্রধানতঃ মস্তিষ্কের আচ্ছাদনকে আক্রমণ করে। তবে জননেন্দ্রিয়েও আক্রমণ চালাতে পারে।

এই সব বীজাণুর আক্রমণের ছবি একই রকমের। বীজাণুর আক্রমণ হলেই সেখানে বহুসংখ্যক বহুনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট শ্বেতকণিকা জমা হয়, বীজাণুদের গ্রাস ও ধ্বংস করার জন্য। এতে যেসব শ্বেতকণিকা মরে যায়, তাদের দেহাবশেষই পুঁজ। রোগ আরোগ্যে পুঁজ বার করে দেয়া দরকার। তাতে সারাটা দ্রুত হয়। তা না হলে রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়। তখন লিম্ফোসাইট, প্লাজমা কোষ এরা সব এসে হাজির হয়।

পুঁজ সৃষ্টি করে, এমন বীজাণুর আক্রমণে জ্বর হয়, রক্তে বহুনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট শ্বেতকণিকার আধিক্য দেখা যায়। লোহিত কণিকার পাললিক সময়ও দীর্ঘতর হয়। ইমিউনোগ্লোবিউলিন বা প্রতিষেধক গ্লোবিউলিন রক্তরসে দেখা দেয়। রোগ নিশ্চিতভাবে নির্ণয় হয়, যখন আক্রান্ত স্থান কি রক্ত থেকে বীজাণু চাষের পদ্ধতিতে বীজাণু পাওয়া যায়। রক্তরসে উপযুক্ত প্রতিবস্তু পাওয়া গেলে কি ক্রমশঃ তার বৃদ্ধি হলে রোগ নির্ণয়ের

ব্যাপারে অনেক সাহায্য হয়। ঠিক অনুরূপ রোগ নির্ণয় মূল্য 'O' স্ট্রেপ-টোলাইসিন প্রতিবস্তুর।

যে বীজাণুগুলির জন্য পুঁজ হয়, তাদের সম্পর্কে একটু আলোচনা দরকার।

ষ্টাফাইলোকক্কাস

গ্রাম রঞ্জক গ্রহণ করে এই বিন্দু সদৃশ বীজাণুগুলির, পরিমাপ μm, আঙ্গুরের থলো বা গুচ্ছ আকারে একসঙ্গে থাকে। এদের ঘেরাটোপ বা ক্যাপসুল থাকে না, কি স্পোর হয় না।

এদের চাষে বাঁচিয়ে রাখা সহজ। তার জন্য যে মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, তাও খুব সাধারণ। এদের প্রয়োজন অক্সিজেনের। কিন্তু তার অভাবেও এরা বেশ মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকে। রক্ত দেয়া আছে, এম আগার পেলে, 37°C উত্তাপে, চকচকে একটু উঁচু উঁচু কলোনি এ বীজাণু তৈরি করে থাকে। এর একটা হলদে-সাদা রংও আছে। কোন বিশেষ শ্রেণী লাল রংও তৈরি করে। বিভিন্ন রং অনুযায়ী, সাদা হলে এলবাস, হলদে হলে অরিয়াস আর সাধারণভাবে পায়োজেনিস বলা হয়।

কোয়াগুলেজ বলে একটি বিশেষ অনুঘটক আছে, যা থ্রম্বিনের মত রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে দেয়, ক্যালসিয়ামের সাহায্য ছাড়াই। এলবাস ছাড়া অন্য ষ্ট্যাফইমো জীবাণুতে এটা তৈরি হয়।

এই বীজাণুর শ্রেণীবিভাগ অনেক ক্ষেত্রে করা হয় ফাজের সাহায্যে। বিশেষ ফাজ বিশেষ বীজাণুকে যেন গলিয়ে দেয়। অবশ্য কোন কোন ফাজের একাধিক ধরনের বীজাণুকে আক্রমণ করার ক্ষমতা আছে। যে নম্বরের ফাজে যে বীজাণু নষ্ট হয়, সেই অনুযায়ী বীজাণুর শ্রেণীবিভাগ হয়। এর মধ্যে ফাজ 80 শ্রেণীর যে বীজাণু তা মারাত্মক।

টক্সিন বা বিষবস্তু ঃ এই বীজাণু একাধিক রকমের বিষবস্তু সৃষ্টি করে। এর মধ্যে আলফা (α) টক্সিন বলে যে বিষবস্তু আছে, তা বিভিন্ন কলার মৃত্যুর জন্য দায়ী। শিরার মাধ্যমে এ বিষবস্তু শরীরে প্রবিষ্ট হলে প্রাণীর মৃত্যু সম্ভব। রক্তের শ্বেতকণিকা ও লোহিতকণিকাগুলি, এই বিষবস্তুতে নষ্ট হয়। এজন্য হিমোলাইসিডিন ও লিউকোসিডিন বলা হয়।

তিনটি বিশেষ অনুঘটকও এই বীজাণু সৃষ্টি করে : (1) কোয়াগুলেজ, (2) ষ্ট্যাফাইলোকাইনেজ ফিব্রিনকে দ্রবীভূত করে (3) হায়ালুরোনিডেজ।

এ ছাড়া কোন বীজাণু খাদ্যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে, এণ্টেরোটক্সিন বলে একটি বিষবস্তু দিয়ে। এটি উত্তপসহ।

ষ্টাফাইলোকক্কাসের ক্ষত

প্রায় বর্তুলাকারে স্ফীত, পুঁজে ভর্তি, যে স্ফোটক বা ফোড়া আমরা দেখতে অভ্যস্থ, তার সৃজনের মূলে আছে ষ্টাফাইলোকক্কাস। অনেকেই বলেন যে কোয়াগুলেজ অনুঘটকের জন্যই বীজাণু সংক্রমণ সীমাবদ্ধ জায়গায় থেকে যাচ্ছে। আবার কারো মতে, এই অণুঘটকের মোড়কের রক্ষাধীন থেকে বীজাণুরা দূর পর্যন্ত ছড়াতে পারে। তবে ∝ টক্সিন বিষবস্তুর জন্যই স্থানীয় প্রদাহস্ফীতি ঘটে ও সেইজন্য অংশগ্রহণকারী কোষগুলি এসে, সংক্রমণকে সীমাবদ্ধ রেখে, তা দূর করার চেষ্টা করে। খোস থেকে কার্বাঙ্কল পর্যন্ত বহুবিধ চর্ম সংক্রমণের কারণ এই বীজাণু। এগুলির কোনটা চামড়ার কোন স্তর অবধি গেছে, সেই অনুযায়ী বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়।

কার্বাঙ্কলে চামড়ার নিচে চর্বির স্তর অবধি পৌছয় উপরের সংক্রমণ। পেশীর উপরে যে তন্তুজাতীয় আচ্ছাদন আছে, তাতে ভাগ ভাগ করা আছে। এই কার্বাঙ্কলে একটি একটি করে অনেকগুলো মুখ, পর পর হতে থাকে।

হাসপাতালে সার্জারির পর, সেই ক্ষতের সর্বপ্রধান সংক্রমণকারী এই ষ্টাফাইলোকক্কাস বীজাণু। স্তনের বোঁটায় ফাটল থাকলে, তার মধ্যে সংক্রমণ হয়ে স্তনের স্ফোটক হতে দেখা যায়।

আন্ত্রিক রোগ ও ষ্টাফাইলোকক্কাস জনিত নিমোনিয়াও রোগ এক জায়গা থেকে অন্যত্র সংক্রমণের ফলে হয়।

অস্থিতে প্রদাহজনিত যে রোগ যাকে অষ্টিওমাইলাইটিস বলে, সে রোগের কারণও এই বীজাণু। চামড়ায় যে বীজাণু আছে, সেই বীজাণুই আঘাত লাগা অস্থিকে আক্রমণ করে। কখনো অস্থির বিশেষ জায়গায় বিস্ফোটকের আকারে, এই ক্ষত সীমাবদ্ধ থাকে, তখন একে বলে ব্রোডির স্ফোটক।

বৃক্কের ভিতরও ষ্টাফাইলো বীজাণু কার্বাঙ্কলের সৃষ্টি করে থাকে।

রক্তে বীজাণুর অনুপ্রবেশে প্রাণ সংশয়কারী সেপ্টিসিমিয়ার ও রক্তে তথাকথিত পাইমিয়ার সৃষ্টি করে।

কোয়াগুলেজ অনুঘটক তৈরি করতে অক্ষম, এমন বীজাণু ষ্টাফাইলো এলবাস স্বাভাবিক অবস্থায় রোগ সৃষ্টিতে অপারক। তবে শরীর জখম থাকলে সুবিধা বুঝে এ বীজাণু আক্রমণ করতে পারে।

ষ্ট্রেপটোকক্কাস

গোল গোল বিন্দুর মত, এই বীজাণুগুলিও গ্রামে রঞ্জক পদার্থে রঞ্জিত হয়। ষ্টাফাইলো বীজাণুর চেয়ে একটু ছোট এ বীজাণুগুলি, একটির সঙ্গে একটি শিকলের মত সাজানো থাকে। শিকলের আকারে বেশী করে থাকে, যখন চাষ করার মাধ্যমটি কোন তরল পদার্থের হয়। এরা গতিশীল নয়। স্পোরও তৈরি করে না।

চাষে অক্সিজেন আবশ্যিক। তবে তার অভাবেও বাঁচা সম্ভব। রক্তমিশ্রিত আগারে 37°C উত্তাপে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্বচ্ছ কলোনি করে বংশবৃদ্ধি করে। স্বচ্ছ হবার কারণ, লোহিতকণিকাগুলি ভেঙ্গে যাওয়া। এই ক্ষমতা অনুযায়ী ষ্ট্রেপটো হিমোলিটিকাস অথবা এ ক্ষমতা অল্প যাদের, তাদের ষ্ট্রেপটো ভিরিডানস ও এ ক্ষমতা একেবারে না থাকলে, তাদের ষ্ট্রেপটো এ্যালবাস বলা হয়। এর মধ্যে কয়েক ধরনের বীজাণু মানুষের ক্ষেত্রে মারাত্মক নয়। কেবল হিমোলিটিকাস বীজাণুই মারাত্মক।

ষ্ট্রেপটোকক্কাসের শ্রেণীবিভাগ

ল্যান্সফিল্ড এই বীজাণুদের, তারা যে শর্করাকে নিজস্ব বস্তুর সংযুক্ত হ্যাপটেন হিসাবে ব্যবহার করে, সেই অনুযায়ী 15টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই উপাদানটিকে C-বস্তু (C-antigen),—যা বীজাণুদেহের বহিরাংশে থাকে—বলে অভিহিত করা হয়।

গ্রিফিত আবার, ষ্টাফাইলোকক্কাস যেমন বিশেষ কাজের সাহায্যে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে, তার বদলে, বিশিষ্ট প্রতিবস্তু আছে, এমন রক্তরসের (anti sera) সাহায্যে শ্রেণীবিভাগ করে 50টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এর মূলে M ও T বলে অভিহিত, বীজাণুদেহের বহিরাংশের বস্তুকে (antigen) রেখেই করা হয়েছে। এই বিভাগ করতে হলে, বিশিষ্ট প্রতিবস্তু আছে, এমন বিশিষ্ট রক্তরস দরকার হয়। এই বিভাগ অনুযায়ী দেখা গেছে, যে 12 শ্রেণীর বীজাণু বৃক্কের নেফ্রাইটিস রোগের জন্য দায়ী।

বিষ (Toxin) উৎপাদন

ষ্টাফাইলোকক্কাসের মত ষ্ট্রেপটোকক্কাসেও অন্তর্বিষ যেমন আছে, তেমনি আছে একটি বহির্বিষ। লোহিতকণিকা নষ্ট করার ক্ষমতা সমন্বিত দুটি বিষ ষ্ট্রেপটোলাইসিন-O, আর ষ্ট্রেপটোলাইসিন-S, এর মধ্যে প্রথমটি শ্বেত-কণিকাও যেমন নষ্ট করে, তেমনি তা হৃৎপিণ্ডেরও বিষ। অন্তর্বিষের রাসায়নিক চরিত্রের স্বরূপ এখনও জানা নেই। শ্বেতকণিকা বীজাণুকে গ্রাস করতে উদ্যত হলে, এই অন্তর্বিষই বীজাণুর পক্ষে প্রতিরোধ করে বীজাণুকে বাঁচায়।

এ ছাড়া এই বীজাণুর হায়ালুরোনিডেস, ষ্ট্রেপটোকাইনেজ ও ষ্ট্রেপটো-ডরনেজ ইত্যাদি অনুঘটক প্রস্তুতির ক্ষমতা আছে। শেষোক্ত অনুঘটকটি ডি-এন-একে ভাঙ্গে। নামটিও এই জন্যই। স্কারলেট জ্বরে যে লাল লাল দাগ হয় চামড়ায়, তা এ বীজাণুর বহির্বিষেরই ফল।

তথাকথিত সেলুলাইটিস বা সর্বকোষ প্রদাহ, যাতে ব্যাপক ও মারাত্মক প্রদাহস্ফীতি হতে দেখা যায়, তাতে ছড়িয়ে পড়াটা সম্ভব হয় হায়ালুরোনি-ডেজ ইত্যাদি অনুঘটকের জন্য। চামড়ায় এ ধরনের প্রদাহস্ফীতিকে ইরি-সিপেলাস বলে।

কলা বা কলার অংশবিশেষ, মরেও যেতে পারে এই বীজাণুর আক্রমণে। তখন তাকে গ্যাংগ্রিন বলে।

গলা ও কানে এ বীজাণু মারাত্মক প্রদাহস্ফীতির জন্য দায়ী।

ফুসফুস আক্রান্ত হলে ষ্ট্রেপটোকক্কাস-জাত নিমোনিয়া হয়। এর ফলও মারাত্মক। 1918 সালে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রভাবে যে হাজার হাজার লোক মারা গিয়েছিল, তার মূলেও ছিল এই বীজাণুকৃত নিমোনিয়া। প্রসবের পরও সেকালে, যখন বর্তমানের ওষুধপত্র ছিল না, তখন এই বীজাণু সংক্রমণে হাজার হাজার প্রসূতির মৃত্যু হত।

অন্ত্রের গ্রামরঞ্জক গ্রামের বিপরীত রঞ্জকগ্রাহী বীজাণু

এণ্টেরো-ব্যাক্‌টিরিয়া, অর্থাৎ অন্ত্রদেশের বীজাণু, এই নামেই এ বীজাণু-কুলের নাম। এর মধ্যে পুঁজ সৃষ্টি করে এমন বীজাণু হল এস্কেরিয়া, ক্লেব-সিয়েলা, এরোব্যাক্টর, সাইটোব্যাক্টর, প্রোটিয়াস ইত্যাদি। অন্যদিকে

সালমোনেলা পর্যায়ের কোন কোন বীজাণু টাইফয়েড রোগের জন্য দায়ী। শিগেলা বীজাণু দায়ী আমাশয়ের জন্য।

এ বীজাণুগুলি কাঠির মত। লম্বায় 1-4 মিলিমাইক্রন।

37°C উত্তাপে এদের চাষ হয়। প্রয়োজন হলে অক্সিজেন ছাড়াও বাঁচতে পারে। রক্তমিশ্রিত আগার মাধ্যমে, 3-5 mm পাশুটে রংয়ের কলোনি তৈরি করে। একাধিক কলোনি, এক হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। একে সোয়ার্মিং বা বিচরণ বলে। এর মধ্যে সুডোমোনা পায়োসাইনিয়া সবুজ কলোনি তৈরি করে। এদের বিশেষ গন্ধ আছে।

রাসায়নিক দিক থেকে, এই শ্রেণীর সব বীজাণুই কোন না কোন শর্করাকে (চিনি) আক্রমণ করে গেঁজিয়ে দিয়ে, কোন না কোন গ্যাস তৈরি করে। যেমন কোলাই ল্যাক্টোজ শর্করাকে ভেঙ্গে এ্যাসিড ও গ্যাস তৈরি করে। ম্যাক্‌কঙ্কির চাষের মাধ্যমে আগারের প্লেটে ল্যাকটোজ শর্করা ব্যবহার করলে কোলাই লাল করে দেয়। অন্য বীজাণুতে লাল হয় না। এ লাল হয় বিশেষ রঞ্জকের জন্য।

এর মধ্যে কোলাই বীজাণু অন্ত্রের স্বাভাবিক বাসিন্দা। তা ছাড়াও থাকে প্রোটিয়াস ও পায়োসাইনিয়া।

রোগ সম্ভাবনা ঃ রোগ উপসর্গের জন্য দায়ী হল, এ বীজাণুর অন্তর্বিষ। বীজাণু দেহ থেকে বার হয়ে এ বিষ অন্ত্রের ভিতরে উপস্থিত থেকে রক্তনালিকা আক্রমণ করা থেকে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বিবিধ উপসর্গের সৃষ্টি করে।

এস্কেরিয়া কোলাই ও অনুরূপ বীজাণু ঃ কোন জায়গায় অন্য বীজাণুর সংক্রমণ ঘটলে, সুবিধা বুঝে, সেখানে কোলাই বীজাণু বাসা বাঁধে। যেমন যদি এ্যাপেণ্ডিক্স বা মলদ্বারে ফোড়া হয়, সেখানে স্ফোটকের স্বাভাবিক বীজাণু ছাড়াও কোলাই বীজাণু অধ্যুষিত দেখা যায়। তবে অবশ্য, কোলাই বীজাণুর সর্বাধিক আক্রমণ হয় প্রস্রাবের ইন্দ্রিয়ে, ইউরেটার ও বৃক্কের সংযোগস্থলে। এখানে অনেক সময়েই বীজাণু প্রবেশ করতে পায়, প্রস্রাব করানোর জন্য ক্যাথেটার প্রয়োগের সুযোগে। অনেক সময় এই বীজাণু পিত্তকোষকে আক্রমণ করে। এ পথে যকৃতের তথাকথিত পোর্টাল রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমেই পৌছনো সম্ভব হয়। এ বীজাণুর নৈকট্যভুক্ত ক্লেবসিয়েলা নিমোনি, ফুসফুসে খুব মারাত্মক নিমোনিয়ার জন্য দায়ী।

সুডোমোনা পায়োসায়নিয়া ঃ সবুজ রংয়ের পুঁজ প্রস্তুতকারী এই

বীজাণুর আক্রমণ ক্ষমতা, উপরোক্ত বীজাণুর মত। তাই আলাদা করে বলার নেই। তবে যে কোন ক্ষত এমনকি চোখও, এই বীজাণু আক্রমণ করে থাকে। শিশুদের অবশ্য বি-কোলাইয়ের জন্য পেটের অসুখ হয়ে থাকে।

নিমোকক্কাস ঃ একে দ্বৈতবীজাণু (diplo-coccus) বলা হয়, কারণ ষ্ট্রেপটো বীজাণুর খুব কাছের হলেও এরা ভিন্ন। এ বীজাণুর গড়ন বাদামের মত। গ্রাম রঞ্জকগ্রাহী। এরা সচল নয়, স্পোর হয় না, ও শরীর ঘিরে ঘেরাটোপের মত ঢাকনা থাকে। তাকে কেপসুল বলে।

ষ্ট্রেপটো হিমেলিটিকাসের মত রক্তমিশ্রিত আগার মাধ্যমে এ বীজাণু রক্তকণিকা ভেঙ্গে কলোনির চারিপাশ সবুজ স্বচ্ছতা সৃষ্টি করে। কলোনিগুলিকে চেকার খেলার বোর্ডের মত দেখায়। এরা পিত্তরসে দ্রবীভূত হয়।

এ বীজাণুর শ্রেণীবিভাগ করা হয়, এদের শরীরে শর্করাজাতীয় বস্তু, যা হ্যাপটেন হিসাবে কাজ করে, তারই উপর ভিত্তি করে। সহজদ্রাব্য এই বস্তুর উপরেই কোন বীজাণু কতটা মারাত্মক হবে, সেটা নির্ভর করে। বিশেষ ক্যাপসুলের বিশিষ্ট প্রতিবস্তু, যা খরগোসকে ইঞ্জেকশান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তা ঠিক সেই বিশিষ্ট বীজাণুর উপর প্রয়োগ করলে বীজাণুর আচ্ছাদক দ্রবণশীল কেপসুল ফুলে ওঠে। এইভাবে 70/75 রকমের বীজাণুর শ্রেণীবিভাগ করা গেছে। এর মধ্যে 1, 2, 3, সবচেয়ে মারাত্মক। তবে আজকাল প্রতিবস্তুর সাহায্যে চিকিৎসা উঠে গেছে বলে, এই শ্রেণীবিভাগের মূল্য কমে গেছে।

নিমোনিয়া

স্বাস্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্কদেরই এ রোগ (ফুসফুসের লোব বা অংশের) হয় বেশী। সে জায়গায় শিশুদের হয় শ্বাসনলীর ছোট ভগাংশগুলিতে (ব্রঙ্কো নিমোনিয়া)।

নিঃশ্বাসের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটে। নিমোকক্কাস বীজাণু একবার ফুসফুসের অভ্যন্তরে পর্যন্ত ঢুকতে পারলে, সেখানে প্রদাহস্ফীতি হতে দেখা যায়। যদি শরীরের ভিতরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাল হয়, তা হলে এর বেশী আর কিছু হয় না। তা না হলে, প্রদাহ শোথের পর্যায়ে পৌছে যায়। আর তা ফুসফুসের একাংশে সীমাবদ্ধ না থেকে সর্বাংশে ছড়ায়। এই রকম অপেক্ষা-

ক্রুত গুরু প্রদাহ হলে, তার সঙ্গে এলার্জিও দেখা যায়। এ ছাড়া স্থানীয়-ভাবে এই বীজাণু মস্তিষ্কের যে আচ্ছাদন, তার অথবা হৃৎপিণ্ডের আচ্ছাদনের প্রদাহ সৃষ্টি করে। গাঁটে গাঁটে প্রদাহও হতে দেখা যায়। মৃত্যুর কারণ অবশ্য বিষক্রিয়া। রোগ আক্রমণের হপ্তাখানেকের মধ্যে রক্তে প্রতিবস্তু দেখা দেয়। রক্তে প্রতিবস্তু বৃদ্ধির সঙ্গে শ্বেতকণিকারা বীজাণুগুলিকে সহজে গ্রাস করে নিলে রোগ ও জ্বর আকস্মিকভাবে কমে যায় (crisis)। তা না হলে চারটি ধাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এগুলি হল :

1. **প্রদাহজনিত শোথ :** এই স্তরে বায়ুকক্ষের (alveolus) রক্ত-নালিকাগুলি ফুলে ফুলে ওঠে। ম্যাক্রোফাজ কোষ ও বহুনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট শ্বেতকণিকা নিয়ে জায়গাটি রসসিক্ত হতে দেখা যায়। এই রস ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে থাকে, বায়ুকক্ষের কোষগুলির মধ্যের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে। তখন তাতে থাকে অজস্র নিমোকক্কাস।

2. **রক্তবর্ণ হয়ে যকৃতের রূপ ধারণ :** রক্তনালিকার প্রদাহ থেকেই যায়। সেই সঙ্গে ফাইব্রিন জমা হয়ে সেখানটাকে যেন নিরেট করে তোলে। প্রচুর লোহিতকণিকা থাকায়, এর রংটা হয় লালচে, মরচের মত। তখন কাশির সঙ্গে লাল রংয়ের কফ ওঠে। ফুসফুসের মধ্যে তখন বাতাস যাবার জায়গা থাকে কমই। যকৃতের মতই দেখায় তখন ফুসফুসটা, তাই ওই নাম দেয়া হয়েছে।

3. **ধূসরবর্ণ ধারণ :** নিরেট, যকৃতের মত চেহারাটা তখনও থাকে। কিন্তু প্রদাহের জন্য নালিকাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। রক্তকণিকা ও বীজাণু এই স্তরে কমে গিয়ে মৃত ও মৃতপ্রায় শ্বেতকণিকা থাকে তখন অজস্র। এজন্য চেহারাটা এই রকম হয়। ফিব্রিন শুকিয়ে একটু টেনে গেলে, তখন রক্ত-চলাচল আবার সুরু হয়ে যায়।

4. **দ্রবীভবন :** এই পর্যায়ের কাজটা করে প্রধানতঃ ম্যাক্রোফাজ পর্যায়ের কোষ। ফিব্রিনকে দূর করা হয় খুব তাড়াতাড়ি। সব আবর্জনাই বায়ুকক্ষ থেকে দূর হয়ে যায়। পুঞ্জীভূত রস, ম্যাক্রোফাজ কোষ ইত্যাদি লসিকা নালিকার মধ্যে দিয়ে দূরীভূত হয়। ফুসফুসের শিকড়ের (hilum) যে লসিকাগ্রন্থী, সেগুলি বড় (hyperplasia) হয়ে ওঠে। কিছু রস, রক্ত সঞ্চালন মাধ্যমে দূর হয়।

ফিব্রিনের জন্য ফুসফুসের যে আচ্ছাদন, তারও প্রদাহ হয়। এ প্রদাহ,

তাড়াতাড়ি পরিষ্কার না হলে ফুসফুসের আচ্ছাদন, ফুসফুসের সঙ্গে আটকে থাকতে পারে।

পরবর্তি ফলাফল

সবচেয়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটে, তা হল, নিরঙ্কুশভাবে সেরে যাওয়া। খুব অল্প ক্ষেত্রে, ফিব্রিনটা থেকে গিয়ে ফুসফুসের অংশবিশেষ তন্তু-জাতীয় কলায় রূপান্তরিত হয়। আরো কম ক্ষেত্রে ফুসফুসে ফোড়া হতে পারে।

ব্রঙ্কোনিমোনিয়া

এখানে শ্বাসনালিকার ক্ষুদ্রতম অংশগুলিতে প্রদাহ হয়। তারপর অবশ্য পরস্পরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতে পারে। এই প্রদাহ শিশুদের হতে দেখা যায়। এ রোগের একাধিক ধরন আছে।

ভিতরভাগের যে রোগ, তাতে বীজাণু শ্বাসনলীর ভিতরের প্রাচীরই আক্রমণ করে। শ্বাসনলীর উপর দিকেই এ প্রদাহ সীমাবদ্ধ ও ততটা মারাত্মক হয় না। খুব কম কি খুব বেশী বয়স, অন্য কোন রোগে আক্রান্ত যারা, তাদেরই অল্প মারাত্মক এ বীজাণু আক্রমণ করে। বুকে যাদের কোন আঘাত লেগেছে তারাও এই ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়।

এই ধরনের স্বল্প মারাত্মক ব্রঙ্কোনিমোনিয়াতে রোগীর শারীরিক অবস্থা খারাপ না হলে ও চিকিৎসা হলে রোগী সেরে যায়।

অণুবীক্ষণে ব্রঙ্কোনিমোনিয়াগ্রস্থ ফুসফুসের ক্ষুদ্র শ্বাসনালিকাগুলি পুঁজে ভর্তি দেখা যায়।

ব্রঙ্কোনিমোনিয়ার ফলাফল হিসাবে, নিরঙ্কুশ সেরে ওঠা, তন্তুজাতীয় পরিবর্তন ও পুঁজ হয়ে স্ফোটিক হওয়া, পূর্ববর্ণনামত সবই হতে পারে।

বহির্বিভাগীয় বা বাইরে দিকে হয় যে ব্রঙ্কোনিমোনিয়া, তার ক্ষেত্রে আক্রমণকারী বীজাণু অনেক রকম হতে পারে। এ বীজাণুগুলি, ষ্টাফাইলো পায়োজেনিস, ষ্ট্রেপটো পায়োজেনিস, ক্লেবসিয়েলা নিউমোনি, পাস্তুরেলা পেষ্টিস, ব্যাসিলাস এনথ্রেসিস, ও মাইকোব্যাকটিরিয়াম টিউবারকুলোসিস ইত্যাদি বিবিধ বীজাণু হতে পারে।

এগুলির অনেকেই খুব মারাত্মক। বেশ প্রবল বিষক্রিয়া আছে। সেই অনুযায়ী ফলাফল কি ধরনের হবে, সেটা নির্ভর করে।

নাইসেরিয়া বীজাণু

গ্রাম রঞ্জক গ্রহণ করে না, এমন অনেকগুলি বীজাণু আছে। এর মধ্যে আছে নাইসেরিয়া ফ্যারিঞ্জিস, যা গলায় আক্রমণ করে। নাইসেরিয়া ম্যানেঞ্জিটাইডিস, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর আচ্ছাদনকে আক্রমণ করে ও নাইসেরিয়া গনোরি জননেন্দ্রিয়ে আক্রমণ করে থাকে।

বৃক্ক বা সীম অথবা বরবটির বীজের আকারের এই বীজাণুগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে, ঢুকে যাওয়া দিকগুলি থাকে পরস্পরের মুখোমুখী। এদের (ম্যানিঙ্গোকক্কাসের) আচ্ছাদন খুব পাতলা।

37°C উত্তাপে, রক্তমেশানো আগারে, এ বীজাণুর চাষ হয় সহজে। তবে গনোকক্কাসের জন্য শতকরা 5 ভাগ কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস দরকার হয়। রক্ত-আগারে লোহিতকণিকা ভেঙ্গে যেতে দেখা যায় না। ম্যানিঙ্গো-কক্কাস গ্লুকোজ ও মল্টোজ দুটি শর্করাকেই আক্রমণ করে, গনোকক্কাস কেবল গ্লুকোজকে আক্রমণ করে।

ম্যানিঙ্গোকক্কাসের শ্রেণীবিভাগ এখন আর খুব একটা প্রয়োজন হয় না।

মস্তিষ্কের আচ্ছাদনগুলি, যাকে ম্যানিঞ্জেস বলে, তাকে আক্রমণ করে প্রদাহস্ফীতির সৃষ্টি করে এই বীজাণু। বীজাণুর প্রবেশপথ নাসিকা। একঘরে ঘেঁসাঘেসি করে শোয়ার জন্য, একজন যে এ বীজাণুর বাহক, তার কাছ থেকে অন্য লোকের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ায়। মনে হয়, নাসাদেশের উপরি-ভাগে যে ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত প্লেটের মত অস্থি, যাকে ক্রিবিফরম প্লেট বলে, তাই ভেদ করে বীজাণুর আক্রমণ ঘটে। এর আরো কারণ, বীজাণু বিতাড়ণের উপযুক্ত, যে কেশের মত সিলিয়া শ্বাসযন্ত্রের অনেকখানি এলাকা জুড়ে রয়েছে, তা গন্ধগ্রহণ এলাকায় না থাকায় সংক্রমণ ঘটে।

তা ছাড়া রোগের প্রথমদিকে মারাত্মক বীজাণুর আক্রমণ সঞ্জাত বিষ-ক্রিয়া দেখা যায়। এ পর্যায়ে মৃত্যুও সম্ভব। তার পর বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি এ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থীতেও রক্ত ক্ষরণ হতে পারে।

সারা শরীরের বিষক্রিয়া অচিরে মস্তিষ্কের আচ্ছাদনে সীমাবদ্ধ হয় কেন তা জানা নেই। স্থানীয় প্রদাহে পুঁজও জমতে পারে। তবে মস্তিষ্কে

বীজাণু আক্রমণ হলেও তিনটি পর পর আচ্ছাদন আছে বলে বেঁচে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মস্তিষ্কে জল বেড়ে শোথের সৃষ্টি করে ও প্রদাহ স্ফীতি দেখা যায়। নিকাশনালিকা (cisternae)গুলি প্রদাহের ফলে বন্ধ হয়ে গেলে মস্তিষ্কের চারিপাশে জল জমার (hydrocephelus) জন্য অতিরিক্ত চাপে মৃত্যুও হতে পারে।

কখনো কখনো ম্যানিঙ্গোকক্কাস গ্রন্থীগুলিকে আক্রমণ করে প্রদাহ সৃষ্টি করে। ওঠা নামা করছে, এরকম জ্বর হয়ে ম্যালেরিয়া বলে ভুল হতে পারে।

গনোকক্কাস

যৌনব্যাধি গনোরিয়ার জন্য দায়ী গনোকক্কাস বীজাণু। পুরুষের প্রস্রাব-নালিতে পুঁজ নিয়ে এই রোগ দেখা দেয়। চিকিৎসা না হলে সংক্রমণ প্রষ্টেট, শুক্রথলিকা ও শুক্রনালিকা পর্যন্ত ছড়ায়। আরো বৃদ্ধি পেলে প্রস্রাব-নালি রুদ্ধ হয়ে যেতেও দেখা যায়। এর ফলে পুরুষের বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।

নারীদের রোগের আক্রমণটা যোনিদেশে না হয়ে মূত্রনালিকায় হতে দেখা যায়। এর কারণ হল, যোনির ভিতরটা এ্যাসিড ভাবাপন্ন। আর এ্যাসিডে এ বীজাণু জন্মাতে পারে না। তবে মূত্রনালির মধ্যে দিয়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে ভিতরে তলপেটের (pelvic) পেরিটোনিয়ামে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। এরপর ডিম্বসঞ্চারণ নালিকা (fallopian tube) নিরুদ্ধ হয়ে বন্ধ্যাত্ব দেখা যায়।

গনোকক্কাস সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। তবে সীমবদ্ধ ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের আচ্ছাদনে প্রদাহ সৃষ্টি করে। চোখের বহিরাচ্ছাদনে এই বীজাণু-জাত প্রদাহ অন্ধতা সৃষ্টি করে। তবে বর্তমানে এ্যান্টিবায়োটিকের জন্য এ রোগ হওয়া। গাঁটে গাঁটে এ বীজাণুর প্রদাহ সৃষ্টি কমে গেছে।

17 হাসপাতালে ও ক্ষতে বীজাণু সংক্রমণ

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, বেশ কিছুদিন হাসপাতালে অস্ত্রপচার বন্ধ রাখতে হয়। কারণ কি? টিটেনাস বীজাণু সংক্রমণ। এ ছাড়াও অবশ্য বীজাণু আছে, যেগুলির দ্বারা ক্ষত সংক্রমিত হয়। এগুলি হল স্ট্রেপটো ও ষ্টাফাইলো পায়োজেনিস, কিছু বীজাণু যা গ্রাম রঞ্জকবস্তু গ্রহণ করে না, এ রকম অন্ত্রের বীজাণু আছে। তাছাড়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ডিপথিরিয়া বীজাণুও ক্ষত সংক্রমণ করে থাকে। তবে এর চেয়ে মারাত্মক হল অক্সিজেন বিরোধী কিছু কিছু বীজাণুর সংক্রমণ (anaerobic)।

তথাকথিত ক্লসট্রিডিয়া প্রজাতীর বীজাণুরা অক্সিজেনে জন্মাতে পারে না, সেই অর্থে এদের অক্সিজেন বিরোধী বলা যেতে পারে। এই প্রজাতীর সবচেয়ে মারাত্মক বীজাণু হল টিটেনাস ও গ্যাস-গ্যাংগ্রিন বীজাণু। এই বীজাণুগুলি হলঃ ক্লসট্রিডিয়া ওয়েলসাই, ক্লঃ টিটেনাই, ক্লঃ বটুলিনাম ইত্যাদি।

ক্লসট্রিডিয়ার বীজাণুতত্ত্ব

এ প্রজাতীর বীজাণু একটু বড়, অর্থাৎ পাঁচ মিলিমাইক্রন লম্বা কাঠির গড়নের বীজাণু। এ বীজাণু স্পোর উৎপাদন করতে পারে। জীবন ধারণের পরিবেশ যতই কঠিন হয়ে ওঠে, ততই স্পোর তৈরির মাধ্যমে এদের বংশানুক্রমণ বজায় রাখতে হয়। এগুলি সচল; কোন ঘেরাটোপ থাকে না; কেবল ক্লঃ ওয়েলসাইয়ের ঘেরাটোপ থাকে; তারাও সচল নয়।

চাষের জন্য 37°C উত্তাপ ও অক্সিজেনবিহীন আবহাওয়াতে, রক্তদেয়া আগারে এরা বেশ বেঁচে বংশবৃদ্ধি করে। এ আবহাওয়া বজায় রাখার জন্য ফিল্ডের কি ম্যাকানটোসের বিশেষ ধরনের জার ব্যবহার করা হয়। রবার্টসনের রান্না করা মাংসের মাধ্যমে এ বীজাণুর চাষ সম্ভব।

রাসায়নিক দিক থেকে কয়েকটি বীজাণু ল্যাকটোজ, গ্লুকোজ ইত্যাদি শর্করাকে গাঁজাতে সক্ষম। আর কোন কোন বীজাণু প্রোটিনকে ভেঙ্গে হাইড্রোজেন সালফাইডে পরিণত করতে পারে।

এই বীজাণুর বিশিষ্ট বিষক্রিয়া আছে। এ বিষক্রিয়া শরীরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়ায়। ক্লসট্রিডিয়া বীজাণু কোন কোনটি মানুষের পক্ষে বিষাক্ত, আবার অন্য কতকগুলির বিষক্রিয়া অন্য প্রাণীর পক্ষে মারাত্মক। বিষকার্যে হিমো-লাইসিন, কোয়াগুলেজ ইত্যাদি বস্তু থাকার ফলে রক্তকণিকা ভেঙ্গে যায় অথবা রক্ত জমাট বেঁধে যায়। আবার কিছু বীজাণুর বিষে পেশীতে খিঁচুনি ও স্নায়ুকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ করে দেয়, বিশেষ দুটি ধরনের বস্তুর জন্য।

এই বীজাণুর স্পোর মাটিতে ছড়ানো অবস্থায় থাকার জন্য, কোন অংশ কেটে ছড়ে গেলে, মাঠে ঘাটে যাবার সময়, এ বীজাণু দেহে অনুপ্রবেশ করতে পারে। এ জন্য পূর্বাহ্নে সাবধান হতে হয়।

গ্যাস গ্যাংগ্রিন

এই রোগের বীজাণুর স্পোর কোন ক্ষতের মধ্যে দিয়ে অনুপ্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে। তবে যত লোক এ রোগে আক্রান্ত হতে পারত, দেখা যায় হয় তার চেয়ে কমই। এর কারণ হয় যে, স্পোরকে অঙ্কুরিত হতে হলে, অক্সিজেন একেবারেই থাকা চলবে না। এরকম অবস্থাটা পুরোপুরি পায় না বলেই সব স্পোর অঙ্কুরিত হতে পারে না। তবে বলা বাহুল্যই যে, গভীর ক্ষত এই কারণেই অপেক্ষাকৃত মারাত্মক।

গ্যাস গ্যাংগ্রিন কোন একটিমাত্র বীজাণু সংঘটনে ঘটে না। এতে থাকে একাধিক রকমের বীজাণু। এগুলি ওয়েলসাই, সেপ্টিকাম, হিষ্টোলিটিকাম ইত্যাদি জাতের। এ বীজাণুর বিষক্রিয়ায় শরীরের বিভিন্ন কলার মৃত্যু ঘটতে পারে। এটি যদি ঘটে, দুর্গন্ধ হয়ে ক্ষতের মধ্যে থেকে, গ্যাসের বুদবুদ বার হতে দেখা যায়।

অন্য কলার চেয়ে মাংসপেশীই নষ্ট হয় বেশী। কারণ এক ধরনের বীজাণু আছে, যা পেশীকেই আক্রমণ করে। পেশীর শর্করা আক্রমণ করতে পারে এই বীজাণু। কলার গঠন ভাঙ্গা সম্ভব হয় কোলাজেনেজ, হায়ালা রুনিডেজ, ইত্যাদি অনুঘটকের সাহায্যে। ফলে ধ্বংসক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

স্থানীয় কলার মৃত্যু হবার সঙ্গে, অবিলম্বে পচনক্রিয়া সুরু হয়ে যায়। কারণ পচন সংঘটক ক্লসট্রিডিয়াম অনেকগুলি এক সঙ্গেই কাজ করতে থাকে। কলার মৃত্যু ও তার সঙ্গেই পচনকে গ্যাংগ্রিন বলে। আর সেই সঙ্গে গ্যাস

বার হতে থাকে বলে এই রোগ ও সংঘটক বীজাণুদের গ্যাস গ্যাংগ্রিন বীজাণু নাম দেয়া হয়েছে।

রোগের সঙ্গে বিষক্রিয়া ও রক্তাল্পতা দেখা দেয়, ও এর জন্য মৃত্যুও হয়। রক্ত পরীক্ষায় বহুনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট কোষের আধিক্য সাধারণ সংক্রমণের মত হয় না।

পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, ইত্যাদি এ্যান্টিবায়োটিকের কল্যাণে বর্তমানে চিকিৎসা ও প্রতিষেধ সহজ হয়েছে।

টিটেনাস

টিটেনাস বীজাণুর স্পোর বিভিন্ন ক্ষত আক্রমণ করতে পারে। আর অঙ্কুরিত হবার জন্য তাদেরও প্রয়োজন হয়, কঠোর অক্সিজেনবিহীনতা। খুব সামান্য ক্ষত থেকেও টিটেনাস হতে পারে।

কখনো হয়ত, সার্জারি করতে গিয়ে, অভ্যন্তরে টিটেনাসের স্পোর বাহিত হয়ে, রোগ সংক্রমণের কারণ হয়ে ওঠে। নবজাতকের কাটা নাড়ীর মধ্যে সংক্রমণ ঘটে, টিটেনাস হয়ে অনেক শিশুর মৃত্যু হয়। সেপটিক গর্ভপাতের পর, অনেকক্ষেত্রেই টিটেনাস হতে দেখা যায়।

টিটেনাস রোগের আক্রমণ হয় স্নায়ুতে ; মস্তিষ্ক ও বৃহত্তর স্নায়ুগুলিতে। এ বীজাণুর বহির্বিষ অনায়াসে মৃত্যু ঘটাতে পারে। এ বিষ নিষ্কাষিত হয়ে মস্তিষ্ক অভিমুখে স্নায়ুর মধ্যে মধ্যে যে জায়গা আছে, সেখান দিয়ে চলে যায়। প্রত্যেক নিউরোণে, যাতে কোন উত্তেজক অতিমাত্রায় না যেতে পারে, সেজন্য একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকে। এই বীজাণুর বিষ সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা নষ্ট করে। তার জন্য পেশীতে পেশীতে অতিসঙ্কোচন (spasm) দেখা দেয়।

এ রোগের সুপ্তাবস্থা কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ হতে পারে। সুপ্তাবস্থা যত কম হয়, রোগ তত মারাত্মক।

রোগের সূচনা হয় কয়েকটি পেশীর অতি সঙ্কোচনের মধ্যে দিয়ে। বিশেষ করে, মুখের কয়েকটি পেশী ও চোয়ালের পেশী এই অতি সঙ্কোচনে আটকে থাকার জন্য, মুখ খোলা অবধি যেন অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে টিটেনাস সংক্রমণ অনেকটা স্ট্রিকনিনের বিষক্রিয়ার মতই চিত্র দেয়। মৃত্যুও এ রোগে ঘটে শ্বাসযন্ত্রের পেশীর অক্সিজেনের অভাবে।

টিটেনাসের নিরোধ ঃ এখনো পর্যন্ত টিটেনাস নিরোধের সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হল প্রতিষেধক টীকা। এ টীকা তৈরি করা হয় এ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইডে বিষকে গ্রহণ করে (adsorbed)। আট সপ্তাহ অন্তর একটির পর একটি দুটি টীকা নিলে ও তার ছ'মাস পরে তৃতীয় ডোজ। তিন বছর পরে একটি উদ্দীপক (booster) টীকা নিতে হয়।

যাদের টীকা নেয়া নেই, তাদের এ্যান্টিটিটেনাস সিরাম (ATS) বা টিটেনাস বিরোধী রক্তরস নিতে হয়। তথাকথিত রক্তরস বা এ্যান্টিসিরাম তৈরি করা হয় ঘোড়ার শরীরে ইঞ্জেকশান দিয়ে। ফলে যেটা হতে দেখা যায়, তা হল অনেকেই সিরাম বা রক্তরস প্রদত্ত এ্যালার্জির শিকার হয়ে ওঠে। এজন্য যাকে ইঞ্জেকশান দেয়া হবে, সে অতিসংবেদনশীল কিনা, সেটা দেখার জন্য চামড়ার নিচে একফোঁটা এই সিরাম ইঞ্জেকশান দিয়ে দেখে নিতে হয়। সব লোকই একবার সিরাম দেয়া হয়েছে বলে, সমান সংবেদনশীল হয়ে ওঠে না। এইজন্য সর্বদাই পরীক্ষা করে নেয়া উচিত। অনেকের শরীরে ঘোড়ার প্রোটিন বিরোধী প্রতিবস্তু শরীর থেকে সহজেই নিষ্কাষিত হয়ে যায়। এইসব ভেবে বর্তমানে পেনিসিলিন প্রমুখ এ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগটাই বেশী হচ্ছে। টেট্রাসাইক্লিনেও টিটেনাসের আরোগ্য সম্ভব।

হাসপাতালে সাধারণতঃ যে সব বীজাণু ও যে ধরনের সংক্রমণ দেখা যায়, তার আলোচনায় এবার আসছি। আগে মনে করা হত, সংক্রমণে ভগবানের হাত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতেই ভিয়েনায় সোমেলভাইস ও বোষ্টনে হোমস দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে অপরিচ্ছন্ন হাতের জন্যই শিশুজন্মের পর মাতা সংক্রমিত হয়। আবার এক নবজাতক থেকে অন্য নবজাতকে কোলাই, সালমোনেলা, সিগেলা জাতীয় বীজাণুর আক্রমণে পেটের অসুখ হয়। এই রকম, সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ষ্টাফাইলোকক্কাস, ষ্ট্রেপটোকক্কাস, ইত্যাদি ক্ষত সংক্রমণে দায়ী।

ষ্টাফাইলো পায়োজেনিস

এই বীজাণুর ডিপো বলা যায় নাসারন্ধ্র। এখান থেকে এ বীজাণু আসছে হাতে। হাত ও মলদ্বারের কাছাকাছি জায়গায় এ বীজাণু সহজে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এ জায়গা থেকে কাপড়, বিছানা ইত্যাদি সংক্রমিত হয়। এমনকি এসব থেকে হাওয়াও এ বীজাণু বহন করতে পারে।

কোথাকার বাতাস কত বীজাণু বহন করছে, এ বোঝার একটি উপায় হল প্লেটের সাহায্যে। যে কালচার প্লেট থেকে বোঝা যাবে, কতখানি এলাকায়, গড়ে কত ও কি কি বীজাণুর সংক্রমণ হচ্ছে। অন্য উপায় হল, একটি ফালির মত ফাঁক দিয়ে বাতাস টেনে নিয়ে, তা প্লেটে চাষ করা। এতে একটি ঘন বর্গ জায়গার বীজাণুর হিসাব মেলে।

টাইপ-80 ষ্টাফাইলোকক্কাস সবচেয়ে মারাত্মক। আর তা ছড়িয়েও পড়ে মারাত্মক দ্রুততার সঙ্গে। অনেকগুলি এ্যান্টিবায়োটিকে সাড়া দেয় না। এক জন থেকে আর একজনের ক্ষতে ছড়িয়ে এ বীজাণু নিজেদের স্থায়িত্ব রক্ষা করে।

ষ্ট্রেপটো পায়োজেনেস

এ বীজাণুর ডিপো গলদেশ, যাদের নাকেও এ বীজাণু থাকে। তারাই সংক্রমণে সাহায্য করে। এ বীজাণু চামড়ায় বেশীক্ষণ বেঁচে থাকে না। তবে, মারাত্মক পোড়া ঘায়ে বীজাণুর আক্রমণ সহজ হয়।

গ্রাম রঞ্জক বিরোধী বীজাণু

ইঃ কোলাই ও প্রোটিয়াস বীজাণু অন্ত্রে থাকার জন্য, অনেক ক্ষতই সংক্রমণ করে। রোগীর নিজদেহের বীজাণুতেই এ সংক্রমণ ঘটে। যেমন ই. কোলাই ইত্যাদি বীজাণু স্বাভাবিকভাবে মূত্রাশয়ের নিচের দিকে থাকে। প্রস্রাব করানোর জন্য ক্যাথেটার দেবার সময়, এই বীজাণু মূত্রথলীতে ও পরে ইউরেটার পর্যন্ত সংক্রমণ করে।

স্যুডোমনা পায়োসাইনিয়া ষ্ট্রেপটোর মত সহজে মরে না। তাই ক্ষত সংক্রমণ এদের পক্ষে সহজ। ক্ষত ছাড়া নবজাতকের চোখও এ বীজাণুর দ্বারা সংক্রমিত হয়।

আড়াআড়ি বা ক্রশ সংক্রমণ

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে বা অপরেশান থিয়েটারে রোগীদের মধ্যে পারস্পরিক সংক্রমণ হতে প্রায় দেখা যায়।

আড়াআড়ি সংক্রমণের কারণঃ বলা যায় এর তিনটি কারণ।

(1) সার্জেন বা তার সহকারীর ছোঁয়াচ থেকে ; (2) বায়ুর মাধ্যমে ; (3) যন্ত্রপাতি যদি সংবাহক হয় বীজাণুর।

সার্জেনের ক্ষেত্রে, তার হাত বা শরীরের অন্য অংশ থেকে যেমন এই সংঅমণ ঘটতে পারে, তেমনি নাসিকা থেকে অতি সহজেই সংক্রমণ ঘটে। সমস্ত রকমের সার্জিক্যাল বিধৌতি সত্ত্বেও চামড়ার লোমকূপের ভিতর বীজাণু থেকে যেতে পারে। তাছাড়া যদি ঘাম হয়, তার মাধ্যমে বীজাণু তো এসে যেতেই পারে। হাঁচি বা কাশি না হলে, নাক থেকে সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা কম।

হাওয়া থেকে আসতে পারে, যদি ঘরে অনেক দর্শক থাকে, তাদের কাছ থেকে। তারা পরিশুদ্ধ পোষাক পরে থাকলেও এ সম্ভব।

যন্ত্রপাতির পরিচ্ছন্নতার কোন বৈলক্ষণ্যই সংক্রমণের কারণ হতে পারে।

এইসব কারণে আজকাল তৈরির সময়েই এমনভাবে অপারেশান থিয়েটার তৈরি করা হয়, যাতে সংক্রমণের সম্ভাবনা না থাকে। এর জন্য ওয়ার্ড থেকে একটু বাইরেই তৈরি করা হয়। অমনিই একটু স্বতন্ত্র হবে হাত ধোবার জায়গা। স্বতন্ত্র বটে, তা হলেও কাছে। দেয়ালগুলি হবে এমন জিনিসে তৈরি যা ধোয়া চায়, চকচকে পালিশ, যাতে বীজাণু আশ্রয় করতে না পারে। মেঝেও হতে হবে অনুরূপ। বাতাস থাকবে একটু উচ্চচাপে ও তা বীজাণুশূন্য হয়ে ফিল্টারের মাধ্যমে প্রবেশ করবে।

যাদের ফুসকুড়ি কি ব্রণ এসব থাকবে, অপারেশান থিয়েটারে তারা ঢুকবে না, কারণ এর ফলে ষ্টাফাইলোকক্কাসের সংক্রমণ হতে পারে। দর্শকদের টুপি, মুখোস ও বীজাণুহীন জুতা থাকবে।

ওয়ার্ডে অনুরূপ সংক্রমণ

ওয়ার্ডে একাধিক রোগী। এই জন্য কোন রোগী যার সংক্রমণ গুরুতর, তাকে আলাদা রাখা আবশ্যক। দেখা করতে যারা আসছে, তাদের সম্পর্কেও সাবধান হতে হবে। তাছাড়া ড্রেসিং বদলেও খুব সাবধান হতে হবে।

18 টিউবারকুলোসিস, সিফিলিস ইত্যাদি

পূর্ব অধ্যায়ে যে ধরনের সংক্রমণের কথা বলা হল, সেগুলি মারাত্মক ও তাৎক্ষণিক পর্যায়ের (acute)। এগুলির সঙ্গে তাই, টিউবারকুলোসিস বা সিফিলিসের মত দীর্ঘস্থায়ী (chronic) সংক্রমণের তফাৎ আছে।

তথাকথিত মারাত্মক সংক্রমণের বীজাণুগুলিতে নির্দিষ্ট অন্তর্বিষ বা বহির্বিষ একটা বা একাধিক সংখ্যায় থাকে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণে সে রকম কিছু জানা নেই। তাই মনে হয়, এসব রোগের ক্ষতির ধরনটা কোষ মাধ্যমে এক ধরনের এ্যালার্জির সৃষ্টি করে। এই সংবেদনশীলতা তাৎক্ষণিক নয়, দীর্ঘস্থায়ী। এর প্রভাব এ্যালার্জিক চর্মের রক্তনালিকার প্রদাহে প্রতি-ফলিত হয়। কুষ্ঠ রোগে এটা খুব দেখা যায়।

তাছাড়া, তাৎক্ষণিক সংক্রমণের পরে দীর্ঘস্থায়ী অনাক্রম্যতা ও শরীরে পরীক্ষায় ধরা পড়ে, এমন প্রতিবস্তু দেখা যায়। দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণে পরীক্ষায় দেখা যায়, এমন প্রতিবস্তু—যা রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে—তা হলেও এই প্রতিবস্তু অনাক্রম্যতাদায়ক হয় না।

এই সংক্রমণ সারা শরীর জুড়ে হলে তার জন্য জ্বর ইত্যাদি হতে পারে। তথাকথিত মিলিয়ারি টিউবারকুলোসিসে এই ছবি দেখা যায়।

টিউবারকুলোসিস

মাইকোব্যাকটিরিয়াম টিউবারকুলোসিসের বহু রকমফের। গো-টিউবার-কুলোসিস বলে যা অভিহিত, তার মনুষ্য সংক্রমণের ক্ষমতাও প্রসুপ্ত অবস্থায় থাকে। পাখীদের সংক্রমণ করে যে বীজাণু, তার মানুষেও সংক্রমণ হতে পারে। ইঁদুরজাতীয় পশুর রোগ সৃষ্টি করে, এমন বীজাণু BCG বীজাণুর পরিবর্তে টীকা দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

সংক্রমণ ঘটে এমন বীজাণু বায়ুর মাধ্যমে নিঃশ্বাসে ফুসফুসে নীত হয়ে। বীজাণুবাহক কফ শুকিয়ে বীজাণু বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে। নিঃশ্বাস ছাড়াও রক্তে ও খাদ্যনালীতে ঢুকেও বীজাণুর অনুপ্রবেশ সম্ভব।

বীজাণুতত্ত্বঃ কাঠির মত লম্বা লম্বা এ বীজাণু 3 মিলিমাইক্রন লম্বা।

মোমের মত গাত্রাবরণ থাকে বলে এরা কোন রঞ্জক সহজে গ্রহণ করে না। তবে গরম করলে কারবল ফুক্‌সিন রঞ্জক হিসাবে নেয়। তার পর আর এ্যাসিড বা এ্যালকোহলে ধুলেও এ রং ওঠে না। তাই এ বীজাণু এ্যাসিড প্রতিরোধক বলে বলা হয়। গ্রাম ষ্টেন গ্রাহক, তবে অতিকষ্টে তা নেয়।

খুব জটিল মাধ্যম ব্যবহার করে দীর্ঘ সময় নিয়ে তবেই এ বীজাণুর চাষ হয়। মাধ্যমে ডিমের হলদে ও গ্লিসিরল থাকাটা আবশ্যিক। লাওওয়েন-ষ্টাইন-জেনসেন (Lowenstein-Jensen) মাধ্যমে 37°C-তে ছয় সপ্তাহে এ বীজাণু জন্মায়। গিনিপিগকে এ বীজাণু আক্রমণ করে। আর সেটা ল্যাবরেটারি পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়। প্রাণীটাকে মেরে তার প্লীহা ও শরীরের অন্য অঙ্গে টিউবারকুল সৃষ্ট হয়েছে কি না, দেখা হয়। এ বীজাণু শুষ্কতা প্রতিরোধ করতে পারে। শুকনো ধূলোয় মাসের পর মাস বেঁচে থাকতে পারে।

বেশ কয়েক ধরনের অস্বাভাবিক মাইকোব্যাকটিরিয়াম আছে। এর মধ্যে আবার কিছু আছে, যা রঞ্জকপদার্থ সৃষ্টি করে।

চর্ম সংক্রমণ: মাইকোব্যাকটিরিয়াম টিউবারকুলোসিস যে চামড়াকে আক্রমণ করে রোগ সৃষ্টি করে আর সে রোগের নাম, লুপাস ভালগারিস। তবে টিউবারকুলোসিস ছাড়া এই মাইকোব্যাকটিরিয়া পর্যায়ে আরো বীজাণু আছে, যা চামড়ায় আক্রমণ চালায়। মাইকোব্যাকটিরিয়াম আলসারান্‌স, মাইকোব্যাকটিরিয়াম বালনাই ইত্যাদি চামড়ায় শুষ্ক ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।

টিউবারকুলোসিসের বিকার চিত্র

1. প্রথম চিত্রটি একটি মারাত্মক প্রদাহের। এখানে বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষের ভিড়। তবে বীজাণুরা এ কোষগুলিকে মেরে ফেলে।

2. তার পর আসে ম্যাক্রোফাজ কোষ। এরা স্থানীয় হিষ্টিওসাইট অথবা রক্তের মনোসাইট থেকে উদ্ভূত। এই কোষ বীজাণুগুলিকে নষ্ট করতে পারে।

3. এই ম্যাক্রোফাজগুলিও বদলে গিয়ে এদের সাইটোপ্লাজম ইয়োসিন রঞ্জকের ভক্ত হয়ে ওঠে। তাদের নিউক্লিয়াসগুলিও লম্বাটে ও ফোস্কা ধরা

(vasicular) মতন হয়ে যায়। এই সময় দেখতে অনেকটা চামড়ার কোষের মত দেখায় বলে এদের এপিথিলয়েড কোষ বলে।

4. কিছু কিছু ম্যাক্রোফাজ এপিথিলয়েড কোষ না হয়ে একসঙ্গে মিলে ল্যাঙ্গহান বর্ণিত রাক্ষুসে কোষ হয়ে ওঠে।

5. এগুলির চারিদিক ঘিরে থাকে ছোট ছোট গোল কোষ, যেগুলি লিম্ফোসাইট কোষ ও ফাইব্রোব্লাষ্ট।

6. দশ বারো দিনের মধ্যে এই কোষগুলি যেখানটা ঘিরে আছে, সেখানের কোষগুলি মরে গিয়ে মাঝখানটায় শক্ত হয়ে যাওয়া পুঁজের মত একটা জায়গার সৃষ্টি করে। এটা চিজের মতন বলে, চিজের মত হওয়া বা কেজিয়েশান নামেই অভিহিত হয়। চিজের মত এই এলাকাতে চর্বি বা তৈলজাতীয় বস্তু থাকে প্রচুর। এই জায়গায় রৌপ্যের লবণ প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে সেখানে রেটিকুলিন তন্তু রয়েছে প্রচুর।

বীজাণুজনিত এ্যালার্জির ফলে চিজের মত বস্তুর উদ্ভব। এ্যালার্জির কারণ বীজাণুপ্রোটিন। এই পরিপূর্ণ চিত্রকেই বলে টিউবারক্ল্ বা টিউবারক্ল্ গুটি। এর মধ্যে থাকে চিজের মত বস্তু। তাকে ঘিরে রাক্ষুসে কোষ বা এপিথিলয়েড কোষ। তাকে ঘিরে ছোট ছোট গোলাকার কোষ। এই ছবিকেই টিউবারকুলোসিসের ছবি বলা হয়। এ ছবি কোন কোন ছত্রক আক্রমণেও দেখা যায়। টিউবারকুলোসিস বলে প্রমাণ করতে হলে, উপযুক্ত রঞ্জক পদার্থ (Ziehl-Neelson) প্রয়োগ করে বীজাণু দেখাতে হয়।

টিউবারকুলোসিস বীজাণুর ভিন্ন প্রতিক্রিয়া : প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে। সেটা আক্রান্তের প্রতিরোধ ও বীজাণু ও আক্রান্তের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।

নিস্থতিমূলক (exudative) প্রক্রিয়া : যথেষ্ট ফাইব্রিন আছে, এ ধরনের রস নিঃসরণও কোন কোন ধরনের টিউবারকুলোসিসে দেখা যায়। এই ধরনের প্রতিক্রিয়ায় লিম্ফোসাইটের প্রাচুর্য যেমন দেখা যায়, তেমনি এপিথিলয়েড ও রাক্ষুসে কোষের অভাবটাও লক্ষণীয়। তবে বহুনিউক্লিয়াস আছে এমন কোষ থাকে। শরীরের যে সব জায়গায় স্বাভাবিক রস নিঃসরণ হয়, সেই জায়গায় এই ধরনের রোগ দেখা যায়। টিউবারকুলোসিস বিরোধী ওষুধের পূর্বযুগে, ফুসফুসের আচ্ছাদন প্লুরায় এ ধরনের প্রদাহ যথেষ্ট দেখা যেত।

এই ধরনের রোগ মারাত্মক। কেন না, এ রোগের প্রসার অপেক্ষাকৃত দ্রুত। যকৃত, বৃক্ক, ইত্যাদি অঙ্গে এই ধরনের রোগ দেখা যায়।

ফুসফুসেও কখনো কখনো এই ধরনের বিকার দেখা যায়। একে মারাত্মক কেজিন-বস্তু নিবিক্ত টিউবারকুলোসিস বলে। এ প্রদাহে ব্রঙ্কোনিমোনিয়ার ছবি দেখা যায়। শ্বাসনলীর বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর অংশ, চিজের মত বা কেজিনসদৃশ বস্তুতে ভরে যায়। সারা শরীরে এর ফলাফল মারাত্মক। এই ধরনের রোগ যেন লাফিয়ে (galloping) এগোয়।

দীর্ঘস্থায়ী টিউবারকুলোসিস রোগে, রোগীর রোগ প্রতিরোধ অনেকটা আছে বলে, কিছু বীজাণু প্রথমে মরে যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে তন্তুজ কলার মাধ্যমে মেরামতির কাজও চলতে থাকে। তবে এরও আবার রকমফের আছে। সেগুলি হল, কেজিনের মত বস্তুর মাধ্যমে, কেজিন ও তন্তুজাত বস্তুর সহ-সমাবেশ, শুধু তন্তুজাতীয় বস্তু দিয়ে। শেষের ধরনটায় দেখে রোগ বোঝা যায় না। পুরো ফুসফুস বা তার অনেকখানিই কুঁকড়ে তন্তুসৃষ্ট বস্তুর মত হয়ে যায়। এতে শ্বাসনালিকার অন্তভাগের বিশেষ প্রদাহের সৃষ্টি হয়, যাকে ব্রঙ্কিয়েকটেসিস (bronchiectesis) বলে।

একরকম টিউবারকুলোসিস আছে, তাকে প্রতিক্রিয়াহীন ধরনের (non reactive) বলে চিহ্নিত করা হয়। এখানে কেজিনের মত বস্তু ভর্তি ও যাতে অজস্র বীজাণু, ও কোষ যা থাকার কথা, তার চেয়ে কমই থাকে। বৃদ্ধ মানুষ, যাদের অস্থি মজ্জার কোষের মারাত্মক সংখ্যাল্পতা ঘটেছে, কি রক্তের কোন কোন ধরনের বৈলক্ষণ্য থাকলেও ঘটে। এ ধরনের টিউবারকুলোসিস খুবই বিপদের।

টিউবারকুলোসিসের ফলাফল

চিজ বা কেজিনের মত যে ক্ষত, সেখানে তন্তুজাতীয় কলা জন্মে সেটা সেরে যেতে পারে, না হলে তরল হয়ে রোগটা ছড়ায়।

সেরে যাবার চিহ্ন হল তন্তুজাতীয় কলা তৈরি হওয়া। ক্ষতের চারিধারে যে ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষ থাকে, তারাই তন্তুকলা তৈরি করে। কেজিনের মত বস্তুটিও তন্তুতে পরিণত হতে পারে। তা না হলে এটি শক্ত হয়ে চুণা বা ক্যালসিয়ামে পরিণত হয়। তবে এ রকম চুনের মত শক্ত মাধ্যমেও বীজাণু

বেঁচে থাকে ও আশ্রয়দাতার শরীর যখম হয়ে পড়লে, বীজাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে। তা না হলে সেখানটা অস্থিতে রূপান্তরিত হয়।

না সারার চিহ্ন হল কেজিন অবস্থাতেই ক্ষতটা থাকা ও তা নরম হওয়া ও ছড়ানো। ম্যাক্রোফাজ কোষের সাহায্যেই বীজাণুরা লিম্ফগ্রন্থীতে পৌঁছে নতুন কেন্দ্রের সূচনা করে। তবে কেজিন বস্তুও ভেঙ্গে তরল করা সহজ নয়। কারণ এতে ফসফাটিড থাকে। কি করে যে ভাঙ্গার ব্যাপারটা ঘটে ঠিক জানা নেই।

পাতলা হয়ে গেলে সেই অবস্থাকে শীতল স্ফোটক (cold abcess) বলা হয়। এর ভিতরের তরল বস্তুকে ঠিজ পুঁজ বলা যায় না, কেননা পুঁজের বিশিষ্ট কোষ এখানে থাকে না। স্থানীয়ভাবে, ব্যথা বা উত্তাপ, কিছুই এখানে থাকে না। ফুসফুসে এরকম স্ফোটক থাকলে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় রোগ ছড়ায় কাশির মাধ্যমে বীজাণু স্থানান্তরে গিয়ে।

অনেক সময়ে এই তরল রস বার হবার জন্য সুড়ঙ্গপথ তৈরি করে নেয় (sinus)। এ সুড়ঙ্গের চারিদিকে টিউবারকুলার দানাদার কলা (granulation tissue) থাকে। এখানে ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষ, ম্যাক্রোফাজ কোষ ইত্যাদি থাকে। পেশীর পথ ধরে তা বহুদূরে যেতে পারে। যেমন কোমরের শিরদাঁড়ার হাড় থেকে সেয়াসে পেশী ধরে পায়ে। বাইরের সঙ্গে সংযোগ হয়ে গেলে এ সুড়ঙ্গ মারাত্মক হয়ে ওঠে, কারণ বহিঃসংক্রমণ ঘটতে পারে।

টিউবারকুলোসিস কি করে ছড়ায়

স্থানীয়ভাবে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়।

লিম্ফ সংবাহনের মাধ্যমে। এতে লিম্ফ গ্রন্থীগুলি স্ফীত হতে দেখা যায়, শিশুদের টিউবারকুলোসিসে যেমন হয়। এর মধ্যে প্রথম আক্রমণটিকে বলা হয় যে, এটি প্রাথমিক বিকার (primary complex)। এখন মনে করা হয় যে, সব প্রাথমিক বিকার হয় ফুসফুসে।

রক্ত সংবহনের মাধ্যমে তখনই ছড়ায়, যখন লসিকানালিকা ও গ্রন্থীগুলি ভরে যায়। এই ধরনের আক্রমণে সারা শরীরে ছড়ান অজস্র জায়গায় (milliary) ছড়ানো থাকে এই আক্রমণ। বিভিন্ন প্রত্যঙ্গেই অজস্র ছোট ছোট ফোকাস বা টিউবারক্ল কেন্দ্র থাকে। এখানে ফুসফুসকে দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত মুক্ত। শিশু, অথবা রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা যাদের শরীরে

সৃষ্টি হয়নি, অথবা বিপর্যস্ত, তাদেরই এ রোগ হতে দেখা যায়। এই রকম সংক্রমণের ফলে মস্তিষ্কের আচ্ছাদনের প্রদাহ (meningitis) হতে দেখা যায়।

প্লুরা, পেরিটোনিয়াম ইত্যাদি জায়গার প্রদাহও এই সংক্রমণে হতে দেখা যায়।

কাশির মধ্যে দিয়ে শ্বাসনলীর উপর বা নিচের দিকে সংক্রমণ ছড়াতে পারে।

টিউবারকুলোসিস সংক্রমণের রূপ

বড়দের ক্ষেত্রে আর শিশুদের ক্ষেত্রে টিউবারকুলোসিসের ছবিটা একেবারে ভিন্ন। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই আক্রমণের প্রধান জায়গাটা হল ফুসফুস।

শিশুদের ঃ প্রাথমিক আক্রমণের জায়গাটা ছোট, ত্রিকোণাকৃতি, ফুসফুসের বাইরের দিকে হয়, মাঝামাঝি জায়গায়। এটা সাধারণতঃ সেরে যায়, আর তা না হলে ফুসফুসের হাইলাম বা শিকড়ের গ্রন্থীতে চলে যায়। এই গ্রন্থী খুব বড় হয়ে ওঠে, চিজের মত পুঁজে ভরে যেতে পারে। প্রথম আক্রমণের জন্য এই গ্রন্থী সেরে শক্ত চূণের মত জিনিসে পূর্ণ হতে পারে, অথবা ছড়িয়ে মিলিয়ারি ধরণের হয়ে মৃত্যুও সম্ভব।

আগে শিশুদের পেটেও এ রোগ হত। কারণ ছিল গরুর দুধ থেকে সংক্রমণ। মেসেন্ট্রির গ্রন্থী বড় হয়ে উঠলে, তখনই নজরে পড়ত। বলা হত টেবিস মেসেন্টেরিকা। সেরে না গেলে মিলিয়ারি ধরনের রোগ মারাত্মক হতে পারত।

কোন কোন ক্ষেত্রে টনসিলটাই হয়ে ওঠে প্রাথমিক চিহ্ন। এটা হয়ত নজরেই পড়ে না, যতক্ষণ না গলার অন্য জায়গার লসিকাগ্রন্থী বার বার ফুলে উঠে শেষ পর্যন্ত চামড়া দিয়ে রস পড়তে থাকে। মোটামুটি বলা যায়, শিশুদের টিউবারকুলোসিসে যেন লসিকাগ্রন্থী আক্রান্ত হবার চেষ্টাটা বেশী ও চামড়া ফুঁড়ে তার রস নিঃসরণ ঘটে। গিনিপিগেও এই রকম বহুলসিকা-গ্রন্থী আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

বড়দের ঃ বড়দের ক্ষেত্রে ফুসফুসের উপরের অংশেই আক্রমণটা হতে দেখা যায়। বাঁদিকের তুলনায়, ডানদিকটাই বেশী আক্রান্ত হয়। ফলাফল ঃ হয়ে সেরে যায়। তা না হলে রোগটা বেড়ে, সেই জায়গায় একটা গহ্বর

(cavity) সৃষ্ট হয়। এটা হয়, কেজিনের মত জায়গাটা নরম হয়ে সেই জিনিসটা বার হয়ে গেলে, সেই ফাঁকা জায়গাটাই গহ্বর হয়ে যায়। রোগীর কতটা প্রতিরোধ শক্তি আছে, তার উপরে নির্ভর করেই কতটা তন্তুজাতীয় কলা হবে, আর কতটা শুধু গহ্বরই হবে, সেটা নির্ভর করে। কোন বড় গহ্বরের পাশের কোন রক্তনালিকা ক্ষতিগ্রস্থ হলে, কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে থাকে। কেজিন জাতীয় বস্তু কাশতে কাশতে ক্ষুদ্রতর শ্বাসনলীর মধ্যে চলে গেলে, তার ফলে ব্রঙ্কোনিমোনিয়া হয়। বড় রকমের ফুসফুসের ক্ষতে মৃত্যুও হতে পারে।

অন্য প্রত্যঙ্গের ক্ষতের চেহারা হয়, এইরকমই। যেমন দেখা যায়, ইলিয়াসে বা অন্ত্রের অন্যত্র।

বৃক্কের যে টিউবারকুলোসিস হয়, সে সংক্রমণ বৃক্কের বাইরের দিক থেকেই সুরু হয়। তারপর আস্তে আস্তে ভিতরটাও নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। সংক্রমণ টিবিউলগুলির ভিতর দিয়ে গিয়ে মূত্রনালিতে বা তার সূচনামুখে গহ্বরও সৃষ্টি করতে পারে। বা বৃক্কের টিউবারকুলার প্রদাহও হতে পারে। এমন কি দানাদার কলা জায়গাবিশেষে বাধা সৃষ্টি করলে, পুরো জায়গায় পুঁজ জমে যেতে পারে। একে পুঁজসংযুক্ত প্রদাহ বলে (pyonephrosis)।

অস্থিতে, তার মাঝামাঝি জায়গায় সংক্রমণ হতে দেখা যায়। অস্থির সংযোগস্থলের তরুণাস্থিও সহজে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একে অস্থির টিউবারকুলার প্রদাহ (tubercular osteomylitis) বলে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে অস্থির প্রদাহ শৈশবের টিউবারকুলোসিমের পরের ধাপ বলেই ধরা হয়। কেননা, বড় বয়সে হলে তা ফুসফুসেই থাকার কথা।

প্রাথমিক ও পরবর্তী টিউবারকুলার সংক্রমণ না বলে, শৈশবের ও বয়স্কদের টিউবারকুলোসিস বললে আরো ভাল বোঝা যায়।

টিউবারকুলোসিসের প্রসার

নানাবিধ আরোগ্য প্রদায়ক ওষুধপত্র আজ আমাদের হাতে, এমন কি টীকার কিছুটা উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও টিউবারকুলোসিস রোগের শেষ হয়েছে বলা যাবে না। দরিদ্র দেশগুলিতেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব। সেইজন্য আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ায় এ রোগ এত বেশী।

ইংল্যাণ্ডের মত উন্নত দেশে যে এ রোগ এখনো আছে, তার কারণ হল

যে কিছু বৃদ্ধ ও বয়স্ক লোক এ রোগে ভোগে বলে তারাই এ বীজাণুর বাহকের কাজ করে। তাদের থেকে অল্পবয়সী আগন্তুক, যাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম অথবা নেই, তাদের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে বলে, রোগটা টিকে থাকছে।

টিউবারকুলোসিস দমন

তিনটি পন্থা অবলম্বন করে টিউবারকুলোসিস নির্মূল করা যায়। এগুলি হল ঃ

জীবনযাত্রার সর্বাঙ্গীণ মান উন্নত করে। এর প্রভাব পুষ্টি থেকে সর্বত্র হওয়ায় প্রতিরোধকে সাহায্য করে।

চিকিৎসা ঃ অন্য রোগে যেমন, টিউবারকুলোসিসে সেই ধরনের সংবাহক (carrier) থাকে না, কেউই যারা নিজেরা না ভুগে, বীজাণু বহন করে অন্যকে আক্রমণ করতে সাহায্য করে। "খোলা" যে সব রোগী (open) তাদের কাশীর মধ্যে, হাঁচির মধ্যে, এমনকি কথা ইত্যাদির ভিতর দিয়েও হাজার হাজার বীজাণু ছড়ায়। রোগ নির্ণয় চিকিৎসার প্রথম অঙ্গ। সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে রোগগ্রস্থ কারা, তা নির্ণয় করার জন্য যে ক্ষুদ্র সার্বজনীন রঞ্জনরশ্মি চিত্রগ্রহণ সুরু করা হয়েছিল (mass miniature radiography) তার কাজ আজও শেষ হয়নি ; না তার সম্ভাবনা। আজকাল একের পর এক আরোগ্যকারী ওষুধ বার হয়েছে। তবে দরিদ্র দেশে যেটা সমস্যা হচ্ছে, তা হল দরিদ্র মানুষ, যত দীর্ঘকাল চিকিৎসা করানোর কথা, ততদিন করাতে পারছে না। এর ফলে, রোগের জড় থেকেই যাচ্ছে। অঞ্চলকে রোগমুক্ত করা, যা সম্পন্ন দেশে সম্ভব, তা আমাদের দেশে হচ্ছে না। এ ছাড়াও কয়েকটি দিক আছে।

পুষ্টিকর খাদ্য দেয়া, ও পরিবেশের উন্নতিসাধন, টিউবারকুলোসিসের চিকিৎসা ও দূরীকরণ এ দুয়েই অপরিহার্য।

ওষুধের মধ্যে ষ্টেপট্রোমাইসিনের পর, প্যারা-এ্যামাইনো-স্যালিসিলিক-এ্যাসিড (PAS), আইসোনিকোটিনিক-এ্যাসিড-হাইড্রাজাইড (isoniazid), ইথাম্বুটল, রিফ্যামপিসিন ইত্যাদি বহু ওষুধ বার হয়েছে ও হচ্ছে। রোগীর কফে বীজাণু নিঃসরণ বন্ধ হলেই রোগীকে তার বাড়ীতে রেখেই চিকিৎসা করা উচিত।

তা ছাড়া, যাদের ও যে পরিবেশে প্রাথমিক, অতি মৃদু আক্রমণে যেখানে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই, সেখানে বি-সি-জি টীকা অনাক্রম্যতা দেয়। অবশ্য বি-সি-জির পূর্ণ মূল্যায়ন হয়ে গেছে, এ কথা বললে বেশী বলা হবে।

সিফিলিস

সিফিলিস, যাকে উপদংশ বলা হত, সে রোগের সৃজনকারী পরজীবী প্রাণীকে ঠিক বীজাণু পর্যায়ে ফেলা যায় না। এগুলি স্ক্রুর মত পাকানো 10 মিলিমাইক্রন লম্বা। এগুলি কোন রঞ্জক পদার্থের রং গ্রহণ করে না বলে, অণুবীক্ষণের দৃষ্টির ক্ষেত্র অন্ধকার (dark ground illumination) করে দেখতে হয়। তাছাড়া প্রতিবস্তু প্রতিপ্রভ করেও (fluoresceat antibody technique) দেখা সম্ভব। তাছাড়া হিষ্টোলজির পদ্ধতিতে টিস্যু পাতলা করে কেটে রৌপ্যঘটিত পদার্থে রঞ্জন করে দেখা সম্ভব হয়।

ভাসারম্যান পরীক্ষা

ভাসারম্যান একটি বিশেষ ধরনের প্রতিবস্তু আবিষ্কার ও পরীক্ষা করে সিফিলিস রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতির সূচনা করেন। অবশ্য এই ধরনের প্রত্যক্ষ নয়, এমন প্রতিবস্তু রিয়াজিন নামে জানা ছিল। কমপ্লিমেণ্টের মাধ্যমে বস্তু-প্রতিবস্তুর পরীক্ষাগারে দর্শনীয় যোগাযোগ সাধন করা যায়। পরীক্ষণীয় প্রতিবস্তু তো রোগীর রক্তরসেই থাকে। আর বস্তুটি গরুর হৃৎপিণ্ডের থেকে নির্যাস হিসাবে বার করে নেয়া হয়। বস্তুটি হল ডাইসফ্যাটিডিল গ্লিসিরল। এই পরীক্ষাটিকে ভাসারম্যান টেষ্ট বলা হয়।

এছাড়া এক রকমের দানাদার বস্তু জমাট বাঁধা—যাকে ফ্লকুলেশান বা কান (kahn test) পরীক্ষা বলে, তাও রোগ নির্ণয়ের জন্য করা হয়। অনুরূপ পরীক্ষা ভিনিরিয়্যাল ডিসিজ রিসার্চ ল্যাবরেটারি (V. D. R. L.) পরীক্ষা বর্তমানে সর্বত্র চালু।

ভাসারম্যানের বস্তু কিভাবে কাজ কারে, তা এখনও জানা নেই। আর অন্য ট্রিপনিমার ক্ষেত্রে এ বস্তু কাজও করে না।

ট্রিপনিমার প্রতিবস্তু ঃ এমন প্রতিবস্তু আছে, যা অন্য ট্রিপনিমার বস্তুর সঙ্গে দর্শনীয় প্রতিক্রিয়া দেখায়।

ট্রিপনিমা প্রতিবস্তু

দ্বিতীয় স্তরের একরকম প্রতিবস্তু আছে, যার ট্রিপনিমা প্রোটিনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ট্রিপনিমার মধ্যে যে এক-ধরনের বস্তু, তারই প্রতিক্রিয়া।

একরকমের একটি বিশেষ ধরনের ট্রিপনিমা আছে, যাকে রিটার ষ্ট্রেন (Reiter's strain) বলে, তার প্রোটিন নিয়ে একটি পরীক্ষা করা হয়। একে বলে, রিটার প্রোটিন কম্‌প্লিমেণ্ট ফিক্সেসান টেষ্ট বলে (R. P. C. F.) এই ষ্ট্রেন ল্যাবরেটারিতে কালচার (চায়) করা যায়। এই পরীক্ষায় ভুলের সম্ভাবনা কম বলে সিফিলিসের এটি খুব ভাল পরীক্ষা।

ট্রিপনিমা ইম্মোবিলাইজেসান টেষ্ট (T. P. I.) ঃ এই পরীক্ষার বিষয়টি হল যে, যখন রোগীর রক্তে সিফিলিসের প্রতিবস্তু আছে, তখন সেই রক্তরসকে 18 ঘণ্টা কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়ে 37°C-তে রাখলে, তারপর সেই রক্তরসে ট্রিপনিমা আর চলাফেরা করতে পারে না। এই পরীক্ষা একটু দেরীতে দেখা যায়। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত থাকে।

ট্রিপনিমার প্রতিপ্রভ প্রতিবস্তু পরীক্ষা ঃ মনুষ্য গামাগ্লোবিউ-লিনের সঙ্গে প্রতিপ্রভ বস্তুর সংযোগ করে, তারই সাহায্যে পরীক্ষায় দুটি প্রতিবস্তু লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে একটি হল ট্রিপনিমা জাতীর বিরুদ্ধে আর অন্যটি হল ট্রিপনিমা পেলিডার বিরুদ্ধে। সিফিলিসে দু' ধরনেরই প্রতি-বস্তু দেখা দেয়।

সিফিলিস

রোগটি সর্বক্ষেত্রেই প্রায় রতিজাত। তবে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ঠোঁটে, জিবে বা আঙ্গুলে হতে দেখা যায়। খুব সহজেই জলে বা শুষ্ক হলে ট্রিপনিমার মৃত্যু হয়। রোগ হবার জন্য তাই খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রয়োজন। শরীরের প্রবিষ্ট হলে এর আক্রম্যতা সুদূরপ্রসারী। লসিকার মাধ্যমে লসিকাগ্রন্থী ও তারপর রক্তসংবাহনের মধ্যে দিয়ে অন্য জায়গায়। এইভাবে রক্তদাতার যদি সিফিলিস থাকে, তা গ্রহীতার দেহেও ছড়াতে পারে। এ রোগের তিনটি স্তর। এর আলোচনা প্রয়োজন।

প্রাথমিক অবস্থা ঃ ঘনিষ্ঠ সংযোগের তিন-চার সপ্তাহের মধ্যে, যাকে স্যাঙ্কার বলা হয়, (chancre) এইরকম ক্ষত হয়। এতে অবশ্য প্রথমে একটা

কোস্কা ও তারপর বেদনা নেই, এই রকম ঘা হয়। সেই সঙ্গে হয় লসিকা গ্রন্থীর যন্ত্রণাহীন প্রদাহ।

অণুবীক্ষণে লিম্ফোসাইট, প্লাজমাকোষ ও ম্যাক্রোফাজ চামড়ার নিচে জড় হতে দেখা যায়। চিকিৎসা না করলেও এই ক্ষত নিশ্চিহ্নভাবে শুকিয়ে যায়। ব্যথা না হওয়ার কারণ হিসাবে বলা যায়, যে অল্প সংখ্যক কোষ, ও স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে ব্যথা লাগে, এতটা রস বা তরলবস্তু জমা হয় না বলেই ব্যথা থাকে না।

কোন উপসর্গ দেখা দেবার আগে সিফিলিস রক্ত সংবহনে বহুদূর ছড়িয়ে যায়। এ জন্য একটা এ্যালার্জি বা সংবেদনশীলতার ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়। এই সংবেদনশীলতার ফল হিসাবেই দেখা দেয় স্যাঙ্কার ও আনুষঙ্গীক লসিকা-গ্রন্থীর প্রদাহ। সংবেদনশীলতা ছড়িয়ে পড়লে সুরু হয় মাধ্যমিক স্তর।

স্যাঙ্কার থেকে রস নিয়ে অনুকার করা ক্ষেত্রের কণ্ডেনসার লাগানো অণুবীক্ষণে স্পাইরোকিট দেখা যায়। রক্তরসে ভাসারম্যান পরীক্ষাও খুব প্রয়োজন।

মাধ্যমিক অবস্থা (Secondary Stage)ঃ প্রথম যখন ইউরোপে সিফিলিস এলো, তার ভয়াবহতা এত বেশী ছিল যে বসন্ত রোগের নাম ছিল স্মল পক্স, আর সিফিলিসকে বলা হত বিগ পক্স। এর মানে, মাধ্যমিক অবস্থায় মুখে, হাতে ও শরীরের অন্য জায়গায় যে গুটি বার হয়, সেগুলির ভিতর পুঁজ থাকে না, লাল কি অন্য রংয়ের হয়। যেখানে মিউসিন নিঃসরণ হয়, সেখানে কণ্ডাইলোমা এই নামের আঁচিলের মত গুটি হয়। জ্বর, পেশীতে ব্যথা, গাঁটে ব্যথা, ঐ সবও মাধ্যমিক অবস্থায় দেখা যায়।

মাধ্যমিক স্তরে রক্তরসের পরীক্ষা অর্থাৎ ভাসারম্যান পরীক্ষায় রোগ ধরা পড়ে। এ স্তরে কণ্ডাইলোমা থেকে রোগবীজাণু পাওয়া সম্ভব।

সিফিলিসের তৃতীয় (tertiary) **স্তর**ঃ এই স্তরে রোগ আক্রমণের দু-তিন বছরের মধ্যে পৌছয়। এই অবস্থায় বিভিন্ন কলার নষ্ট হবার দিকটাই বেশী। চলতে পারে পনেরো কুড়ি বছর ধরে। এর দুটি রূপভেদ। একটিকে বলে গামা। অন্যটির প্রকাশ কলা বিনষ্টির মধ্যে দিয়ে।

গামা (gumma)ঃ স্থানীয় ও এককভাবেই এগুলি হতে দেখা যায়। ধ্বংস যথেষ্ট হলেও, দেখে কোন্ জায়গার সেই কলা, বোঝা যায়। যে জায়গাটা নষ্ট হয়েছে, তাকে ঘিরে থাকে লিম্ফোসাইট, প্লাজমা কোষ,

ম্যাক্রোফাজ। তন্তুসৃজনকারী ফাইব্রোব্লাষ্ট থাকে এসব থাকে। টিববার-কুলোসিসের তুলনায় এখানে রাক্ষুসে কোষ কম থাকে। যকৃত কি পুং অণ্ডকোষে এ কোষ দেখা যায় বেশী। বিভিন্ন অস্থিতে, এমনকি মুখের অভ্যন্তরের তালুতে (palate) ছেঁদা হতেও দেখা যায়। কলাবিনষ্ট হয় এ্যালার্জির মত অতি সংবেদনশীলতার জন্য। কখনো কখনো গামার দেয়াল থেকে বীজাণু বার করা সম্ভব হয়।

স্নায়ুকলার হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালিকার উপর সিফিলিসের প্রভাব অসামান্য। মহাধমনীর aorta উঠতি অংশ জখম হয় প্রথম। লিম্ফোসাইট ও প্লাজমা কোষ প্রথমে ধমনীর বাইরের আচ্ছাদনকে আক্রমণ করে। মাঝের আচ্ছাদন নষ্ট হয়ে যাবার জন্য ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়। এর ফলে ধমনীর বেশীর ভাগ নষ্ট হয়ে প্রাণঘাতী রক্তপাতের সূচনা করতে পারে।

সিফিলিস জনিত মহাধমনীর প্রদাহে ধমনীর মাঝের আচ্ছাদনটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে ও এই জাতীয় প্রদাহশূন্য স্থায়ী স্ফীতি হতে পারে যাকে এ্যানিউরিজম (aneurism) বলা হয়। মহাধমনী যেখানে হৃৎপিণ্ড থেকে বার হয়ে আসছে, সেখানকার স্ফীতির জন্য রক্ত সঞ্চালিত হতে গিয়ে যেন ফিরে আসে (regargitation)। হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব রক্তসঞ্চারী ধমনীতে সিফিলিসে সঙ্কোচনের ফলে মারাত্মক অবস্থা হতে পারে।

স্নায়ুতে সিফিলিসের ফলাফল অতি সুদূরপ্রসারী। এর প্রকাশ ঘটতে পারে, বিকৃত মস্তিষ্কের সঙ্গে পক্ষাঘাতের সমন্বয়ে। এ রোগে মস্তিষ্কের সামনের দিক থেকে রোগবীজাণু পাওয়া যেতে পারে। ঐ ছাড়া যাকে টেবিজ (tabes dorsalis) বলে, তাতে স্নায়ুর পশ্চাৎভাগের উৎপত্তিস্থল, অর্থাৎ স্নায়ুর শিকড়গুলি জখম হয়। একটি তন্ত্র ও আর একটি স্নায়ুতন্ত্রের মাঝে ইলেকট্রিক তারের মত সংবহনবিরোধী (insulation) যে বস্তু থাকে, সেই বস্তু সিফিলিসে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

সিফলিসের প্রদাহে অস্থিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অস্থির আচ্ছাদন পেরি-অষ্টিয়ামে প্রদাহ হয়ে লম্বা হাড়গুলিতে, অস্বাভাবিক অস্থি তৈরী হয়ে যেতে পারে স্থান বিশেষে। এর জন্য অস্থির স্বাভাবিক গঠনশ্রী নষ্ট হয়।

এই স্তরে রোগ নির্ণয় কতকটা রোগলক্ষণ দেখে আর কতকটা বিভিন্ন ল্যাবরেটারি পরীক্ষায়।

জন্মগত সিফিলিস ঃ চিকিৎসা হয়নি, এমন মার মাধ্যমে ভ্রূণেও এ

রোগসঞ্চার হতে পারে। তিন-চার মাস গর্ভাবস্থায় ফুলটা নষ্ট হয়ে গিয়ে, ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নষ্ট হয়ে না গেলে, বহুবিধ শারীরিক ত্রুটি, যেমন হাচিনসন বর্ণিত সামনের দাঁতের ত্রুটি, চর্ম, অস্থি, যকৃত, ইত্যাদি জায়গায় সিফিলিস ঘটিত দানাদার কলার জন্যই এ সব ত্রুটি দেখা যায়।

অণুবীক্ষণে, সিফিলিসের বর্ণনা অনুযায়ী যে চেহারা, তাই দেখা যায়। কোন কোন জায়গায় চেহারাটা হয় গামার মত।

রোগ নির্ণয় পিতা, মাতা ও শিশুর রক্ত পরীক্ষা করেই করা হয়।

অনাক্রম্যতা ও প্রতিরোধ

শরীরে ট্রিপনিমা থাকলে আর নতুন আক্রমণ হয় না। তবে একটি ক্ষত পরিস্ফুট না হওয়া অবধি, আর একটি আক্রমণ হয়ে দ্বিতীয় ক্ষত হওয়া সম্ভব। কোন উপসর্গ না হয়ে শরীরে বীজাণু বাস করা সম্ভব। এটা প্রাণীদের শরীরেও হতে পারে। বিনা চিকিৎসায় সেরে গেল, এমন হয় না। তবে শরীরের প্রতিরোধ শক্তি বেশী থাকলে, দীর্ঘদিন কোন উপসর্গ দেখা না দিতে পারে। তৃতীয় স্তরে, বিভিন্ন কলায় বীজাণু থাকতে পারে, যেমন চোখের সামনেকার স্বচ্ছ আধারে। প্রতিরোধ যে জোরদার হয় না, তার কারণ উপযুক্ত গ্লোবিউলিন তৈরী হয় না শরীরে।

এ রোগ এখন কমার দিকে। ও সেটা সারা পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র লক্ষণীয়।

একটিনোমাইকোসিস

গবাদি পশুর মুখ ও পা স্ফীত হয়ে এক রকমের অসুখ, বহুকাল থেকে জানা সে রোগের বীজাণু বিবিধ একটিনোমাইসিস জাতীয় বীজাণু।

এ বীজাণু গ্রাম রঞ্জক গ্রহণ করে। এ বীজাণুনিচয় সুতোর মত লম্বা হতে পারে, যা থেকে ডালপালার মত বার হয়, বা এক একটি লাঠির মত লম্বা লম্বা বীজাণু হিসাবেও থাকে। বর্তমানে এদের বীজাণু বলেই মনে করা হয়, যা একটিনোমাইসেটিসি পর্যায়ের বীজাণু বলে ধরা হয়। এই পর্যায়ে মাইকোব্যাকটিরিয়া, একটিনোমাইসিস, নোকার্ডিয়া ও ষ্ট্রেপটো-মাইসিস পড়ে। লম্বা হয়ে সুতোর মত একটি আর একটির গায়ে গায়ে লেগে থাকে বলে এই জাতীয় বীজাণুকে ছত্রাক বলেই অনুমান করা হত।

প্রাণীদেহেও ছত্রাক সদৃশ সূত্র সৃষ্টি করে এরা জন্মায়। জন্মাবার সময়

হলদে গন্ধকের গুঁড়োর মত দানা দেখা দেয়। রোগ সৃষ্টিকারী একটিনো-মাইসিস অক্সিজেন পছন্দ করে না। রক্তসংযুক্ত আগার ইত্যাদি মাধ্যমে 37°C উত্তাপে জন্মায়।

রোগ নির্ণয়, বীজাণু দেখার চেয়ে তথাকথিত গন্ধকের গুঁড়ো নিঃসরণ ও রোগলক্ষণ দেখেই করা হয়ে থাকে।

মুখ, টনসিল ইত্যাদি জায়গায় এ বীজাণু থাকে। যেমন থাকে ঘাসে, যেখান থেকে গরু সংক্রমিত হয়। পুঁজ সৃষ্টিকারী প্রদাহ হিসাবে রোগ সুরু হয়। একাধিক স্ফোটক হয়ে অনেকটা মৌমাছির চাকের মত দেখায়। এ রোগ প্রত্যক্ষ সংযোগ না হলে হয় না। লসিকার মাধ্যমে এ রোগ ছড়াতে পারে না; তার কারণ লম্বা লম্বা সূত্রগুলি লসিকাবাহক নালিকার মধ্যে দিয়ে চলাচল করতে পারে না।

বিভিন্ন এ্যান্টিবায়োটিকের জন্য এর চিকিৎসা সহজ হয়ে গেছে। ভারতের মাদুরায় পায়ে এ রোগ দেখা যেত। একে বলা হত মাদুরারোগগ্রস্থ পা (Madura Foot)।

19

কয়েকটি বিশেষ প্রদাহ

বিভিন্ন রকমের প্রদাহ নিয়ে পূর্ব অধ্যায়গুলিতে আলোচনায় দেখা গেল যে বিশেষ ধরনের প্রদাহ, বিশেষ ধরনের কোষ দিয়ে চিহ্নিত হয়। টিউবার-কুলোসিস মাঝখানে কেজিনের মত পুঁজ ও তা ঘিরে এপিথিলয়েড ও রাক্ষুসে কোষ।

সিফিলিসে লিম্ফোসাইট ও প্লাজমা কোষের অবস্থিতি।

অন্য পুঁজ হওয়া প্রদাহে বহুনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট কোষের ভীর।

এখানে কিছু কিছু ছত্রক যে ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি করে, তারই আলোচনা করা হচ্ছে। এ ছত্রকগুলি হল, ক্রুপ্‌টোকক্কাস, হিষ্টোপ্লাজমা, ককসিডিয়া ইত্যাদি। এগুলি ময়দা জাতের কার্বোহাইড্রেট গ্যাঁজাতে (fermentation) পারে। এদের বাস মৃত্তিকায়। নাসিকায় এসে এরা ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।

ক্রুপ্‌টোকক্কাস

ক্রুপ্‌টোকক্কাস নিওফর্মিস নামধারী এই ছত্রককে বলে ইষ্ট। এদের গা থেকে কুঁড়ি (bud) বার হয়ে বংশবৃদ্ধি হয়। তবে অন্য ছত্রকের সুতোর মত (mycelium) কিছু এরা তৈরী করে না। এক একটি কোষ 4 থেকে 12 4mμ ব্যাসের হয়। গ্রাম রঞ্জক ও পার-আয়োডিক এ্যাসিড সিফ (PAS) রঞ্জক গ্রহণ করে।

শরীর কলায় প্রতিক্রিয়া ঃ অনেক সময়েই শরীরে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। তবে কখনো কখনো ল্যাংহান বর্ণিত রাক্ষুসে কোষ, যার ভিতরে বীজাণুও দেখা যায়। কখনো লিম্ফোসাইট কোষ, প্লাজমা কোষ দেখা যায়। হালকা ধরনের টিউবারকুলোসিস সদৃশ, টিউবারকুলয়েড বলে বর্ণিত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

রোগ নির্দিষ্টকরণের জন্য এই বীজাণু অণুবীক্ষণে দেখতে পাওয়া চাই।

হিষ্টোপ্লাজমা

হিষ্টোপ্লাজমা কেগস্যুলেটাম ছত্রক ইষ্টের মতও দেখা যায়, আবার স্তালি লম্বা লম্বা স্থত্রের রূপও নিতে পারে। এর এক একটি কোষের দৈর্ঘ্য 1 থেকে 5 মিলি মাইক্রন অবধি হয়। গায়ে এ কোষের থাকে মিউসিন গঠিত চাদর। এদেরও বাস মাটিতে। অনেক পশুব্যাধির কারণ এই ছত্রক।

আক্রমণ করে প্রধানতঃ ফুসফুস। হাইলামের লসিকাগ্রন্থীর প্রদাহ ঘটায়। কোন ক্ষেত্রে রক্তে প্রবেশ করে শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে আক্রমণ সম্ভব।

শরীরের আক্রান্ত প্রত্যঙ্গে এ বীজাণু ম্যাক্রোফাজ কোষে দেখা যায়। টিউবারকুলোসিসের মত চেহারা এতে দেখা যায় না। আক্রান্ত হয় তারাই বেশী, যাদের থাইমাসজাত T লিম্ফোসাইট কম। বীজাণু দেখেই রোগ নির্ণয়। রক্তরসে সিফিলিসের ধরনে কম্লিমেণ্ট-ফিক্সেশান পদ্ধতিতেও রোগ নির্ধারণ সম্ভব।

কক্সিডিয়োড

কক্সিডিয়োড ইমিটিস হল এই ছত্রকের নাম। ইষ্টের মত এই ছত্রকে কুঁড়ি হয়ে বংশবৃদ্ধি ঘটে না। সাইজেও অপেক্ষাকৃত বড়, 50 মিলিমাইক্রন। কোষ প্রাচীরও পুরু। এই পর্যায়ের ছত্রকরা ধূলির সাহায্যে শ্বাসনলীর মধ্যে গিয়ে ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়। ফুসফুসে যে বিকৃতি ঘটায় তা দেখতে অনেকটা টিউবারকুলোসিসের মত। বক্ষের অভ্যন্তরে (mediastinum) লসিকাগ্রন্থীগুলির প্রদাহ বিশেষ হয়। তবে তা ক্যালসিয়াম জমা হয়ে সেরে যায়, হয়ত একটু জর হয়ে। রোগ নির্ণয়ের জন্য চাষ বা কালচারে এ বীজাণু দেখতে হয়। পূর্ব বর্ণিত কম্লিমেণ্ট বন্ধন পরীক্ষায় এ বীজাণুকে চিহ্নিত করা যায়।

ক্যানডিডা

মানুষের ছত্রক সংক্রমণজাত রোগ এই ধরনের ছত্রকের দ্বারাই বেশী হতে দেখা যায়। এর মধ্যে আবার ক্যানডিডা এ্যালবিক্যানসই প্রধান। প্রধানতঃ কুঁড়ি হয়ে আর তা না হলে স্থত্রের আকারেও দেখা যায়।

এ বীজাণু মুখ, অন্ত্র, যোনি ইত্যাদি জায়গায় বসবাস করে। মুখ বা

গলার মত স্বাভাবিকভাবে যে জায়গা ভিজে থাকে, সেখানে সাদা রংয়ের দাগ দেখা যায়, যাকে থ্রাস বলা হয়। ঐগুলি সদ্যজাত শিশুর হতে দেখা যায়। যোনি থ্রাস প্রস্থৃতি অবস্থায়, কি বহুমূত্রে দেখা যায়। ঐ ছত্রক গাঁজাতে পারে ও সেইজন্য যোনিদেশের প্রতিক্রিয়া আরো এ্যাসিড বা অম্ল পর্যায়ে নামে। এইজন্য এই ছত্রকের চাষেও এ্যাসিড আছে এমন মাধ্যমের প্রয়োজন।

এ ছত্রক সুযোগগ্রাহী (oppertunistic) অর্থাৎ যখন রোগীর শারীরিক প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে, অর্থাৎ কোন রোগে বা ষ্টেরয়েড, কি ক্যানসারের রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগের কালে এ ছত্রকের আক্রমণ হয়। যে সব মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ দুর্বল, যেমন থাইমাস জাত লিম্ফোসাইট কোষ যাদের শরীরে থাকে না, তাদের সারা শরীরে ক্যানডিডা ছত্রকের আক্রমণ ঘটতে পারে।

শরীর কলার অল্প আক্রান্ত স্থানও ঐ আক্রমণে মরে যেতে পারে। কিন্তু যেখানে বৃহত্তর সংক্রমণ ঘটে, সেখানে এই রকমের কলাবিশেষের মৃত্যুও হতে পারে বড় জায়গা জুড়ে।

চিকিৎসা ঃ ফুসফুসের সংক্রমণ প্রায়ই নিজে থেকে সারে। তবে সারছে না দেখলে, পাছে সর্বত্র ছড়িয়ে যায়, এ জন্য ফুসফুসের সে অংশ বাদ দেয়া হয়। ছড়িয়ে পড়া সংক্রমণের জন্য এ্যাম্ফোটেরিসিন B-তে উপকার হয়। বর্তমানে 5-ফ্লুরোসাইটোসিন সব রকমের ছত্রকেই আরোগ্য সম্ভব করেছে।

এককোষী প্রাণীজাত রোগ

এককোষী পরজীবী প্রাণীদের দ্বারা যে সব রোগের উদ্ভব হয় তার মধ্যে প্রধান হল ম্যালেরিয়া ঐ এ্যামিবা জাত আমাশা। তাছাড়া কালাজ্বর ও আফ্রিকার ঘুম পাড়ানী রোগ (Sleeping Sickness) এগুলিও এককোষী প্রাণী ঘটিত।

টক্সোপ্লাজমা ঃ স্পোরাজুয়া এই পর্যায়ের টক্সোপ্লাজমা গোষ্ঠি মনুষ্য-দেহে টিউবারকুলোসিসের ধরনের সংক্রমণ সৃষ্টি করে। এই আক্রমণ ফুসফুসে কি মস্তিষ্ক কি স্নায়ুর আচ্ছাদনে প্রদাহ সৃষ্টি করে। তার ফলে জ্বর, লসিকা-গ্রন্থীর প্রদাহ ইত্যাদি হতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রে এ রোগ যদিও মারাত্মক

নয়, তবু পাইরিমেথামিনও বিভিন্ন সালফা ওষুধ বার হবার আগে কোন কোন ক্ষেত্রে মারাত্মক হতে পারত। বীজাণু দেখেই রোগ নির্ণয় হয়।

নিমোসিষ্টিস কেরেনাই ঃ এই এককোষী প্রাণীগুলির দ্বারাও নিমোনিয়া রোগ হতে পারে ঐ রোগের সঙ্গে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিপন্নতার সম্পর্ক আছে, যা থাইমাস জাত লিম্ফোসাইট না থাকার মত চেহারা দেখায়।

কারণ অজানা কিছু প্রদাহ

বিড়াল আঁচড়জাত ব্যাধি (Cat scratch Disease) ঃ এ প্রদাহ লসিকাগ্রন্থীর। কারণ সঠিক জানা নেই। তবে বেড়ালের সঙ্গে যাদের বেশী যোগ, তাদেরই এ রোগ হতে দেখা যায়। বেড়াল আঁচড়াবার স্থানীয় লসিকাগ্রন্থীতে প্রদাহ এমনকি পুঁজও হয়।

সারকয়েড

এ রোগ সারা শরীরের। কিন্তু এর কারণতত্ত্ব জানা নেই। অণুবীক্ষণে দেখলে লসিকাগ্রন্থীতে ফলিকা (follicles) দেখা যায়। এগুলিতে ল্যাংহান বর্ণিত রাক্ষুসে কোষ, যার মধ্যে তারার মত দেখতে এ্যাসিড প্রকৃতির রঞ্জক গ্রাহক বস্তু থাকে। এগুলিকে স্থুম্যান বডি বলে। এর চারিপাশে থাকে লিম্ফোসাইট কোষ। অনেকটা টিউবারকুলোসিসের মত হলেও কোষের মাঝখানের খোলা জায়গায়, কেজিনের মত যে জমাট পুঁজ টিউবারকুলোসিসে দেখা যায়, তা এই সারকয়েডে থাকে না। রেটিকুলিন বা তন্তুবস্তু থাকে যথেষ্ট।

এই রোগ ফুসফুসেই প্রধানতঃ আক্রমণ চালায়। তবে তার প্রচণ্ডতা বেশী নয়। লসিকাগ্রন্থীতে রোগের ধমক বা প্রভাব দেখা যায় বেশী। তবে যকৃত ও প্লীহাও বাদ যায় না। অস্থিতে ছোট ছোট খোলা জায়গা তৈরি হয়ে যায় (cyst)। সারকয়ডোসিস হলে কোষবাহিত রোগ-প্রতিরোধ ব্যাহত হতেও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে।

সারকয়েডের মত অণুবিক্ষণীক চেহারা ক্যানসারের কাছাকাছি লসিকাগ্রন্থীতে অনেক সময় দেখা যায়। কখনো এ রূপ টিউবারকুলোসিসেও দেখা যায়। তাছাড়া হজকিন ক্যানসারেও।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থীর বৈলক্ষণ্যের জন্য সারকয়েড ব্যাধিগ্রস্থের রক্তের পটাসিয়ামের আধিক্য লক্ষণীয়।

ক্রোনব্যাধি

ক্রোনস ডিজিজ বলে পরিচিত ঐ রোগের কথা বহুদিন ধরে জানা। তবু কিন্তু এর কারণ কি তা জানা নেই। এই রোগে বিশেষ ধরনের দানাদার কলা সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রে। অবশ্য খাদ্যনালির অন্য জায়গায় এ রোগ যে কখনো হয় না, তা নয়। তবে কমই।

রোগগ্রস্থ অন্ত্রের স্ফীতি দেখা যায়। এইজন্য ভিতরটা সঙ্কুচিত হয়। অন্ত্রের প্রাচীরে ক্ষতও দেখা যায়। এর ফলে অন্ত্র থেকে বাইরের চামড়া পর্যন্ত সুড়ঙ্গ বা ফিশ্চুলা হয়ে যেতে পারে। স্থানীয় লসিকাগ্রন্থী ও অন্ত্রের মেসেন্ট্রিতে যে সব গ্রন্থী, তার প্রদাহ লক্ষণীয়। তবে অন্ত্রের আগাগোড়া সব জায়গায় যে প্রদাহ হয় তা নয়। দু-একটি জায়গা বেশ সুস্থ থাকতে দেখা যায়।

অণুবীক্ষণে, অন্ত্রের প্রাচীরের পুরোপুরি প্রদাহ লক্ষণীয়। বিশেষ করে যে অংশে মিউসিন নিঃসরণ হয়, সেই অংশের প্রদাহটা বেশী। স্ফীতিটা হয় প্রথম দিকে জল জমে যাবার জন্য, তারপর তার বদলে আসে তন্তু (fibrous) কলা। এর কোষে প্লাজমা কোষ ও লিম্ফোসাইট কোষের প্রাধান্য নজরে পড়ে। ম্যাক্রোফাজ, বহুনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট কোষ, ইয়োসিন রঞ্জক-গ্রাহী কোষ কম কম থাকে। কিছু রাক্ষুসে ল্যাংহান কোষ থাকায় কতকটা টিউবারকুলোসিসের মত দেখায় তবে বীজকোষগুলির যে বিন্যাস বর্তুলা-কারে, তা ক্রোনে দেখা যায় না।

এ রোগের কোষ মাধ্যমে যে রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা, তা ক্ষতিগ্রস্থ ও কম হয়ে গেছে দেখা যায়। প্রতিরোধ্যতা বিপন্ন, এমন ইঁদুরে (তাদের উপর রঞ্জন-রশ্মি প্রয়োগে) এ রোগ পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন করা সম্ভব, যেমন করা যায় সারকয়েডে।

বৃহদন্ত্রের শুধু কোলনে যখন এ রোগ সীমাবদ্ধ, তখন কোলনের ক্ষতযুক্ত প্রদাহের (ulcerative eolitis) থেকে এ রোগের তফাৎ করা দুঃসাধ্য।

20 ভাইরাসজনিত রোগগুলি

ভাইরাস কথাটা, আর তার রোগ উৎপাদন সম্ভাবনা, বহুকাল জানা। সেকালে অবশ্য ভাইরাস বলতে বোঝাত বিষ। কিন্তু ক্রমশঃ জানা গেল যে ভাইরাস জীবন্ত। তখনই তুলনামূলকভাবে দেখা হতে লাগল ব্যাকটিরিয়া বা বীজাণু ও অন্য সজীব বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে।

বীজাণু সম্পর্কে জানা গেল যে, ক্ষুদ্রতম বীজাণুও (0·2 মিলিমাইক্রন) অণুবীক্ষণে দেখা যায়। জীবন্ত কোষ নয়, এমন মাধ্যমে চাষ করে বাঁচিয়ে রাখা যায়। এর দু-একটি ব্যতিক্রম থাকলেও, সে ব্যতিক্রম অনতিক্রম্য নয়। সুসংবদ্ধ কোষ না হলেও, বীজাণুকে এককোষ-দেহীই বলতে হয়। এখানে **RNA**—রাইবোনিউক্লিইক এ্যাসিড কোষের বহিরাংশ ও **DNA**—ডেসক্সি-রাইবোনিউক্লিইক এ্যাসিড কোষের নিউক্লিয়াস।

বীজাণুর চেয়ে সূক্ষ্মদেহী হল যাকে বলা হয় রিকেটসিয়া (riekeusial body)। এগুলিকে বিশেষ রঞ্জক ব্যবহার করে তবে সেই রঞ্জকটুকু দেখা যায়।

টাইফাস জ্বরের কারণ এরা। এ সংক্রমণের বাহক হল উকুন, টিক ইত্যাদি প্রাণী। দেখা গেছে, প্রোটিয়াস বীজাণুর একটি অভ্যন্তরস্থ বস্তু আর রিকেটসিয়ার বস্তুর মধ্যে একটা মিল আছে। এটা বিশেষ পরীক্ষায় দেখা যায়, যাকে ভাইল ফিলিক্স রিএ্যাকশান (Weii-Felix) বলা হয় যাকে।

রিকেটসিয়ার চেয়ে সূক্ষ্মতর হল কক্সাক্সি। তথাকথিত কিউ জ্বরের (Q-Fever) জন্য এরা দায়ী। কিন্তু তথাকথিত ভাইল-ফিলিক্স রিএ্যাকশান দেখায় না।

PPLO অর্থাৎ প্লুরো-নিমোনিয়া লাইক অরগ্যানিজম, এগুলিও ঠিক বলতে গেলে বীজাণু পর্যায়ের নিচে। বীজাণু আটকায় যে ধরনের ছাঁকনিতে, এরা তা পার হয়ে যায়। এদের মধ্যে **DNA, RNA** দুই থাকে।

রিকেটসিয়ার চেয়ে সূক্ষ্মতর হল ভাইরাস। আবশ্যিকভাবেই এরা কোন না কোন কোষের উপর পরভোজী বা পরজীবী।

অণুবীক্ষণে দেখা সম্ভব হয় না বলে দেখার জন্য ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ ও মাপজোক করার জন্য অন্য উপায় নিতে হয়।

মাপের জন্য বিভিন্ন সাইজের ছিদ্র আছে এমন ছাঁকনি বা ফিলটার ব্যবহার করা হয়।

আরো ভাল উপায় হল আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ যাকে বলে, সেই অতিরিক্ত গতির মধ্যাকর্ষণিক পাতনের সাহায্য নিয়ে যে পদ্ধতি, তাতে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দেখা গেছে যে এন্টেরোভাইরাস, হারপিস ও এডিনোভাইরাস গোল। আর বীজাণুদেহাশ্রয়ী কাজের চেহারাটা বেঙাচির মতন যার ল্যাজ আছে।

ভাইরাসের রাসায়নিক চরিত্র

একটি একক ভাইরাসের মধ্যে থাকে ভিরিয়ন যাকে বলা হয়, একটি অতি প্রাথমিক গড়নের শরীর। এতে থাকে একটি নিউক্লিক এ্যাসিড অণু ও তাকে ঘিরে প্রোটিন। একে বলে ক্যাপসিড। উদ্ভিদ ভাইরাসে থাকে রাইবো-নিউক্লিক এ্যাসিড। আর প্রাণী ভাইরাসের মধ্যে এ্যাডিনো, বসন্ত, হার-পিস এইসব ভাইরাসে থাকে ডেসক্সিরাইবোনিউক্লিক এ্যাসিড। আর মিক্সো, পিকর্ণা, আরবোর, রিও, র‍্যাবডো, এরিনো ভাইরাসে থাকে রাইবোনিউ-ক্লিক এ্যাসিড। নিউক্লিক এ্যাসিডই নতুন করে ভাইরাস দেহ-গঠনের কাজে লাগে।

ক্যাপসিডের মধ্যে একই বস্তুর সমাহার থাকে একাধিক। যে ভাইরাস গোল, তার ক্যাপসোমিয়ারে কুড়িটির মত, ত্রিকোণ এককের গঠনে তা গোল নিরেট দেখায়। যে ভাইরাস লম্বা, তার নিউক্লিক এ্যাসিড পাকানো হয়, তার ক্যাপসিডও হয় কোণাকৃতি। ঘোরানো সিড়ির মত দুপ্রান্ত একরকমের দেখতে হয়। আর এক রকম দ্বিপাক্ষিক সমত্ব দেখা যায়, সেখানে মাথা ও ল্যাজের দিকের গড়নে ভিন্নতা থাকে।

কোন কোন ভাইরাসে আবার এ ছাড়াও একটা ঘেরাটোপ থাকে। এ ঘেরাটোপ আবার পিত্তরসে জারিত বা দ্রবীভূত হতে পারে। বড় বড় ভাইরাস, যেমন বসন্তের ভাইরাস, তাতে শর্করাজাতীয় বস্তুও থাকে। কিছু অনুঘটকও তাদের শরীরে থাকতে পারে।

ভাইরাসের পূর্ণ জীবনযাত্রা আমরা জানি না। এদের প্রথম কাজ হল,

গ্রাহক কোষের একটি গ্রহণোপযুক্ত স্থানে লেগে যাওয়া। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস কোষে যেখানে মিউসিন-শর্করা আছে, সেইখানেই লাগে। বীজাণুর ফাজ তার সরু ল্যাজের সাহায্যে বীজাণুর গায়ে লাগে। এখানে দ্রবণের উপযুক্ত অনুঘটক আছে।

তারপর ফাজের মুক্ত ডি-এন-এ বীজাণুর ভিতর অনুপ্রবেশ করে। প্রোটিন আবরণ যেন ঠিক ইঞ্জেকশান দেবার পিচকিরি। জান্তব ভাইরাসের অনুপ্রবেশ হয় একটু ভিন্নভাবে। এখানে কোষের নিজস্ব গ্রাস ও পান, যাকে ফ্যাগোসাইটোসিস ও পিনোসাইটোসিস বলে, সেগুলির মাধ্যমেই হয়।

কোন ভাইরাস, তার নিউক্লিক এ্যাসিডটা কোষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করালে, তারপর কয়েক ঘণ্টা আর তার ঠিকানা থাকে না। এই অবস্থাকে গ্রহণ লাগার (eclipse) অবস্থা বলে। এ সময়ে ওই নিউক্লিক এ্যাসিড আক্রমণাত্মক থাকে না।

এরপর ওই নিউক্লিক এ্যাসিড কোষের যে প্রোটিনকে ভাইরাসের নিউক্লিক এ্যাসিড তৈরি করতে বাধ্য করে। মজার ব্যাপার হল, একটি নিউক্লিক এ্যাসিড কোষের প্রোটিনকে এমনভাবে অভিভূত করে যে, সে কোষ নিজস্ব বিপাক ক্রিয়ার কাজকর্ম ফেলে রেখে, শয়ে শয়ে শুধু ভাইরাসের নিউক্লিক এ্যাসিড তৈরি করে, তারই বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। কোন শ্রেষ্ঠতর প্রাণীতে এ রকম বংশবৃদ্ধি হতে দেখা যায় না।

ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি কিভাবে ঘটে তা পুরোপুরি জানতে এখনো বাকি আছে। কোন কোন ভাইরাসের ক্ষেত্রে, ভাইরাসের দেহবস্তু সৃষ্ট হয় আক্রান্ত কোষের নিউক্লিয়াসে আর কোন ভাইরাসের ক্ষেত্রে তা সৃষ্ট হয়, কোষের সাইটোপ্লাজমে। বস্তুগুলি পরিণত হয়ে গেলে, কোষটি ফাটিয়ে, অজস্র ভাইরাস বার হয়ে আসে। মিক্সো ভাইরাস বার হবার সময় কোষ থেকে চর্বি জাতীয় বস্তু এর বহিরঙ্গের আচ্ছাদন হিসাবে নিয়ে বার হয়। তারপর ভাইরাস আর এক নতুন কোষে প্রবেশ করে।

কোন কোন ভাইরাস কোষের ভিতর ঢুকলে, রঞ্জিত কোষে একটি বিন্দুর মত দেখায়। এই বিন্দুগুলি ভিন্ন ভিন্ন রঞ্জক গ্রহণে সক্ষম। জলাতঙ্কে নেগ্রিবডি, বসন্তে গুয়ারনিযারি বডি, আর তা না হলে সাধারণভাবে শুধু ইনক্লুশান বডি বলা হয়।

পরিবেশের প্রভাবঃ বেশীর ভাগ ভাইরাস, ঘরের সাধারণ

শীতোষ্ণতায় কর্মক্ষমতা হারায়। এজন্য রাখতে হলে শীতে জমাট অবস্থায়, আর নয়তো তারও নিম্নতাপে $-70°C$ তাপে রাখতে হয়। তবে কোন কোন ভাইরাস অপেক্ষাকৃত সহনশীল। যেমন যকৃত প্রদাহের ভাইরাস (hepatitis) বেশ উত্তাপেও বাঁচে।

বীজাণুনাশক বস্তুতে ভাইরাসও মরে যায়। তবে 50% গ্লিসিরলে ভাইরাস বেশ বাঁচে। এমনকি বসন্তে টীকার লিম্ফ এতেই রক্ষা করা হয়। অথচ তাতে বীজাণু নষ্ট হয়ে যায়।

ভাইরাস সংহার ঃ আপাতদৃষ্টিতে সহজ বলে মনে হলেও এটা তা নয়। আলট্রাভায়োলেট রশ্মিতে নির্জীব ভাইরাস (ফাজ) আবার রৌদ্র-প্রাপ্ত বীজাণুদেহে প্রবেশ করলে প্রাণশক্তি ফিরে পায়। এর কারণ হিসাবে বলা হয় যে, আলট্রাভায়োলেট রশ্মি জিনগত সংবাদবাহক নিউক্লিক এ্যাসিডের একটি বা একাধিক জায়গা জখম করে। কাজেই বহু ভাইরাসই আবার বহু সংখ্যক কোষ পেলে, এ থেকে কিছু ও থেকে কিছু এরকম নিয়ে, তারই যোগসাজসে আবার পরিপূর্ণ ভাইরাস সৃষ্ট হতে পারে।

ভাইরাসের চাষ ঃ ভাইরাসের বেঁচে থাকতে হলে চাই জীবন্ত কোষ। তাই তাদের চাষ সম্ভব হয়, ডিমের মধ্যে মুরগীর ভ্রূণে। 1949 সালে এণ্ডারস দেখালেন যে, পোলিওমাইটিস ভাইরাস মনুষ্যদেহের কোষে টিস্যু কালচারে (ত্বকচ্ছেদের চর্মে) চাষ করা যায়। তারপর থেকে এই নিয়মই চলে আসছে।

বর্তমানে অবশ্য, সব ভাইরাসের চাষ লাগানো সম্ভব হয় না বলে, প্রাণী-বিশেষের শরীরে অনুপ্রবিষ্ট করে, কলাবিশেষে তা কি ক্ষতিসাধন করল, দেখা হয়। শিশু ইঁদুরে কক্সাক্সি ভাইরাস মারক পেশীপ্রদাহ সৃষ্টি করে। অবশ্য অনুরূপভাবে মুরগীর ডিমে ভ্রূণের মধ্যে ভাইরাসের চাষ করা হয়।

টিস্যু-কালচারে ভাইরাস চাষও যে করা হচ্ছে, সেখানে টেষ্টটিউবের গায়ে যে কোষ লেগে আছে, তাদের উপরে বিশেষ বিশেষ ভাইরাসের কাজ কি হল তা লক্ষ্য করা হয়। কাজও বিবিধ। কোন ভাইরাস চাদরের মত গায়ে গায়ে লাগা কোষের মধ্যে দু-একটি রাক্ষুসে কোষ তৈরি করে। কোন ভাইরাসে কোষ ফুলে ওঠে, তাদের গায়ে গায়ে লাগা ভাবটা আর থাকে না। আর কোন ভাইরাসে কোষ ছোট হয়ে যায়, অনেক কোষ ঝরে পড়ে। এগুলিকে সাইটোপ্যাথিক বা কোষ-বিকার বলা হয়।

কোন বিশেষ কলা যখন জীবন্ত রাখা হয়, তাতেও ভাইরাসের চাষ হয়। এর ফলাফল কলার অংশ কেটে রঞ্জিত করে দেখতে পারা যায়।

সংক্রমণ ঃ ভাইরাস শুধু যে প্রাণীবিশেষকেই আক্রমণ করে, তা নয়। সব প্রাণীই এমনকি উদ্ভিদও আক্রান্ত হয়।

ভ্যাকসিনিয়া, হার্পিস, ভেরিসেলা, ভেরুকা, মোলস্কা—চর্ম আক্রমক ; এন্টেরো, ভেরিসেলা, রেবিস (জলাতঙ্ক), কোরিওম্যানেনজাইটিস, মাম্পস, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ভ্যাকসিনিয়া (বসন্ত)—স্নায়ুকে আক্রমণ করে। যকৃতকে আক্রমণ করে—পীতজ্বর, হেপ্যাটাইটিস (যকৃত প্রদাহী)। শ্বাসযন্ত্রের ব্যাধি সৃষ্টিকারী—মিক্সো, রিও, এডিনো, সর্দি। অক্ষিপটাহ আক্রমক—হার্পিস, এ্যাডিনো। লালাগ্রন্থী ও অন্য গ্রন্থীতে—মাম্পস, সাইটোমেগ্যালো। সর্ব-দেহ আক্রমণকারী, চামড়ায় বিশেষ সাক্ষ্য রাখে—বসন্ত, হাম, রুবেলা, পানবসন্ত, ডেঙ্গী ও এন্টেরো।

ভাইরাস ও অন্য কলার প্রতিক্রিয়া

বলা হয়েছে আগেই যে, ভাইরাস কোষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেই তার প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে।

কোষের ভাইরাস অনুপ্রবেশের পর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু হতে পারে। তাৎক্ষণিক হবার জন্য, এর লক্ষণীয় চিহ্ন থাকে না। চিহ্ন রেখেই হক, আর না রেখেই হক, কোষ-মৃত্যুই ভাইরাসের প্রতিক্রিয়ার চরম।

তবে আবার এও দেখা যায় যে, ঠোঁটে ও মুখে হারপিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস হয়তো দীর্ঘকাল থেকেও কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে না। কিন্তু জ্বর কি সর্দি হলে আক্রমণের ফল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার ক্রিয়া সুপ্ত হয়ে, আবার ভবিষ্যতের কোন রোগবীজাণুর আক্রমণের সঙ্গে সমান্তরালভাবে, আপন প্রতিক্রিয়াকে লক্ষণীয় করে তুলতে পারে। এইরকম, কোন শিশু তার লসিকাগ্রন্থী বা টনসিলে এ্যাডিনো ভাইরাস বহন করতে পারে রোগগ্রস্থ না হয়ে। কোষের মৃত্যু হবে, না কি তার বিভাজনই হবে, সেটা নির্ভর করে কি কোষ, আর কোন ভাইরাস, এরই উপর।

প্রদাহের প্রতিক্রিয়া ঃ প্রদাহমাত্রে যেমন হয়, সেই জায়গায় লিম্ফোসাইট ও ম্যাক্রোফাজের আধিক্য দেখা দেয়। বহুনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট কোষ প্রায় দেখা যায় না। আর বসন্ত ইত্যাদিতে, সঙ্গে অন্য বীজাণুর

আক্রমণের ফলে বহুনিউক্লিয়ার কোষ দেখা যায়। পোলিওমাইলাইটিসের মত রোগে, স্নায়ুমণ্ডলীর নষ্ট হয়ে যাওয়া অংশগুলি ম্যাক্রোফাজ ইত্যাদি কোষই সরিয়ে ফেলে। হামজ্বরের মত রোগে রক্তপরীক্ষা করলে লিম্ফোসাইট কোষের আধিক্য দেখা যায়। ভাইরাস ব্যাধিতে দেখা যায় এর গতি দ্রুত। হয় রোগ হয়েই তাড়াতাড়ি সেরে যায়, না হলে দ্রুত মৃত্যু।

ভাইরাস সংক্রমণে শরীরে প্রতিক্রিয়া

অন্য বীজাণুর মত কোন না কোন বহিরঙ্গের বহিঃতল (outer surface) দিয়েই ভাইরাসও প্রবেশ করে। অল্পসংখ্যক ভাইরাস যেখানে প্রবেশ করে সেখানে জায়গা নেয় ও ক্ষতি করে। যেমন রাইনো ভাইরাস। কিন্তু অধিকাংশই, যেমন পোলিও, পীতজ্বর, যেখান দিয়েই প্রবেশ করুক, ক্ষতি সৃজন করে দূরবর্তী কোন অঙ্গে।

বিস্তার ঃ ইঁদুরের বসন্তে দেখা হয়েছে কিভাবে ভাইরাস ছড়ায়। চামড়া ভেদ করে ঢুকে সেখানেই বংশ বৃদ্ধি করে। তার পর ঘণ্টা আটেকের মধ্যে স্থানীয় লসিকাগ্রন্থীতে পৌছয়। সেখান থেকে রক্তে। রেটিকুলো-এণ্ডোথিলিয়াল কোষের কোষের মাধ্যমে পৌছয় যকৃত ও প্লীহাতে। সেখান থেকে আবার চামড়ায়। প্রতি পর্যায়েই সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে বসন্তে রোগ সংক্রমণ নিঃশ্বাসে, পোলিওতে খাদ্যনালীর মাধ্যমে।

প্রতিবস্তু ঃ ভাইরাস আক্রমণে ইমিউনো গ্লোবিউলিন যা প্রতিবস্তুর প্রতীক, সেটা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। ঐ প্রতিবস্তু অনেক সময়েই দীর্ঘস্থায়ী। পোলিও, বসন্ত, মাম্পস এসব রোগে সারাজীবনই প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকে শরীরে। আর সর্দি ইত্যাদিতে একেবারেই নয়।

ভাইরাস আক্রমণে শরীরের প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে একটি হল এ্যালার্জি। এর উদাহরণ দেখা যায় বসন্তের টীকায়। টীকায় যে রকম দেখা যায়, জায়গাটা লাল হয়ে ফুলে উঠে ঠিক এ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া হিসাবে। শুধু প্রাথমিক টীকায় নয়, পরবর্তি টীকাতেও ছোটখাটোভাবে এ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। টিউকুলোসিসে কক্ বর্ণিত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এর বেশ মিল। তবে টিউবারকুলোসিসে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা দুর্বল হয়, আর বসন্তের মত ভাইরাসে তা জীবনব্যাপী হয়ে থাকে। কোন কোন রোগে, ভাইরাসের বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিবস্তু থাকলে, ভাইরাসকৃত ক্ষতি

আরো মারাত্মক হতে দেখা যায়। এইরকমই ঘটে শ্বাসনলী আক্রমণকারী সিনসিটিয়াল ভাইরাসের আক্রমণে, যদি শরীরে IgG প্রতিবস্তু থাকে।

ভাইরাসজনিত বিকার ঃ কোষ নষ্ট হয় বলেই ভাইরাসের আক্রমণে শারীরিক বিকার ঘটে। ভাইরাসের নিজস্ব টক্সিন বা বিষ নেই। ভাইরাসের নবজন্মের ফলে, যেসব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটে, তার ফলাফল বিষাক্ত হতে পারে। প্রয়োজনীয় অঙ্গ, যেমন যকৃত ক্ষতিগ্রস্থ হলে, তার জন্য মৃত্যু হতে পারে। যেমন হয় পোলিওতে মস্তিষ্কের, হেপাটাইটিসে যকৃত ক্ষতিগ্রস্থ হবার জন্য। অনেক সময় এ ক্ষতি বস্তু-প্রতিবস্তু প্রতিক্রিয়ার জন্য।

ভাইরাসে শারীরিক প্রতিরোধ

প্রতিরোধ প্রতিবস্তুগুলি এইরকম—

(ক) ইমিউনোগ্লোবিউলিনবৃন্দ—একাধিক ইমিউনোগ্লোবিউলিন প্রয়োজন হয় প্রতিরোধে। এর মধ্যে কোনটি নিউক্লিয়োপ্রোটিনের জন্য, কোনটি ক্যাপসিডের জন্য, কোনটি ভাইরাসের বহিরাচ্ছাদনের জন্য হতে হবে।

এগুলি প্রধানতঃ IgG, ও IgA পর্যায়ের হয়। ভাইরাস নিষ্ক্রিয়করণ পর্যায়ের প্রতিবস্তু IgG। আর ভাইরাস সংক্রমণ ব্যহত করে যা, তা IgA।

(খ) কোষ মাধ্যমে সৃষ্ট প্রতিবস্তুর গুরুত্ব ভাইরাসের ক্ষেত্রে খুব। দেখা যায়, থাইমাসজাত লিম্ফোসাইট কম থাকলে, হারপিস বা যে কোন ভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তবে কোষ হিসাবে লিম্ফোসাইট যে কি ঠিক করে, সেটা জানা নেই। তা ইন্ফেরণ নিষ্কাষণের দ্বারাও সম্ভব, কিম্বা লিম্ফোকাইনেজের মত অনুঘটকের সাহায্যে।

(গ) ইন্টারফেরণ—এগুলি ভাইরাস বিরোধী প্রোটিন। আনবিক ভার 20,000 থেকে 160,000 পর্যন্ত। এ প্রোটিনের প্রতিবস্তু শরীর তৈরি করে না। এর দ্বারা কোষ পরবর্তী ভাইরাস আক্রমণকে বাধা দিতে পারে। নিষ্ক্রিয় ভাইরাসও ইন্টারফেরণ তৈরির ব্যাপারে সাহায্য করে। টিস্যু কালচারেও ইন্টারফেরণ তৈরি হয়। ষ্টেরয়েড প্রয়োগে ইন্টারফেরণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। জ্বরে এর পরিমাণ বাড়ে। ভাইরাসের নিউক্লিক এ্যাসিডের কাজ বন্ধ করেই নাকি ইন্টারফেরণের কাজ সুরু। তবে যার দেহে ইন্টারফেরণ আশ্রিত, তার কোষে নিউক্লিক এ্যাসিডের কাজে বাধা দেয় না বলেই বিষাক্ত নয়। সম্প্রতি পেনিসিলিয়াম ফিউনিকিউলোসাম ইত্যাদি জিনিস

ইণ্টারফেরণ তৈরির সহায়ক জানা গেছে। কোন কোন জায়গায় একটি খি (strand) যুক্ত, আর-এন-এ ইণ্টারফেরণ তৈরিতে সাহায্য করে।

ভাইরাসে চিকিৎসা : ভাইরাস যেহেতু কোষের মধ্যে প্রবেশ করে তারই নিউক্লিক এ্যাসিড ব্যবহার করে নিজস্ব বিপাকে ক্রিয়ায়, তাই মনে হত যে এর ওষুধ বুঝি অসম্ভব। কিন্তু সেটা ভুল প্রমাণ হল। কারণ, কোষের নিজস্ব নিউক্লিক এ্যাসিড যদি ভাইরাস ব্যবহারও করে, তার পূর্বাহ্নে দু-চারটি ধাপ তো থাকবেই। সেই পর্যায়ে এই ওষুধগুলি কাজ করে যেতে পারে। আবার আলফা—এ্যাম্যাইনটেনামাইন বলে একটি রাসায়নিক বস্তু আছে, যা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের কোষ প্রবেশে বাধা দেয়। অনুরূপ চরিত্রের কিছু ইডরিভিন পর্যায়ের রাসায়নিক বস্তু আছে, যা ভাইরাসকে তার নিজস্ব ডি-এন-এ তৈরি করতে বাধা দেয়। তা ছাড়াও মারবোরান জাতীয় রসায়ন ভাইরাসকণাগুলির প্রোটিন তৈরির বাধা। টিউবারকুলোসিসে ব্যবহৃত রিফাম্পিসিন অনেক ভাইরাসের বিরুদ্ধেও কাজ করে।

ভাইরাস নির্ণয় পরীক্ষা : আগে বলা হয়েছে, কোন কোন ভাইরাস কোষের ভিতরে তথাকথিত ইনক্লুশান বডি হিসাবে দেখা যায়। বর্তমানে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে ভাইরাস কণা দেখা যায় বলে, এদিকের সুবিধাটা অনেক বেড়ে গেছে। তাছাড়াও প্রতিভাস্বর (fluorescent) প্রতিবস্তু দেখানোর মাধ্যমেও ভাইরাস নির্ণয়কার্যে সহায়তা হয়েছে বড় কম নয়। রোগে ভুগে উঠলে বিশিষ্ট প্রতিবস্তুও রক্তরসে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায়।

মনুষ্য শরীরে বহু ভাইরাসের আক্রমণে বহু রোগ হয়। এজন্য এগুলি সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিকভাবে বেশী। এগুলিকে ভাগও করা হয়েছে নানভাবে, পদ্ধতিটা আলগাই। যেমন, এণ্টেরোভাইরাস ; বসন্ত ভাইরাস ; শ্বাসনলীর ভাইরাস ; আরবোর ভাইরাস বা পতঙ্গবাহিত ; যকৃতপ্রদাহের ভাইরাস ; হারপিস ভাইরাস ; হাম ; রুবেলা ; প্যেপো-ভাইরাস ; স্লো ভাইরাস ইত্যাদি। এই শ্রেণীবিভাগ খুব উপযুক্ত নয়। উপযুক্ততর শ্রেণীবিভাগ পরে বলা হচ্ছে।

পোলিওমাইলাইটিস : এই রোগে তিন রকমের ভাইরাস আছে। টাইপ এতে সবচেয়ে মারাত্মক ধরনের রোগ হয়। মলের মধ্যে এই ভাইরাস নিষ্ক্রান্ত হয়। তা থেকে জল ও খাদ্য সংক্রমিত হয়ে রোগ হয়।

শরীরে প্রবেশের পর, এ ভাইরাসের প্রথম সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে ফ্যারিংস কি ক্ষুদ্র অন্ত্রে। এখান থেকে লসিকার মাধ্যমে রক্তসংবহনে সঞ্চারিত হয়। বৃক্ক ও প্লীহাতেও এর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। এর সমস্তটা সাত থেকে চোদ্দ দিন লাগে। এই সময়টাকে রোগের সুপ্তাবস্থা বলা যায়। তারপর যখন ভাইরাস রক্তে সঞ্চারিত, সে সময়ে জ্বর হয়। এ অবস্থায়ও রোগের বহিঃ-প্রকাশ রদ হতে পারে।

এর পর, ভাইরাস মস্তিষ্ক ও প্রধান স্নায়ুতে স্থান গ্রহণ করে। মেরুদণ্ডের সামনের দিকের কোষে ভাইরাস স্থান নেয়। ক্লান্তিতে, সন্তানসম্ভাবনাকালে, অস্ত্রপচারের পর, যখন শরীরে রোগ আছে, সেই অবস্থায় পোলিও টীকা নিলে এইসবে রোগ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

রোগ লক্ষণ দেখা দেবার কয়েক দিনের মধ্যে রোগীর মলে ভাইরাস নিষ্কাষিত হতে থাকে। পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাবার দু-তিন সপ্তাহ পর্যন্ত মলে ভাইরাস দেখা যায়।

পোলিও ভাইরাসে আক্রান্ত হতে সব প্রাণীকে দেখা যায় না। তবে মানুষের কাছাকাছি যে বানরকূল, তারা আক্রান্ত হয়। এ ভাইরাস টিস্যু-কালচারে বাঁচে বলেই সাফল্যের সঙ্গে টীকা তৈরি করা গেছে।

পোলিও টীকা ঃ প্রথম সফল টীকা তৈরি করার কৃতিত্ব সাকের (Salk)। তিনি বানরের বৃক্কজাত টিস্যু কালচারে রাখা কোষে পোলিও ভাইরাস চাষ করে, তারপর তাকে ফর্ম্যালিন দিয়ে বিপদমুক্ত ও নির্বিষ করে, ইঞ্জেকশানের উপযুক্ত টীকায় পরিণত করেন। একমাস অন্তর, তিনটি ডোজে এ টীকা দিতে হয়।

এর পর স্যাবিন (Sabin) বানরের বৃক্ককে ক্রমাগত চাষ করার ফলে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে ওঠা জীবন্ত ভাইরাসকে টীকা হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব করে তুললেন। এ টীকা খাওয়াতে হয়। এর দ্বারা IgG ও IgA উভয় রকম প্রতিবস্তুই তৈরি হয়। যাকে দেয়া হল, তার যদি আমাশা থাকে ওই সময়ে, তাহলে টীকাটা গ্রহণযোগ্য হয় না।

রুশ দেশে ও চেকোস্লোভাকিয়ায় অজস্র ব্যবহারে দেখা গেছে যে এ টীকা, খাওয়ানোর পর যখন এই ধরনের পোলিও ভাইরাস মলে নিষ্কাষিত হয়, তখনও কোন রকমের মিউটেশান ঘটে কারো কোন বিপদেরই সম্ভাবনা

থাকে না। এমনকি, একটা জনতার মধ্যে দীর্ঘদিন এ টীকা প্রয়োগের ফলে, সেই জনতার টীকা না নেয়া বেশ কিছু লোকও প্রতিরোধ শক্তি লাভ করে।

বসন্ত ভাইরাস

বসন্ত ভাইরাস একটু বৃহৎ আকারের চতুষ্কোণ ডি-এন-এ ভাইরাস। বহু প্রাণীরই নিজস্ব ভাইরাস আছে। মানুষের ক্ষেত্রে বসন্ত ও মোলস্কাম কণ্টাজিওয়াম, যাতে চামড়ায় দানা দানা গুটি দেখা দেয়, সাবুর দানার মত।

বসন্তের ভাইরাস দু'রকমের ভেরিওলা মেজর ও ভেরিওলা মাইনর। নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়েই এ ভাইরাসের অনুপ্রবেশ ঘটে। রোগীর কাপড়-চোপড় ইত্যাদিও বীজাণু বহন করে।

অনুপ্রবেশের পর, নাসিকার মিউকাস ঝিল্লীকে ভাইরাস প্রথমেই আক্রমণ করে। তারপর রেটিকুলো—এণ্ডোথিলিয়্যাল সিষ্টেমের সাহায্যে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। সর্বদেহে ভাইরাস, এই অবস্থার পর, চামড়ায় ফোস্কার আকারে ভাইরাস চামড়ায় আশ্রয় নেয়। এই সময়ে চামড়ায় বা ফোস্কার জলে কি পুঁজে পাশ্চেন বডি (paschen) বলে কথিত কণিকায় অজস্র ভাইরাস ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে। দশ থেকে চোদ্দ দিন পরে রোগের প্রকাশ ঘটে। ফোস্কা হবার পর থেকে যতক্ষণ না সেটা শুকিয়ে শক্ত হয়ে মরা উপরের স্তরটা পর্যন্ত খসে না পড়ে, ততক্ষণ রোগীর সংক্রামক অবস্থা।

বসন্তের টীকা ঃ এডোয়ার্ড জেনার আবিষ্কার করলেন যে গো বসন্ত কারো হয়ে থাকলে তার আর বসন্ত হয় না। তারপর ভ্যাকসিনিয়া নামে আরো একটি ভাইরাসের আবিষ্কার হল। এতে রোগ সম্ভাবনা নেই তবু টীকা হিসাবে যথেষ্ট অনাক্রম্যতা দায়ক। এ ভাইরাসও বাছুর বা খরগোসের শরীরের মধ্য দিয়ে গেলে, এর মারাত্মক ভাব যদি বা কিছু, থাকে তাও চলে যায়।

টীকার পরবর্তী কিছু ফলাফল সীমিত সংখ্যক ক্ষেত্রে দেখা যায়। এগুলি হল ঃ

(ক) কখনো হয়ত যেখানে টীকা দেয়া হয়েছে তার চারদিকে মারাত্মক ক্ষত হয়ে তা ছড়িয়ে যায়। হলে আক্রান্তদের শতকরা তিরিশ জনের প্রায় মৃত্যু সম্ভব।

(খ) টীকা নেবার পর গুটির মত সারা শরীরে তা ছড়ায়। যাদের শরীরে T লিম্ফোসাইট কোষ কম তাদের এটা হয়।

(গ) টীকাজনিত স্নায়ু ও মস্তিষ্কের প্রদাহ হতে দেখা যায় যখন, যেসব ক্ষেত্রে, সেখানে মৃত্যুর হারও শতকরা পঞ্চাশ জনের মত দেখা যায়।

(ঘ) অল্পক্ষেত্রে টীকা থেকে অস্থিপ্রদাহ (osteomylitis) হতে পারে।

(ঙ) মাকে টীকা দিলে, গর্ভস্থ দু-তিন মাসের ভ্রূণ অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। তবে এর সংখ্যা নগণ্য।

এইসব উপসর্গগুলি এত কম হতে দেখা যায় যে, শুধু এগুলির ভয়ে টীকা নেয়া চলবে না, এমন নয়। একমাত্র যে কারণে টীকা না দেয়ার যথেষ্ট কারণ বলে ধরা যেতে পারে, তা হল সারা গায়ে ক্ষত থাকলে। রোগীর প্রতিরোধ ব্যবস্থার ঘাটতি থাকলেও টীকা দেয়া চলে না, যেমন না দেয়া ভাল গর্ভাবস্থায় কি যখন রোগীকে ষ্টেরয়েড দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে।

বর্তমানে বসন্তরোগ দূর হয়েছে। আর এ রোগ যদি দূর করা যায়, তা হলে সেটাই হবে এডোয়ার্ড জেনারের জন্য।

শ্বাসনলীর ও শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাস

অর্থোমিক্সো ভাইরাস আর প্যারামিক্সোভাইরাস, যার মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জাও পড়ে, সেই সঙ্গে সর্দিও এই পর্যায়ের।

অর্থোমিক্সো ভাইরাস ঃ এগুলি আর-এন-এ ভাইরাস। মিউসিনের আধিক্য বলে এই নাম। এর চেহারাও একটু ভিন্ন। গর্ভস্থ ফুলের কোষে ও মুরগীর অন্ত্রের ভ্রূণের কোষ কালচারে এদের চাষ করা যায়। গিনিপিগ ও মুরগীর লোহিতকণিকাগুলি এই ভাইরাসে দলা পাকিয়ে যায়। বিশিষ্ট প্রতিবস্তুর সংযোগে এই দলা পাকানো নিরস্ত করা যায়, যেটা রোগ নির্ণয়ের কাজে ব্যবহৃত হয় এর দ্বারা উক্ত ভাইরাসের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। এই শ্রেণীর ভাইরাসে ইনফ্লুয়েঞ্জা গুরুত্বপূর্ণ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ঃ A, B ও C এই তিন রকমের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এই রোগের জন্য দায়ী। অবশ্য এর মধ্যে A-র ভূমিকাই প্রধান। নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এ রোগের আক্রমণ ঘটে। শিশু ও তরুণরাই আক্রান্ত হয় বেশী। যে আক্রান্ত তার রোগের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই সংক্রমণ বেশী ঘটে। তবে সুস্থ অর্থাৎ আক্রান্ত হয় না এমন বাহকও আছে। এক থেকে দুইদিন

রোগের সুপ্তাবস্থা। এ রোগ প্রধানতঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের, যদিও সারা দেহই এ রোগে আক্রান্ত হয়। ট্রেকিয়া বা গলবিল বিশেষ প্রদাহের শিকার হলেও এ রোগে মৃত্যু যদি হয়, তা হয় অন্য মারাত্মক বীজাণুর আক্রমণে।

ক্ষমুক্তিতত্ত্ব (immunology)ঃ ইনফ্লুয়েঞ্জার বিশেষত্ব হল যে, এর দেহের প্রতিবস্তু সৃজক বস্তুর পরিবর্তন ঘটে। 1918 সালে ইনফ্লুয়েঞ্জার যে বিশ্বব্যাপী মহামারী হয়েছিল তা মিউটেশানের জন্য জিনবস্তুর রূপান্তর ঘটিয়েই এত মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। ভৌগোলিক স্থানবিশেষে এ রকম জিনবস্তুর পরিবর্তন বোধক নামও দেয়া হয়ে থাকে। যেমন A/Hong Kong/68 ভাইরাস।

H অক্ষর দিয়ে হিমোফাইলাস এ কথা দিয়ে জ্ঞাপন করা হয় রক্ত জমাট বাঁধানো বস্তুর উপর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রভাব ও তার শ্রেণী-বিভাগও করা হয়। এ রোগের প্রতিরোধ এইসব বস্তুর প্রতিবস্তু শরীর কতটা করতে পারে তার উপর নির্ভর করে। 1918 সালের মারাত্মক বিশ্ব-জোড়া মহামারীর ভাইরাস ছিল শুকর ভাইরাসের মিউটেশান জাত। এখনও তা শুকরে পাওয়া যায়।

B ও C ভাইরাসের পরিবর্তন অতটা সহজে হয় না। তবে এর আক্রমণ হয় যথেষ্ট।

প্যারা-ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অন্য প্যারা-মিক্সোভাইরাসঃ এই পর্যায়ের ভাইরাসের অনেক রকমফের। শিশুদের ক্রুপ, ব্রঙ্কাইটিস ও ব্রঙ্কোনিমোনিয়া হতে দেখা যায়। এ ভাইরাস মুরগী ডিমের ভ্রূণে চাষ করা সম্ভব। এই পর্যায়ে আরো কতকগুলি ভাইরাস আছে। এগুলি হল, শ্বাসনলীর (Respiratory) সিনসিটিয়াল ভাইরাস। এছাড়া আছে হাম ও মাম্পস। মাম্পসে গণ্ডদেশের দুদিককার প্যারটিড গ্রন্থীর প্রদাহ হতে দেখা যায়। পরে অণ্ডকোষ, ওভেরি, অগ্নাশয়, থাইরয়েড, স্তন ইত্যাদি প্রত্যঙ্গেও প্রদাহ হতে দেখা যায়। মস্তিষ্কের আচ্ছাদনে প্রদাহের জন্য প্রাণসংশয় হতে দেখা যায়।

এ্যাডিনো-ভাইরাসঃ এই ডি-এন-এ ভাইরাস টনসিল ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থীর প্রদাহ সৃষ্টি করে। অনেক সময়ে এ আক্রমণ গুপ্ত থাকে প্রকাশ পায় না। এই গোষ্ঠির দু-একটি ভাইরাস আছে, যা অক্ষিচ্ছদের প্রদাহের কারণ। এদের মধ্যে তথাকথিত টাইপ-8টি কেরাটোকঞ্জাংটিভাইটিস অর্থাৎ চক্ষু স্বচ্ছ ও চোখের শ্বেতার প্রদাহ সৃষ্টি করে।

সর্দির ভাইরাস ঃ RNA ভাইরাস, যাকে রাইনো ভাইরাস বলে। এরা 37°C-এর চেয়ে 33°C উত্তাপ পছন্দ করে। এরা বানরের কিডনি কোষ কালচারে অম্ল pH-এ জন্মায়। একাধিক ভাইরাসে সর্দি হয় ; যেমন ECHO, সিনসিটিয়্যাল, রিও ইত্যাদি।

পতঙ্গবাহিত ভাইরাসজনিত ব্যাধি

এই ভাইরাসগুলি জীবনের অংশবিশেষ পতঙ্গদেহে অতিবাহিত করে। এইথানেই তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে ও তারপর এই পতঙ্গের কামড়ে আক্রান্ত প্রাণীর দেহে সঞ্চারিত হয়। আবার সেই প্রাণীকে কামড়ানোর ফলে ভাইরাস পতঙ্গের দেহে ফিরে আসে। পতঙ্গবাহিত এই ভাইরাসকূলকে আরবোরভাইরাস (arthropod bourne) বলা হয়। এক উপায়ে সঞ্চারিত বাহিত হলেও এদের মধ্যে বহু ধরনের ভাইরাস থাকে। এই ভাইরাসগুলি বহু বিচিত্র ধরনের। এগুলি হল তোগা ভাইরাস, বুনিয়া ভাইরাস, অরবি ভাইরাস ইত্যাদি। এদের মধ্যে অনেকগুলিই (RNA) ভাইরাস।

পতঙ্গের দ্বারা সঞ্চারিত যে ভাইরাস নাতিশীতোষ্ণ বা উষ্ণমণ্ডলের রোগ। মশা, কামড়াতে সক্ষম যে মাছি, মাইট ও টিক জাতীয় পতঙ্গ এইসবের দ্বারা বাহিত হয়। এর ফলে কয়েকটি রোগ, যেমন জাপানী এনকেফালাইটিস নামের মস্তিষ্কের প্রদাহ ও পীতজ্বর বা ইয়োলো ফিভার রোগ মারাত্মক বলে সকলেরই পরিচিত।

পীতজ্বর ঃ এ রোগ ছিল প্রধানতঃ বানরের। মানুষে এ রোগ ইডিস ইজিপ্ট মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এ রোগ পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্য আমেরিকায় দেখা যায়। এ ভাইরাস রক্তে অনুপ্রবেশ করে, লসিকাগ্রন্থীতে স্থান নেয়। তারপর রক্তের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গের (যকৃৎ) ক্ষতিসাধন করে। এ রোগের সুপ্তাবস্থা দিন চারেক।

পীতজ্বরে যকৃতের টিস্যুর মৃত্যু হয়। এর ফলে কোষগুলি সঙ্কুচিত, ইয়োসিনে রঞ্জিত, ছোট সঙ্কুচিত নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট হয়ে ওঠে। ভাঙ্গা নিউক্লিয়াসের টুকরোগুলি সাইটোপ্লাজমে দেখা দেয়। নিউক্লিয়াসের চারিধারে এগুলি দেখা যায় বলে এর নাম দেয়া হয়েছে কাউন্সিলম্যান বডি। এখন পীতজ্বর প্রায় নেই বললেই হয়। বিশেষ করে মশকবিরোধী অভিযানের ফলে এ রোগ বন্য গ্রীষ্মাঞ্চলে ছাড়া দেখাই যায় না।

টীকা ঃ এ রোগের টীকা জীবন্ত শক্তিহীন ভাইরাস ইঞ্জেকশান দিয়ে দেয়া হয়। এই ভাইরাস 17D জাতের। বারে বারে ইঁদুরের মধ্যে দিয়ে ও তারপর মুরগীর ভ্রূণে কালচার করে এ টীকা তৈরি হয়। ভ্রূণ দেহাংশও পরিস্রুত করে টীকায় রাখা হয়।

রোগের দিন পাঁচের মধ্যে রক্তে ভাইরাস থাকলে তা ইঁদুরের মস্তিষ্কে সঞ্চারিত ও তারপর তা নির্দোষীকরণের (nutralisation) দ্বারা রোগ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া কম্‌প্লিমেণ্ট ফিক্সিং প্রতিবস্তুও দেখানো যায়।

ডেঙ্গুজ্বর ঃ এ জ্বর সব জায়গাতে হতে দেখা গেলেও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপেই বেশী দেখা যায়। ইডিস ইজিপ্টি বলে যে মশা, তারাই এ রোগ বহন করে। মশা কামড়ালে সেখানে লাল ফুসকুড়ি দেখা দেয়। এখানেই ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি হয়। এ রোগে, ওঠা নামা জ্বর, মাথার যন্ত্রণা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, চামড়ায় তথাকথিত ব্যাস বা উৎগমন দেখা দেয়। মারাত্মক সংক্রমণে রক্তপাত দেখা যায়। তবে মৃত্যু বড় একটা হয় না।

চিকেনগুনিয়া ও স্যাণ্ডফ্লাই জ্বর এগুলির ছবিও অনেকটা অনুরূপ।

ভাইরাসজনিত রক্তপাতজ্বর

রক্তপাতসহ এই জ্বর, বিশ্বব্যাপী নানা দেশে, নানারূপে দেখা যায়। প্রবল জ্বর, রক্তক্ষরণ, ও বেশ উচ্চ মৃত্যুহার এ রোগের বিশেষত্ব। এ রোগের ভাইরাস অনেক রকম ; তার মধ্যে ডেঙ্গু, চিকেনগুনিয়া থেকে আরো অনেক ভাইরাসই আছে।

এই পর্যায়ে, RNA আছে এমন এরিণা ভাইরাস, মারবুর্গ ভাইরাস, ইত্যাদিও পড়ে। প্রথমোক্ত ভাইরাস, ইঁদুরের মস্তিষ্কের প্রদাহ সৃষ্টি করলেও মানুষের ক্ষেত্রে রক্তপাতজ্বরের কারণ। সংক্রমণ খাদ্য পাণীয়ের মাধ্যমে ছড়ায়। মারবুর্গ ভাইরাস প্রথম 1967 জার্মানীতে আবিষ্কৃত হয়।

ভাইরাসজাত যকৃতের প্রদাহ

এই পর্যায়ে ভাইরাস A ও ভাইরাস B দুটি ভাইরাসের কথা অনেকদিন ধরে জানা। এর মধ্যে B পর্যায়ের ভাইরাস রক্তরসজনিত যকৃত প্রদাহের কারণ।

A. **ভাইরাসজাতযকৃত প্রদাহ ঃ** এই ভাইরাস স্কুল, মিলিটারি

ক্যাম্প এসব জায়গায় হতে দেখা যায়। অনেকে পায়খানায় এ ভাইরাস ছড়ায়, যে জন্য অনেকে সংক্রমিত হয় খাদ্যের মাধ্যমে। পাণ্ডুতা দেখা দেবার আগে ও ঠিক পরে রক্তে ভাইরাস থাকে। এ ভাইরাস ছোট, চতুষ্কোণিক সাদৃশ্য আছে। কি নিউক্লিক এ্যাসিড জানা নেই। এ ভাইরাসের চাষ হয়নি। তবে কোন কোন প্রাণীর যকৃত কোষে বিন্দুর মত দেখা যায়।

ভাইরাস B প্রদত্ত যকৃতের প্রদাহ রক্তের মাধ্যমে সঞ্চারিত বা সংক্রমিত হয়। এ ভাইরাস পায়খানা বা প্রস্রাবে বার হয় না, কিন্তু রক্তে থাকার জন্য কোন রোগীকে এই রক্ত দিলে, যাকে দেয়া হল, তার দেহে রোগ ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে। এ সংক্রমণ, রক্ত নেয়া হয়েছে এমন ছুঁচের সাহায্যে, অর্থাৎ এক মিলিমিটারে শতভাগের একভাগ মাত্র অংশের দ্বারাও অনুক্রমিত হতে পারে। এজন্য বর্তমানে যারা তথাকথিত ড্রাগ-এডিক্ট, কোকেন ইত্যাদি ইঞ্জেকশান নিয়ে থাকে, তাদের রোগগ্রস্থ হতে দেখা যায়। এ বিপদ যারা রক্ত পরীক্ষার কাজ করে ল্যাবরেটারিতে, তাদেরও আছে।

B ভাইরাস ছোট কণা। যাতে দু-খি পাকানো DNA আছে। এ ভাইরাসেরও চাষ সম্ভব হয়নি। বস্তু প্রতিবস্তুর কথায় বলা যায় যে, এই বস্তুর নাম দেয়া হয়েছে অষ্ট্রেলিয় বস্তু (Australia antigen)। এর কারণ তা প্রথম পাওয়া গিয়েছিল অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে। এ বস্তুটি ভাইরাসের উপরের তলে পাওয়া যায়। এর বিবিধ প্রতিবস্তু উদ্দীপণ ক্ষমতা আছে। ভাইরাসের ভিতরের অংশ বস্তুকে HBC বলে।

A ও B এই দুই ভাইরাসের মধ্যে B ভাইরাসজাত রোগের সুপ্তাবস্থা বেশীদিন (1 : 4)। তাছাড়া B ভাইরাস রোগে মৃত্যুর হার প্রায় শতগুন বেশী। কিছু ক্ষেত্রে রোগটা অত মারাত্মক না হয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দাঁড়ায়। সেসব ক্ষেত্রে যকৃতে তন্তুময় সিরোসিস দেখা দেয়। শিশুদের চেয়ে বয়স্করা ও সন্তানবতী নারীরা বেশী আক্রান্ত হয়।

গামা গ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশানে বেশ কতকটা রক্ষা করে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। B ভাইরাসের প্রতিবস্তু কিন্তু শরীরে অতিসংবেদনশীলতার ও তার জন্য এ্যালার্জির স্থষ্টিকারক। এই ভাইরাস আক্রমণে বিভিন্ন জটিলতা আছে। যেমন যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, তাদের শরীরে এ রোগের সুপ্তাবস্থা অতি দীর্ঘ। এর ফলে বৃক্ক অকর্মণ্য হয়ে গেছে, এমন রোগীর রক্তে এ ভাইরাস থাকে। এই রোগীদের

ডায়ালিসিস, বা ঝিল্লি ভাজন দিতে গিয়ে নার্স কি ডাক্তার এই রোগের শিকার হয়েছে।

যে বস্তু রক্তে পাওয়া যায়, তার নাম HAV বা HBV। রক্ত পরীক্ষার অন্যতম উন্নতি হয়েছে যে এ বস্তু পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া আমেরিকায় এমন ভাইরাস পাওয়া গেছে, যার ফলে কামলা রোগ দেখা দিতে পারে। অথচ এ ভাইরাস সম্পর্কে কিছুই করার নেই।

রিও ভাইরাস

এই নামটি হয়েছিল, রেসপিরেটারি এণ্টেরিক ও অরফ্যান এই তিনটি শব্দের আদ্যাক্ষর ব্যবহার করে। RNA ভাইরাস এটি। টিস্যু কালচারে বাঁচে। দরিদ্র, পরিত্যক্ত শিশুদের গলায় ও অন্ত্রে এ ভাইরাস পাওয়া গেলেও এ ভাইরাসজাত রোগ জানা নেই। অরবি ভাইরাস (অরবি = আংটি) গোল, এই পর্যায়ের ভাইরাস। এর 38টি উপজাতী অন্য প্রাণীর রোগ উৎপাদক। এই ভাইরাসের একটিমাত্র মানুষের শরীরে রোগ উৎপাদক। এ ছাড়া রোটা ভাইরাস এই পরিবারে। শিশুদের অন্ত্রদেশের ব্যাধির জনক এই ভাইরাস। এ পর্যায়ের আরো রোগ উৎপাদক ভাইরাস জানা আছে, যার সম্পর্কে বা তাদের নিউক্লিক এ্যাসিডের কথা আমরা জানি না।

হারপিস ভাইরাস

এ ভাইরাস কণায় ডি-এন-এর দুটি খেই। মানুষে এদের আক্রমণ বড় কম হয় না। 60-80% জন শতকরা এ রোগে ভোগে। অনেকেই শৈশবে মুখবিবর, অক্ষিপটাহ, যোনিদেশ প্রভৃতির প্রদাহে ভোগে। মস্তিষ্কের আচ্ছাদনের প্রদাহও হতে দেখা যায়। শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি শিশুদের ক্ষেত্রে, আক্রান্ত হলে তা মারাত্মক আকার নেয়।

ভেরিসেলা, যাকে মুরগীর বসন্ত বলা হয় আর জষ্টারকে ভিন্ন বলেই ধরা হত, কিন্তু হয়ত এ দুই রোগের ভাইরাস একই। কেননা, যে শিশুদের ভেরিসেলার ছোঁয়াচ লেগেছে তাদের পানবসন্ত হতে দেখা যায়।

টিস্যুকালচার করা কোষে, একই ধরনের বিকার ভেরিসেলা ও জষ্টারে দেখা যায়। টিস্যু পাতলা করে কেটে, তা রঞ্জন করে অণুবীক্ষণে দেখলে বহু-

নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট রাক্ষুসে কোষ ও নিউক্লিয়াসের ভিতর অন্তর্নিহিত বস্তু দেখা যায়, দুয়েতেই।

পানবসন্ত হবার পর, এই ভাইরাস, স্নায়ুর উৎপত্তিস্থলের পিছনদিককার শিকড়ের গ্যাংলিয়নে (posterier root ganglion) সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তারপর কোন অসুস্থতা বা মানসিক উত্তেজনা, ইত্যাদি হলে, রোগ সংক্রমণ যে জায়গায় হয়েছে সেই স্নায়ু যে চামড়ার, সেই জায়গায় বিকার ও ক্ষতের উদ্ভব হয়। আক্রমণ যদি সামনের স্নায়ু শিকড়ে যায়, তার ফলে পক্ষাঘাত হতে পারে। কখনো স্নায়ুর আচ্ছাদনের প্রদাহও হতে পারে।

সাধারণ হারপিসঃ এ ভাইরাস মানুষের মধ্যে খুবই দেখা যায়। শরীরের চামড়ায় বিভিন্ন স্থানে ফোস্কার মত হয়ে এ আক্রমণ ঘটতে দেখা যায়। আঙ্গুলে হারপিস ভাইরাসের সংক্রমণে কষ্টকর আঙ্গুলহাড়া হতে দেখা যায়। শতকরা প্রায় তিরিশ জনের এই রোগে অনাক্রম্যতা থাকে না, তাই এরা খুবই আক্রান্ত হয়।

প্রায়ই ঠোঁটে কোনে, মুখে, কি জননেন্দ্রিয়ের কাছে ফোস্কার মত হতে দেখা যায়। চক্ষু প্রদাহও দেখা যায়। অবশ্য যাদের T লিম্ফোসাইট কোষের অপ্রতুলতা থাকে, তাদেরই এ রোগের আক্রমণ বেশী হতে দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে সর্বশরীরে ছড়িয়ে মৃত্যুও হতে দেখা গেছে।

সুপ্তাবস্থায় এ ভাইরাস যে কোথায় থাকে, তা জানা নেই। তবে কখনো কখনো গ্রাহক স্নায়ু শিকড়ে ত্রিগামী-ট্রাইজিমিন্যাল ও নিম্নাঙ্গের স্নায়ু শিকড়ে এ ভাইরাস দেখা গেছে, শবব্যবচ্ছেদে। এ ভাইরাসের বহিঃপ্রকাশ জোষ্টারের সঙ্গে তুলনীয়। টিস্যুকালচারে এ ভাইরাস বেশ বেঁচে থাকে। স্তন্যপায়ী ইঁদুরে মস্তিষ্কের প্রদাহ দেখা যায়। যে ফোস্কা হয়, তার জলীয় অংশে হাজার হাজার ভাইরাস থাকে।

বস্তু-প্রতিবস্তুর দিক থেকে এই ভাইরাসে 1 ও 2 এই উভয় বস্তু থাকে।

হারপিস পর্যায়ে আর এক ধরনের ভাইরাস দেখা যায়, এতে কোষে, তথাকথিত ইনক্লুশান বডি থাকে, নিউক্লিয়াসে, শরীরের বহু প্রত্যঙ্গের কোষে। সদ্য জাতকের প্রায়ই মৃত্যু হয়। কিছু শিশুর সামান্য মানসিক বৈলক্ষণ্য ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তাদের প্রস্রাবে অজস্র ভাইরাস বার হতে থাকে।

এপষ্টাইন ও বারের নামাঙ্কিত একটি ভাইরাস, এই পর্যায়ের। বারকিট

টিউমারের লিম্ফোসাইট কোষ কালচারের সময়ে এ ভাইরাস পাওয়া গেল। তবে কালচারের রস থেকে এ ভাইরাস পাওয়া যায় না। তবে কোষগুলিতে এক্স-রে প্রয়োগ করে তারপর কালচার করলে তখন ভাইরাস বার হয়ে আসে। তা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দেখা যায়। অসুস্থ লোকের রক্তরসে ভাইরাস প্রতিবস্তু পাওয়া যায়।

হাম

হাম ভীষণ ছোঁয়াচে। মিউকাস নিঃসরণ করে এমন জায়গা দিয়ে রোগের প্রথম স্তরে যে নিঃসরণ হতে থাকে, রোগ তারই মাধ্যমে ছড়ায়। রোগবীজাণু লসিকাগ্রন্থীতে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। এ লসিকাগ্রন্থী প্রধানতঃ শ্বাসযন্ত্রের। পরের স্তরে ভাইরাস রক্তে চলে যায়। এ অবস্থা তিন-চার দিনের। তবে র‍্যাশ বার হবার পর সংক্রমণ সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। হামের আর একটি বৈশিষ্ট হল লসিকাগ্রন্থীর মধ্যে বহুনিউক্লিয়াস-বিশিষ্ট কোষের উদ্ভব। অনুরূপ রাক্ষুসে কোষ, শিশুদের ক্ষেত্রে ফুসফুসেও দেখা যায়। এ থেকে ভাইরাস কালচার করা যায়।

এ ভাইরাস প্যারা-মিক্সো ভাইরাস পর্যায়ের। বৃক্ক কি ভ্রূণ ফুসফুসের কোষে এ ভাইরাসের চাষ করা সম্ভব। এর বিকারসূচক ফলাফল রাক্ষুসে কোষে দেখা যায়। এ রোগে মৃত্যুর কারণ অনেক সময়েই মস্তিষ্কের কাঠিন্য সহ এক সামগ্রিক প্রদাহ। রক্তে ও সুষুম্নারসে (cebrospinal fluid) প্রচুর ভাইরাসের বিরোধী ইমিউনোগ্লোবিউলিন পাওয়া যায়।

এর টীকা (নিস্তেজিত ভাইরাস) ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এর ক্ষমতা কতটা তা বলা শক্ত। অন্ততঃ অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। টীকার দিন দশেক পরে জ্বর হওয়াটা বিরক্তিকর।

রুবেলা, অর্থাৎ জার্মান হাম

এর মধ্যে তোগো ভাইরাসের চরিত্রগুলি দেখা যায়। মানুষ ছাড়া, একমাত্র বানরই কিছুটা এ ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত হয়।

তবে এ রোগের গুরুত্বটা অন্য জায়গায়। গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসের মধ্যে গর্ভবতী নারীর এ রোগ হলে, নবজাতক শরীরের কোন না কোন

বিকৃতি নিয়ে জন্মায়। এ বিকার, হৃৎপিণ্ডের কোন বিকার, চোখে ছানি, বধিরতা, বুদ্ধির অল্পতা ইত্যাদি হিসাবে প্রায়ই দেখা যায়।

কিছু শিশুর কামলা রোগ, রক্তক্ষরণকারী পারপিউরা (Thrombocytopenie perpnra), অস্থি ও তরুণাস্থির প্রদাহস্ফীতি দেখা যায়। অনেক সময়ে মস্তিষ্কে প্রদাহ হয়ে ভ্রূণ বা নবজাতকের মৃত্যুও ঘটে। একে জন্মগত রুবেলা ব্যাধি বলা হয়।

তবে যদি গর্ভবতীর শরীরে আগে থেকেই রুবেলার প্রতিবস্তু থাকে, তা হলে ভ্রূণ আক্রান্ত হয় না। আর তা না হলে, নবজাতকের স্বার্থে গর্ভাবস্থার অবসানই ঘটানো হয়।

প্যাপোভাইরাস জাত আঁচিল

ভেরুকা ভালগারিস নামে বলা ও পরিচয় দেয়া হয় যে আঁচিলের, সেগুলি চামড়ার বিভিন্ন জায়গায় হতে দেখা যায়। পা থেকে সুরু করে যোনিদেশে পর্যন্ত ছত্রাক সদৃশ যে আঁচিল জন্মাতে দেখা যায়, তাকে বলে কণ্ডাইলোমেটা এ্যাকুমিনেটা। শিশুদের শ্বাসনলীর ল্যারিংসে এ ধরনের টিউমার দেখা যায়। তবে এ ধরনের টিউমার মারাত্মক হয় না।

এই আঁচিলের কোষ ইয়োসিনকে গ্রহণ করে রঞ্জক পদার্থ হিসাবে। তবে তার ভিতর থেকে ভাইরাস পাওয়া যায় না। একজনের শরীর থেকে অন্যের শরীরে এ আঁচিল সংক্রমিত হতে পারে; তবে তার সুপ্তাবস্থা দুই থেকে আটমাস পর্যন্ত হয়ে থাকে।

প্যাপোভাইরাস পরিবারের ভাইরাস দ্বারা বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে উৎপাদিত সোপ প্যাপিলোমার উৎপাদক। এগুলি গোলাকৃতি, দুটি খি আছে এমন ডি-এন-এ দিয়ে তৈরি। তিনটি গুণ থাকে এই ভাইরাসের: তা প্যাপিলোমা পলিওমা প ভ্যাকুয়োলাইজেশান করে বলে এই কথাগুলির প্রথমাক্ষর গ্রহণ করে প্যাপোভাইরাস, এই নাম দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে জানা গেছে যে স্নায়ুর পরস্পরের মধ্যে অপরিবাহী যে ঘেরাটোপ থাকে, তা এই ভাইরাসের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়। লিম্ফোমা টিউমারে আক্রান্তদের, সুবিধা পেয়ে এই ভাইরাস আক্রমণ করে এ বিপদ ঘটায়। মনে হয় T লিম্ফোসাইট প্রদত্ত অনাক্রম্যতার ব্যতিক্রম ঘটলেই এ আক্রমণ সম্ভব হয়।

স্লো ভাইরাস

ছাগল, ভেড়ারা স্ক্রাপি, এই নাম দেয়া একরকম রোগ, যাতে পায়ের জোর না থাকা, পক্ষাঘাত, মৃত্যু ইত্যাদি হয়, তাতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এখনও শেষ হয়নি। মনে হয়, এটি হয়ত একটি অসম্পূর্ণ ভাইরাস।

আফ্রিকার মানুষের মধ্যে এক ধরনের রোগ দেখা যায়, এর নাম কুরু। এ রোগ সিম্পাঞ্জির মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছে। মনে করা হয় নরমাংসভোজী ছিল যারা, তাদের মধ্যে এ রোগের অবশেষ আজও থেকে গেছে। এই রোগগুলি, যার মধ্যে স্ক্রাপি, কুরু ও ক্রুজফেল্ট-জেকব, রোগ অন্তর্ভুক্ত, এই স্নায়ু বিধ্বংসী ব্যাধিগুলির সুপ্তাবস্থা কয়েক বছর পর্যন্ত হতে পারে বলে এদের নাম স্লো ভাইরাস।

জান্তব ভাইরাস মানুষে

গো বসন্তের টীকা, প্রমুখ কিছু কিছু জান্তব ভাইরাস আছে, যা মানুষকে আক্রমণ করে।

জলাতঙ্ক (Rabies)ঃ জলাতঙ্কগ্রস্থ প্রাণী, যেমন কুকুর বা বিড়ালের কামড় থেকে এ রোগ হয়। প্রাণীদের মধ্যে বাদুড়, চামচিকে ইত্যাদি বহু প্রাণীর কামড় থেকেই এ রোগের ছোঁয়াচ মানুষে যেতে পারে। বাদুড় ও খেঁকশিয়ালের মত প্রাণীরা, নিজেরা রোগে না ভুগে, এ রোগ বহন করে। আক্রান্ত হবার পর, কামড়ের জায়গায় এ ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করে। তারপর জখম হওয়া স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছয়। এ রোগের সুপ্তাবস্থা দীর্ঘ, এমনকি কয়েক মাসও হতে পারে। মস্তিষ্কের প্রদাহে মৃত্যু প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

র‍্যাবডো ভাইরাসও এই পরিবারের। এইজন্য এইসব জন্তুর কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে টীকা দিতে হয়। এই টীকা পরোক্ষ প্রতিবস্তু, যা মস্তিষ্কে তৈরি করা হয়, সেই প্রতিবস্তু দিলে তা পরোক্ষ রক্ষাকবচ হিসাবে কিছুদিন চলে। প্রতিক্রিয়া এড়ানোর জন্য পেটের চামড়ায় প্রতিদিন ইঞ্জেকশান দিতে হয়। বর্তমানে খরগোসের মস্তিষ্ক থেকে কি হংসভ্রূণ শরীরের টীকা ব্যবহৃত হয়। তবে এ সব টীকায় বিপদ আছে। অন্য প্রাণীদের জন্য ব্যবহৃত টীকা, মানুষকে দেবার অনুমতি নেই।

ভাইরাসের শ্রেণীবিভাগ

রাসায়নিক শ্রেণীবিভাগ, অর্থাৎ রাইবোনিউক্লিক এ্যাসিড গঠিত না ডেসক্সিরাইবোনিউক্লিক এ্যাসিডে গঠিত, এ শ্রেণীবিভাগই বিজ্ঞানসম্মত।

আর-এন-এ ভাইরাস ঃ

পিকোর্না ভাইরাস—20-30 ন্যানো মাইক্রণ (nm), ছোট, বাইরে ঘেরাটোপ নেই, চৌকোনা (cuboidal)।

রিওভাইরাস—70nm, দুদিক একরকম দেখায়, আচ্ছাদন নেই।

অর্থোভাইরাস—80-120nm, আচ্ছাদন আছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা এই শ্রেণীর।

প্যারামিক্সো ভাইরাস—বড়, 150-220nm, আবরণ আছে।

তোগা ভাইরাস—40-80nm, আবরণ নেই।

বুনিয়া ভাইরাস—90-100nm, আবরণ আছে।

র‍্যাবডোভাইরাস—30-220nm, লম্বা, 60-80nm চওড়া। আবরণ আছে।

করোনাভাইরাস—80-160nm, আবরণ আছে।

এরিনাভাইরাস—50-200nm, আবরণ সর্বত্র সমান নয়।

ডি-এন-এ ভাইরাস ঃ

এ্যাডিনোভাইরাস—60-90nm, আবরণ নেই।

প্যাপোভাইরাস—50nm, কোন আবরণ নেই।

হারপিস ভাইরাস—150nm, আবরণ আছে।

বসন্ত ভাইরাস—বড়, 200-300nm, আচ্ছাদন আছে।

এ ছাড়া কিছু ভাইরাস শ্রেণীভুক্ত করা হয়নি।

21 টিউমার ও কলাবৃদ্ধির বিপর্যয়

বেশী কাজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য আমরা দেখি, যে কিছু কোষ, যারা অতিরিক্ত হিসাবে কাজ না করে বিশ্রামে ছিল, প্রয়োজন হলে যেন কাজে লেগে যায়। এটা তো গেল একটা দিক। এছাড়া কোষগুলি নিজ নিজ আয়তনও প্রয়োজন হলে বাড়িয়ে নিতে পারে। এর একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। গর্ভসঞ্চারের আগে জরায়ুতে যে সংখ্যায় কোষ থাকে, পূর্ণগর্ভাবস্থাতেও তার কোন সংখ্যাধিক্য হয় না। কিন্তু পূর্ণগর্ভাবস্থায় সেই এক-একটি কোষই অনেক বড় হয়ে যায়। এটা যেমন আর একটা দিক, এ ছাড়াও আরো দিক আছে।

এ দিকটি হল, বিভাজন সম্ভাবনা আছে এমন কোষ কিছু কিছু সব কলাতেই থাকে। কোন কোষ নষ্ট হলে বা খোয়া গেলে, সম্ভাবক কোষগুলি আত্মবিভাজনের দ্বারা নতুন কোষ সৃষ্টি করে নেয়। এই হিসাব অনুসারে কোষেদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল চলমান কোষ, অর্থাৎ যে কোষ সর্বদাই বিভাজন করে যেতে পারে। দ্বিতীয়টি হল রক্ষণশীল কোষ, অর্থাৎ যখন প্রয়োজন নেই তখন তাদের বিভাজনও হয় না। কিন্তু স্থানীয় কোষ নষ্ট হয়ে গেলে তখন রক্ষণশীল অবস্থা ছেড়ে এই কোষই বিভাজনে অংশ নেয়। তখন তাদের DNA বিপাক হয়ে যায় অন্য কোষের মত। তৃতীয় ধরনের কোষ হল স্থায়ী কোষ। এই কোষগুলির বিভাজন জন্মের অল্প পর থেকেই আর থাকে না। এর মধ্যে আবার স্নায়ু বা হৃৎপিণ্ডের কোষে বিভাজন না হলেও DNA নবীকরণ কিন্তু চলতেই থাকে। কোষ বিভাজনের চালিকা শক্তি কি তা জানা নেই।

কোষ বৃদ্ধির অস্বাভাবিকতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

1. অতিবৃদ্ধি (hypertrophy)। এর বিপরীত অবস্থা হল বৃদ্ধির অভাব (atrophy)—ও পঙ্গুতা।

2. অপরায়ন (metaplasia), অর্থাৎ একরকমের কলার অন্য কলার মত হওয়া।

3. সীমাহীন বৃদ্ধির অবস্থা (neoplasia)। টিউমার ক্যানসার ইত্যাদি হওয়া।

অতি বৃদ্ধি ঃ দেহের যখন প্রয়োজন, তখন যেসব কোষ বৃদ্ধির উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারে, তারা সাড়া দিয়ে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। এ কোষগুলির বর্ণনা আগেই করা হয়েছে।

কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি

একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়েরও বৃদ্ধি ও অতিকায়িকতা (hyperplasia) ঘটতে পারে, যখন দৈহিক প্রয়োজনের খাতিরে সেই বিশেষ অঙ্গের কোষগুলি ভাগ হয়ে আরো বহুতর কোষের সৃষ্টি করে। এই বৃদ্ধির সঙ্গে অন্য রকমের বৃদ্ধি বা স্ফীতির তুলনা করলে তফাৎটা বোঝা যাবে। স্ফীতি রক্তাধিক্য (hyperaemia), শোণিতস্রোত রুদ্ধ হয়ে (congestion), জল বা রসাধিক্যের (oedema), জন্য প্রদাহ, এ্যামাইলয়েড জমা হয়ে অথবা টিউমারের জন্য হতে পারে।

কোষবৃদ্ধি ও বিভাজন সাধারণভাবে ততক্ষণই চলে, যতক্ষণ তার বিশিষ্ট উত্তেজকটি উপস্থিত থাকে। উত্তেজকটি চলে গেলে বৃদ্ধি আবার পূর্বের আয়তন ও কোষ সংখ্যায় ফিরে আসে। এইখানেই টিউমারের সঙ্গে অন্য বৃদ্ধির তফাৎ। কারণ টিউমার বা ক্যানসার শুধু বৃদ্ধি পেতেই থাকে।

অন্তক্ষরণ গ্রন্থীর কোষবৃদ্ধি

এই গ্রন্থীগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী যেভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে পারে, তা থেকে প্রয়োজন ভিত্তিক বৃদ্ধির দিকটা বোঝা যায়। ঐ বৃদ্ধি স্থানীয় অথবা ছড়ানো হতে পারে। কখনো কয়েকটি বিশেষ বলকই (nodule) শুধু বৃদ্ধি পেতে থাকে। একে টিউমারধর্মী সরল অর্বুদ বা এ্যাডিনোমা বলা হয়। এও সঠিক টিউমার নয়।

অন্তক্ষরণ গ্রন্থীর লক্ষ্যস্থল যে ইন্দ্রিয় সেই প্রত্যঙ্গের কোষবৃদ্ধি

বক্ষ ঃ ইষ্ট্রোজেন ও প্রেজেষ্টেরণের প্রভাবে নারী বক্ষের কোষবৃদ্ধি ও স্ফীতি কৈশোরে, গর্ভাবস্থায়, সন্তান জন্মের পর ও ঋতুবন্ধের পূর্বাহ্নে দেখা যায়। তবে কৈশোরের স্ফীতি প্রধানতঃ চর্বি জমা হবার জন্য, বক্ষের গ্রন্থীর

স্ফীতির জন্য ততটা নয়। এ স্ফীতির পরবর্তী স্তরে সংযোগকারী কলা ও নালিকাসমূহের স্ফীতি ও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। তারপর গ্রন্থীসমূহের স্ফীতি ও সংখ্যাধিক্য ঘটে। এই অবস্থার ইতরবিশেষে আবার কোষ গঠিত থলি কোষ বা সিষ্টের উদ্ভব হয়, সিষ্ট রোগ (cystic disease) হতে পারে। প্রজেষ্টরণ কম ও অতিরিক্ত ইষ্ট্রোজেনের জন্য এই রোগ হয়, তবে এ অবস্থাকে প্রাক ক্যানসার বলা যায় না। পুরুষ মানুষের প্রষ্টেটের ক্যানসারে যখন গোনাডেট্রেপিন দিতে হয়, তখন পুরুষেরও স্তনবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

জরায়ুর এণ্ডোমেট্রিয়াম ঃ দীর্ঘদিন ধরে ইষ্ট্রোজেনের দ্বারা প্রভাবিত হলে এণ্ডোমেট্রিয়ামের স্ফীতি ও কোষবৃদ্ধি হয়ে এক সেন্টিমিটার পর্যন্ত পুরু হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ তা দেখে ক্যানসার বলে ভুল হতে পারে।

আচ্ছাদক এপিথিলিয়াম কোষ ঃ দেখা গেছে, বার বার কোন উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করা হলে এপিথিলিয়াম কোষে বিভাজনের বিস্ফোরণ যেন সুরু হয়ে যায়। চামড়ায় এইরকম কোষ বিভাজন হয়ে হয়ে যাকে কড়া পড়া বলে, তাই হয়ে যায়। তবে এপিথিলিয়ামের বিভাজন অনেক রোগেরই নির্দেশক বলা যায়। যেমন সেরায়েসিস চামড়ার প্রদাহ ইত্যাদি। এমনকি পানবসন্ত ইত্যাদির প্রাথমিক স্তরে কোষ বিভাজনই শুধু দেখা দিয়ে থাকে। পিত্তথলিতে অনুরূপ অবস্থা অনেক সময়ে ক্যানসার কি না, এ প্রশ্নও জাগায়।

বৃক্ক ঃ একটি বৃক্ক অপসৃত হলে অন্যটি কোষ বিভাজনের সাহায্যে স্ফীত হয়ে তার কার্যভার গ্রহণ করে।

অস্থিমজ্জা ঃ যখন নতুন করে রক্ত উৎপাদনের দরকার, অর্থাৎ যখন রক্তাল্পতা দেখা দেয়, তখন মজ্জার কোষের দ্রুত বিভাজন সুরু হয়ে যায়। অন্য সময়ে প্রয়োজন না থাকলে এই মজ্জার ভিতর রক্তকণিকা তৈরি করার কোষগুলি চর্বির কোষ হিসাবে থাকে।

রেটিকিউলো-এণ্ডোথিলিয়্যাল কোষ ঃ এই কোষের বিভাজন সুরু হয় যখন বিশেষ বিশেষ রোগাক্রমণ ঘটে।

যকৃত ঃ যকৃতের কোষের কোন কারণে মৃত্যু ঘটলে নতুন কোষ উৎপন্ন করার জন্য কোষ বিভাজন করে নতুন কোষ উৎপন্ন হতে থাকে।

অতিবৃদ্ধি ও তার মূলে যে অতি বিভাজন আছে, এর সঙ্গে টিউমার ও ক্যানসারের মিল খুব বেশী। মারাত্মক না হয়ে ওঠা পর্যন্ত কমই বলা যায়

এই তফাৎটা। তবে অতিবিভাজন জনিত বহুকোষিক অবস্থাটা অণুবীক্ষণে দেখে, ক্যানসার বলে ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। শরীরের বিভিন্ন কলায় এটা হতে পারে।

লসিকাগ্রন্থী : লসিকাগ্রন্থীর বৃদ্ধি হয়ে সেগুলি থলিকার (follicle) আকার নেয়। তখন অণুবীক্ষণে দেখে লিম্ফোসাইট কোষে তৈরি লিম্ফোমা বলে মনে হতে পারে। তবে এসব অতিবৃদ্ধি কখনও ক্যানসার হয়ে ওঠে না।

চামড়া : চামড়ায় যদি কোন ঘা দীর্ঘদিন ধরে থাকে, তাহলে উপরের স্তর থেকে এপিথিলিয়াম কোষ নিচে নেমে আসে, অতিবৃদ্ধির ফলে। অনেক সময়ে অণুবীক্ষণে দেখলে ক্যানসারের সঙ্গে তফাৎ করা খুব দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এই ধরনের পরিবর্তনকে কেরাটো-এ্যাকানথোমা বলা হয়। বেশ কিছুদিন থাকার পর এগুলি নিজে থেকেই খসে পড়ে। এ ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘ সৌরতাপের ফলে হতে দেখা যায়, যেমন হয় চামড়ার ক্যানসার।

পেশীতে : যে অনুরূপ পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় মায়োব্লাষ্টোমা।

অবক্ষয় (atrophy) ও অতিপুষ্টি (hypertrophy) নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। তবু টিউমার, ক্যানসার, এইসব অতি দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কিছুটাও বুঝতে হলে এই প্রসঙ্গগুলির পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

অতিপুষ্টি বা হাইপারট্রফি

সেই প্রত্যঙ্গের নিজস্ব কার্যকর কোষ আয়তন বৃদ্ধি করে অতিপুষ্টি করে। এই ধরনের পরিপূর্ণ অতিপুষ্টি দেখা যায় পেশীতে, ব্যায়াম বা অতি-ব্যবহারে।

পেশী : ইচ্ছায়ত্ত নয় যে পেশী, সে পেশীতে যখন অতিবৃদ্ধি ঘটে, তখন তার কোষের আয়তন বৃদ্ধি হয়ে এর বর্ধন ঘটে।

মূত্রথলি : যেমন মূত্র বহির্গমন নলের সরু হয়ে যাওয়া কিম্বা প্রষ্টেটের বৃদ্ধি।

অন্নবিলের অবরোধ : অন্নবিলে ক্যানসার।

পাকস্থলী : অবরোধ ; ক্যানসার।

অন্ত্র : ক্রোন ব্যাধি ; ক্যানসার।

জরায়ুঃ গর্ভাবস্থায় জরায়ুর প্রতিটি কোষের যে বৃদ্ধি হতে দেখা যায়, তার তুলনা নেই। লম্বায় দশগুণ ও চওড়ায় পাঁচগুণ পর্যন্ত বড় হয় প্রতিটি কোষ। প্রধানতঃ ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে, ও কিছুটা বর্ধনশীল ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য এই আয়তনবৃদ্ধি ঘটে।

ধমনীঃ রক্তচাপ বৃদ্ধিতে ধমনীর কোষের আয়তন বৃদ্ধি ঘটে।

হৃৎপিণ্ডঃ সদ্যজাতের হৃৎপিণ্ডের ওজন থাকে 30 গ্রাম। এর সাতগুন বৃদ্ধি পায় পরিণত বয়সে। এটা নতুন নতুন কোষ তৈরি করা হয় না। হয় কোষের আয়তন বেড়ে। যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই এইভাবে কোষের আয়তন বৃদ্ধি হতে থাকে। এটা দেখা যায়, যখন রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়ে হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ের বৃদ্ধি ঘটে। এই অবস্থাকে গো-সুলভ বৃদ্ধি (bovine heart) বলে। অনেকক্ষেত্রে যেমন ফুসফুসে রক্ত সংবহনে চাপ, ও ফুসফুসের নানা ব্যাধিতে, দক্ষিণ অলিন্দেরও আয়তন বৃদ্ধি পায়।

অণুবীক্ষণে কোষের নিউক্লিয়াস চতুষ্কোণ (অন্য নিউক্লিয়াসের সঙ্গে তফাৎ) দেখায়। আর সেই সঙ্গে কিন্তু রক্ত সংবহন ধমনীর বৃদ্ধি হয় না, যে জন্য রক্তাল্পতা ও বিবিধ করোনারি ব্যাধির প্রকোপ ঘটে।

দুষ্পুষ্টি বা (Dystrophy)ঃ নাম থেকেই বোঝা যাবে, এ ধরনের পরিবর্তনকে পুষ্টি নাম দেয়াটাই ভুল। কারণ, প্রথমদিকে আকারে কিছুটা পুষ্ট দেখালেও কোষগুলির পেশীকোষ থেকে পরিবর্তন হয়ে তন্তুকোষে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। পেশীর চারিপাশে চর্বি জমা হতে দেখা যায়। পেশী এতে কমজোর হয়ে যায়।

কোষের আয়তনবৃদ্ধি (hypertrophy) ও সংখ্যাবৃদ্ধি (hyperplasia) এ দুটি ভিন্ন। প্রথমটির জন্য যে উত্তেজক তা হল আয়তন বৃদ্ধির উত্তেজক। কিন্তু দ্বিতীয়টির উত্তেজক হল হর্মোন জাতীয় রসায়ন।

অবক্ষয়তা (Atrophy)

পুরাতন কোষ মরে গিয়ে, সেই জায়গায় নিয়ত নতুন কোষের উদ্ভব হতে থাকে অগোচরে। কোন টিস্যু বা কলার অবক্ষয় হতে পারে একাধিক কারণে। যে কোষ মরে গেল, তার বদলে যদি নতুন কোষের উদ্ভব না হয়, তা হলে ; অথবা যদি কোষ তার জলীয় বস্তু হারিয়ে ফেলে ও নিউক্লিয়াস ছোট হয়ে গিয়ে সাধারণভাবে কোষ ও নিউক্লিয়াস এমনকি পুরো কলা, কি

প্রত্যঙ্গটাই ছোট হয়ে শীর্ণ হয়ে যায়, তাতে অবক্ষয় হতে পারে। একে অপবর্ষণ বা ইনভোলিউশান (involution) বলা হয়। ভ্রূণাবস্থায় যেমন নটোকর্ডে, জন্মের পরে নাভিতে, পরবর্তিকালে লসিকগ্রন্থীর এইভাবে হ্রাস ঘটে। এগুলি শরীরের বিকারহীন অবস্থাতেই ঘটে থাকে।

বিকারতাত্ত্বিক অবক্ষয়

অনশনজনিত অবক্ষয় ঃ দীর্ঘদিন অনশনে থাকলে, শর্করা ও চর্বি-জাতীয় বস্তু প্রথমেই ক্ষয় হয়ে যায়। তারপর ক্ষয় হয় প্রোটিনের। অবশ্য হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ুর প্রোটিন থাকে সবচেয়ে শেষ পর্যন্ত।

বার্ধক্যের অবক্ষয়তা ঃ বিশেষ প্রত্যঙ্গে, যেমন হৃৎপিণ্ডে হলুদ বর্ণের অবক্ষয় দেখা দেয় বার্ধক্যে।

অন্তক্ষরণ গ্রন্থীর অবক্ষয় ঃ দেখা যায় তখনই, যখন পিটুইটারির জন্য থাইরয়েড, এ্যাডরেন্যাল, যৌন গ্রন্থী ক্ষীণ ও অবক্ষয় হয়ে যায়।

অস্থি ঃ ক্যালসিয়াম ও অন্য খনিজ বস্তু কমে যেতে থাকে বলে অস্থি দুর্বল ও কমজোর হয়ে যেতে থাকে। এটা যেমন সারা শরীরে হতে দেখা যায়, তেমনি বিশেষ বিশেষ অস্থিতেও দেখা যায়। অস্থি দুর্বল হয়ে যাবার জন্য সহজেই এই অবস্থায় হাড় ভেঙ্গে যায়। এক্সরে ছবিতে অস্থির ঘনত্বের অভাবটা দেখা যায়। অস্থির গঠন ও ভাঙ্গনের দু'দিক সমানভাবেই চলতে থাকে পূর্ণবয়স্ক অবস্থাতেও। গঠনের দিকটা দুর্বল হলেই ভাঙ্গার অতিরিক্ত-তার জন্য এ দুর্বলতা দেখা যায়। তা সত্ত্বেও রক্তরসে ক্যালসিয়াম, ফসফেট কি এ্যালকেলাইন ফসফ্যাটেজ অনুঘটকের ইতরবিশেষ হয় না।

কি কারণে যে ক্যালসিয়াম কমে যায় অস্থিতে, তা জানা না থাকলেও দীর্ঘ রোগভোগ, কোলাজেন তৈরির বাধা, অতিরিক্ত গ্লুকোকর্টিকয়েড, স্কার্ভি, অন্তক্ষরা গ্রন্থীর কাজের ব্যহত হওয়া, বার্ধক্য ও ঋতুস্রাব বন্ধ হবার সময়ে অস্থির ক্যালসিয়াম কমে যেতে পারে।

অন্য ব্যাধি যাতে অস্থি দুর্বল হয়

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থীর অতিকর্মঠতা ঃ এই গ্রন্থী অতিকর্মঠ হলে, কি এতে কোন টিউমার থাকলে, যে কোষগুলি অস্থি ভাঙ্গার কাজ করে, সেগুলি কর্মঠ হয়ে ওঠে। এতে অস্থির কাঠিন্য কমে গিয়ে দুর্বলতার সৃষ্টি

করে। এ্যালকেলাইন ফসফাটেজ অনুঘটকের আধিক্য এই অবস্থায় দেখা যায়।

স্থানীয়ভাবে নানা কারণে অবক্ষয়তা দেখা দিতে পারে। এ কারণগুলি হল : রক্তাল্পতার জন্য—কোন স্থানে ধমনীতে কোন বাধা সৃষ্টির জন্যই হক, বা অন্য যে কোন কারণে যদি রক্ত উপযুক্ত পরিমাণে না থাকে, তাহলে সে জায়গাটি শীর্ণ হয়ে যেতে দেখা যায়। ঠিক অনুরূপভাবে কোন জায়গায় চাপের জন্যও শীর্ণতা হতে পারে। চাপের ফলও রক্তাল্পতা। এছাড়া অব্যবহারের জন্যও শীর্ণতা হতে পারে। যেমন দেখা যায়, কোন জায়গায় প্লাষ্টার করা থাকলে সেখানটার নড়াচড়া, ব্যবহার হয় না বলে, জায়গাটা শুকিয়ে যায়। স্যুডেক এই ধরনের অস্থির শীর্ণতা ও অবক্ষয়তার বর্ণনা দিয়েছেন। স্নায়ুজাত—কোন প্রত্যঙ্গের বা তার অংশবিশেষের স্নায়ু যদি পক্ষাঘাতগ্রস্থ বা অকর্মণ্য হয়ে যায়, তার ফলে সেই প্রত্যঙ্গ শীর্ণ হয়ে যেতে দেখা যায়। কারণ বোঝা যায় না, এমন কোন (ideopathic) কোন ক্ষেত্রেও অবক্ষয়তা দেখা যায়।

শরীরকলার ক্রমপ্রভেদনিরূপণে বাধা

ক্রমনিরূপণের (differentiation) মধ্যে দিয়ে শরীরের এক ধরনের কলা অন্য কলার থেকে আকারে কি কাজে এতটা ভিন্ন হয়ে ওঠে।

অপরায়ন (metaplasia) : কোন এক বিশেষ ধরনের, বিবর্তিত কলা যদি অন্য এক বিবর্তিত কলার রূপে অপরায়িত হয়ে সেই কলার রূপ নেয়, তখন সেই অবস্থাকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এটা যেন, বিবর্তনের রাস্তায় আবার পিছু হেঁটে কতকটা পিছিয়ে এসে, সেই কলার যে রাস্তায় যাবার কথা নয়, সেই রাস্তায় গিয়ে অন্য কলার রূপ গ্রহণ করা। এইভাবে, এপিথিলিয়াম হয়ে যেতে পারে স্নায়ু কলা বা সংযোগকারী কলা। বিবর্তনে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর দেহকলায় এ ক্ষমতা বেশী থাকে। যেমন কোন জাতের সরিসৃপের চোখের লেন্স নষ্ট হয়ে গেলে আশপাশের অন্য কলা অপরায়িত হয়ে লেন্স হয়ে যেতে পারে।

অপরায়ন বা মেটাপ্লেসিয়ার রকমফের বড় কম নয়।

বহিচর্মের বা স্কোয়ামাস অপরায়ন : সব জায়গাকার আচ্ছাদক কোষই স্কোয়ামাস কোষে পরিণত হতে পারে, দীর্ঘকাল কোন উত্তেজক

বস্তুর সঙ্গে থাকলে। কিম্বা একই জায়গায় অবিরত আঘাত লেগেও হওয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ : (1) দীর্ঘ প্রদাহের পর পিত্তথলিতে (2) বৃক্ককের পেলভিস কি মূত্রথলীতে (3) জরায়ুর অন্তর্বর্তী এণ্ডোমেট্রিয়ামে (4) শ্বাস-নলীতে—দীর্ঘ প্রদাহের পর (5) প্রষ্টেট গ্রন্থীতে। শুধু উত্তেজকই নয়, ভাইটামিন A কম হওয়াও এর অন্যতম কারণ।

অন্য কোষের স্কোয়ামাস কোষে পরিবর্তিত হওয়ার যে অপরায়ণ সেটা সহজ। কিন্তু এর ঠিক বিপরীত অর্থাৎ স্কোয়ামাস বা অন্য কোষের স্তম্ভসদৃশ যে কলমনার এপিথিলিয়ামেও, অপরায়ণ হয়। তবে তার প্রবণতা কম। জরায়ু-গলদেশের যে অংশ যোনিমুখে থাকে (vaginal portion of cervix) তার এপিথিলিয়াম স্কোয়ামাস। কিন্তু সেখানে ক্ষত (erosion) হয়ে যখন নতুন এপিথিলিয়াম তৈরি হয়, তখন তা কলমনার স্তম্ভসদৃশ হয়ে অপ-রায়িত হয়।

সংযোগকারী কলায় অপরায়ন

অস্থিতে অপরায়ন : ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষ অস্থিতে রূপান্তরিত বা অপ-রায়িত হতে পারে কি না, এ নিয়ে বিতর্ক ছিল। এর উত্তরে অনেকে বলেন যে ফাইব্রোব্লাষ্ট অপরায়িত হলে তবেই তা অস্থিসৃজক অষ্টিওব্লাষ্টে পরিণত হতে পারে। এটা কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রেকিয়ার তরুণাস্থিতে ঘটতে দেখা যায়। এ ছাড়া কোন ক্ষত শুকোবার পর সেই জায়গার অস্থিতে রূপান্তরও অপরায়নের আর একটি উদাহরণ। পেশীতে আঘাত লাগবার পর সে জায়গাতে এ রকম অপরায়ন হয়ে অস্থিতে এর অংশবিশেষ রূপান্তরিত হতে দেখা গেছে। একে পেশীপ্রদাহজনিত অস্থিতে অপরায়ন (myocitis ossificans) বলা হয়। এতে অস্থিসৃজক কোষ অস্থির আবরণ (periostium) থেকে আসে।

জিন মাধ্যমে বংশানুক্রমিত হয় এমন দু-একটি ব্যাধি আছে, যা বেশী হয় না। এর একটির নাম ফাইব্রোডিসপ্লেসিয়া অসিফিক্যানস প্রোগ্রেসিভা। নাম থেকে যেমন বোঝা যায়, শরীরের বিভিন্ন জায়গার তন্তুজাতীয় কলা অস্থি হয়ে যেতে থাকে। অন্যটি মাইয়োসাইটিস অসিফিক্যানস, যাতে পেশী বা তার অংশবিশেষ অস্থিতে পরিণত হয়।

টিউমার অপরায়ন

ক্যানসার বা টিউমারে দেখা যায়, মিশ্র কলার উপস্থিতি। একই সঙ্গে স্কোয়ামাস, অর্থাৎ বহিচর্মের কোষ ও তার সঙ্গেই গ্রন্থীকোষ, বা কলামনার কোষের সহাবস্থানে এক ধরনের ক্যানসার, যাকে এ্যাডিনো-এ্যাকানথোমা বলে তাই দেখা যায়। এও আর এক ধরনের অপরায়ন, যা টিউমারে হয়েছে বলে মনে করা হয়। ফুসফুসের ক্যানসারে এটা খুব দেখা যায়। পিত্তথলিতেও এই রকম চামড়ার স্কোয়ামাস কোষ দেখা যায়। লালাগ্রন্থীতে এ রকম টিউমার দেখা যায়।

একটি প্রশ্ন প্রায়ই ওঠে, যে স্কোয়ামাস কোষে অন্য কোষের অপরায়ন মানেই কি ক্যানসার? কিন্তু সেটাও নির্ভর করে কোন পথে ও কতটা দ্রুততার সঙ্গে এই অপরায়ন ঘটছে। কোষ প্রথমে ক্যানসার অভিমুখী হয়ে তার পরবর্তী অধ্যায়ে ঘটতে পারে এই অপরায়ন ক্রিয়া। অথবা অতি দ্রুত অপরায়ন ক্রিয়াই ক্যানসারের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হতে পারে।

গ্রীক ভাষার শব্দনিচয় ক্যানসার, বৃদ্ধি পুষ্টি এসব ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত হয় এগুলি : Dys—দুরূহ, Kerasis—মিশ্র, Plasis—সৃজন, সৃষ্টি, উদ্ভব, Trophy—পুষ্টি ইত্যাদি। সংস্কৃতেও এরকম উপ বা অনু শব্দাংশের অভাব নেই।

22 টিউমার বা ক্যানসারের শ্রেণীবিভাগ

ক্যানসারের শ্রেণীবিভাগ করার প্রয়োজন ক্যানসার কি, তা বোঝার জন্য তো বটেই, এমনকি ক্যানসারের চিকিৎসা বা নিরাময় যদি কোনদিন সফল হয়, তার জন্যও এর প্রয়োজন। তবে সে আলোচনায় আসার আগে, মনে করতে হয়, যে ক্যানসারের সঠিক সংজ্ঞা দেয়াও কঠিন। পাওয়েল হোয়াইট বলেছিলেন, "টিউমার এক গুচ্ছ কোষ, যেগুলি স্থানীয় কোষের মতনই, কিন্তু তার বিন্যাস বা সাজানোটা নিয়ম বহির্ভূত। প্রাণীর পুষ্টি হরণ করেই এরা বাঁচে কিন্তু তার কোন উপকারেই আসে না।"

বিন্যাসটা যত অস্বাভাবিক, তার চেয়ে ঢের বেশী অস্বাভাবিক হল এই কোষগুলির আচরণ। এরা যেন নিজ দেহেই পরগাছা, নিজেদের খুসীমত।

ক্যানসারের উদ্ভব যেন অকারণে। যদিও রেডিয়েশান, কোন রসায়ন, বিশেষ ভাইরাস, উত্তেজক হিসাবে কাজ করে। কোষের স্বাভাবিক বিভাজনে, বিভাজন চলে ততক্ষণ, যতক্ষণ উত্তেজকটা আছে। ক্যানসারের ক্ষেত্রে কিন্তু একবার কোষ বিভাজন সুরু হলে, উত্তেজক থাক আর নাই থাক বিভাজন বৃদ্ধি চলতেই থাকে।

শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন ভিত্তিতে টিউমারের শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা হয়েছে। এগুলি হল—(1) আপাতদর্শন অনুযায়ী (2) ভ্রূণাবস্থায় কলার উৎপত্তি অনুসারে (3) কলার ও টিস্যুর শ্রেণী অনুযায়ী (4) ব্যবহারমূলক (5) কারণ অনুসারে (6) কাজ অনুসারে।

প্রথম যখন দেহের কোন জায়গায় একটা টিউমার চোখে পড়ে, তখন চোখে দেখে, হাতে অনুভব করে, কোন প্রত্যঙ্গ থেকে তার উদ্ভব হচ্ছে ও তা ছড়িয়েছে কি না, এ সব বোঝার চেষ্টা করা হয় প্রাথমিক পরীক্ষায়। এরও মূল্য আছে।

শরীর কলাকে আমরা এপিথিলিয়াম বা বহিরাঙ্গের কোষ, মধ্যাঙ্গ বা মেজোথিলিয়াম ও ভিতরাঙ্গ বা এণ্ডোথিলিয়াম এই ভাবে ভাগ করা হয়।

কিন্তু এতেও সমস্যা থেকে যায়। কেন না সংযোগকারী বা আচ্ছাদক যে কাজেরই হক সেই কলা, তার টিউমার বা ক্যানসার হলে, তা গ্রন্থীর এ্যাডিনোকারসিনোমা হয়ে উঠতে পারে। যেমন মধ্যাঙ্গের ফুসফুস আচ্ছাদক প্লুরার টিউমারে দেখা যায়।

এই অবস্থা পেরিটোনিয়ামেও হয়। এখানের ক্যানসার এপিথিলিয়ামের ক্যানসার, কারসিনোমার রূপ নেয়।

আবার সঠিক রূপ গ্রহণ করেনি (undifferentiated) এমন ক্যানসার, যা অতি মারাত্মক, তা তো খুবই দেখা যায়। সেক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগ কষ্টসাধ্য।

টিউমারই যে নিজগুণে অপরায়ন সম্ভব করে, এ কথা আলোচিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রেও শ্রেণীবিভাগ কষ্টসাধ্য।

বিশিষ্ট ধরনের কলা থেকেও বিশেষ ক্যানসার হয়। তাদের বিশিষ্টতার জন্যই শ্রেণীবিভাগ অসম্ভবের কাছাকাছি হয়ে দাঁড়ায়।

কিছু ক্যানসার আছে, যা ভ্রূণ বা ভ্রূণের যে ফুল থেকে জন্মায়। এগুলির উদাহরণ হল যথাক্রমে টেরাটোমা, কি নেফ্রো অথবা নিউরো-ব্লাষ্টোমা, কি কোরিওকারসিনোমা বা হাইডেটিডিফর্ম মোল।

টেরাটোমার উদ্ভব হয় সর্ববিধ সম্ভাবনা আছে, এমন কোষ থেকে (totipotent)। সর্ববিধ সম্ভাবনা পূর্ণ এই কোষ থেকে, যে কোন কলারই উদ্ভব সম্ভব। বহির, মধ্য ও অন্তর ত্বক থেকে উদ্ভূত যে কোন বা একাধিক কলা একই সঙ্গে টেরাটোমায় থাকতে পারে। এটাকে মিশ্র ধরনের টিউমার বলা যায়। তাই একে বহু সম্ভাবনাময় (pluripotent) অবস্থা বলা হয়।

কলা সম্পর্কিত শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে (histological), সঠিক কলার রূপ গ্রহণ করেনি এমন টিউমারের শ্রেণীবিভাগ করা শক্ত। এদের চারিত্রিকতা-হীন (anaplastic) টিউমার বলে।

টিউমারের ব্যবহার দুরকম: মারাত্মক ও নিরীহ। তবে এর মধ্যেও আবার কিছু ইতরবিশেষ থাকতে পারে।

নিরীহ টিউমার: বলতে আমরা বুঝি, যার দূরের বা কাছের কোন প্রত্যঙ্গ বা কলাকে আক্রমণ করবার প্রবণতা নেই। এর ভিতরের অংশ থেকেই যেন একটি ঘেরাটোপ বা পেটিকা (capsule) একে ঘিরে থাকে, যা এর কোষকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য কোথাও বাসা বেঁধে ছড়িয়ে যেতে দেয় না।

এর বৃদ্ধি মন্থর। যে কলা থেকে জন্ম, তার কোষের রূপ ও প্রকৃতি নিয়েই এরও কোষ। পরিণতিজ্ঞাপক ভিন্নতাও (differentiation)-এর কোষে লক্ষণীয়।

মারাত্মক টিউমারঃ সাধারণভাবে ক্যানসার বলেই অভিহিত। কাছের ও দূরবর্তী কলাকে আক্রমণ করতে পারে। এসব জায়গায়ও প্রাথমিক টিউমারের প্রতিচ্ছবি নিয়ে এক বা একাধিক টিউমার গড়ে ওঠে। ছড়ানোর রাস্তা ধমনীনালিকা বা লসিকানালিকার পথে। স্থানীয়ভাবে ও অংশবিশেষ খসে গিয়ে দূরবর্তী কলা আক্রমণ করতে পারে। বৃদ্ধি ও আক্রমণের ক্ষমতাও থাকে যথেষ্ট।

অণুবীক্ষণে দেখলে মারাত্মক টিউমারের কোষ ও কলাকে জনক কোষ-কলা থেকে ভিন্নতর মনে হবে রূপ যার বহুবিধ।

মাঝারি ধরনের মারাত্মক বা স্থানীয় আক্রমণশীল বলে মুরহেড এক ধরনের টিউমারের কথা বলেছেন। এরা অপেক্ষাকৃত দ্রুত ছড়িয়ে কাছাকাছি কলা আক্রমণ করে। এরা দূরে কমই ছড়ায়।

সুপ্ত ক্যানসার (latent)ঃ এ নাম দেয়া হয়েছে সেই জাতের ক্যান-সারের যা অণুবীক্ষণে ক্যানসারের মতই দেখায়, রক্তনালিকা ও লসিকার মাধ্যমে ছড়াতে পারে। তবু হয়ত দীর্ঘকাল উদ্বাহিত (metastasige) নাও হতে পারে। বৃদ্ধদের প্রষ্টেটে এ ধরনের ক্যানসার দেখা যায়। তবে এর কোষবৃদ্ধির ধরনটা ক্যানসারের মত। তবে হর্মোন বা অন্য পারিপার্শ্বিক সুবিধার অভাবে সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

কারসিনোমা-ইন-সিটুঃ এই নাম দেয়া হয়েছে পূর্ণ আক্রমণাত্মক চরিত্র নেই, অথচ কোষের গঠন ও বিন্যাস ক্যানসারের মত, অণুবীক্ষণে দৃষ্ট এই অবস্থাকে। এ অবস্থা অবশ্যই সাবধান হবার যোগ্য।

ক্যানসারের নিজে থেকে সারাঃ এটা অনেক সময় ঘটে। এর সম্পর্কে গবেষণাও হয়েছে প্রচুর। মেলানোমা, হাইপারনেফ্রোমা, কোরিও-কারসিনোমা, ইত্যাদিতে এ রকম ঘটতে দেখা গেছে। কেন যে হয়, তা জানা নেই। মনে করা হয় যে এই কারণের পিছনে হর্মোনের প্রভাব অথবা শরীরের নিজস্ব রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ও অনাক্রম্যতা আছে। মেলানোমা যার সেরে গেছে, এমন লোকের রক্তরসে, কোন কোন রোগীর মেলানোমা কমতে দেখা গেছে। অনুরূপভাবেই ছড়িয়ে পড়ে যেখানে উদ্বাহিত

ক্যানসার হয়েছে, সেই ক্যানসার প্রাথমিক ক্যানসারটি বাদ দিলে আপনি কমে যেতে দেখা গেছে। কোষগুলি নিজে থেকে পরিপূর্ণতা লাভ করলে অনেক সময় ক্যানসার সেরে যায়। এটা অণ্ডকোষের টেরাটোমায় দেখা যায়।

ক্যানসারের শ্রেণীবিভাগ তার কারণের উপরও করার চেষ্টা হয়েছে। তবে যে ব্যাধির কারণ নিয়েই সন্দেহ বহু, সে ব্যাধির এ শ্রেণীবিভাগ সম্ভব হয়নি। বর্তমানে তাই অণুবীক্ষণে যে গঠন ধরা পড়ে, সেই গঠনতান্ত্রিক একটি শ্রেণীবিভাগ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এটি একটি সারণি করে দেয়া হল।

উৎপাদক কলা	নিরীহ	অল্প মারাত্মক	মারাত্মক
এপিথিলিয়াম			
1. স্কোয়ামাস	স্কোয়ামাস কোষ প্যাপিলোমা		স্কোয়ামাস কোষ ক্যানসার
2. মধ্যধর্মী	ট্রানজিসানাল " প্যাপিলোমা		ট্রানজিশান " "
3. স্তম্ভসদৃশ	কলাম্ন কোষ প্যাপিলোমা		এ্যাডিনোকারসিনোমা
রসবর্ষী এপিথিলিয়াম	এ্যাডিনোমা, সিষ্ট-এ্যাডিনোমা, প্যাপিলা সিষ্টাডিনোমা		এ্যাডিনোকারসিনোমা সিষ্ট-এ্যাডিনোকারসিনোমা
সংযোজক তন্তু	ফাইব্রোমা		ফাইব্রোসারকোমা
জাতীয় কলা			
স্নায়ু	নিউরোফাইব্রোমা		নিউরোফাইব্রোসারকোমা
চর্বি	লাইপোমা		লাইপোসারকোমা
আন্ত্রিক পেশী	লিওমায়োমা		লিওমায়োসারকোমা
অস্থির পেশী	র‍্যাবডোমামোমা		র‍্যাবডোমায়োসারকোমা
সন্ধিপদ	সাইনোভিওমা		মারাত্মক সাইনোভিওমা

উৎপাদক কলা	নিরীহ	অল্প মারাত্মক	মারাত্মক
তরুণাস্থি	কণ্ড্রোমা		কণ্ড্রোসারকোমা
অস্থি	অষ্টিওমা	রাক্ষুসে কোষ টিউমার	অষ্টিও-সারকোমা
মেসোথিলিয়াম	মেজোথিলিওমা		মারাত্মক মেজোথিলিওমা
রক্তনালিকা	হিম্যাঞ্জিওমা		এঞ্জিওসারকোমা
স্নায়ু-আচ্ছাদক	ম্যানিন্‌জিওমা		মারাত্মক ম্যানিন্‌জিওমা
বিশেষ সংযোগ কলা			
নিউরোগ্লিয়া ইত্যাদি	এপেণ্ডাইমোমা, অলিগোডেণ্ড্রো-গ্লিওমা, এ্যাষ্ট্রেন-মাইটোমা		
ক্রোমাফিন কলা	ক্যারটিডবডি টিউমার		মারাত্মক ক্যারটিড টিউমার
লসিকা, শোনিত কলা	নিরীহ লিম্ফোমা		বিবিধ লিম্ফোমা, হজকিন, মাইলোমা. লিউকিমিয়া
ভ্রূণের কলা	হাইডেটিডিফর্ম মোল		কোরিও ক্যানসার
ঐ সর্বসম্ভাবনা-পূর্ণ	নিরীহ টেরাটোমা		সেমিনোমা, মারাত্মক টেরাটোমা
ভ্রূণ বৃক্ক			নেফ্রোব্লাষ্টোমা
" যকৃত			হেপাটোব্লাষ্টোমা
" রেটিনা			রেটিনোব্লাষ্টোমা
" মস্তিষ্ক			মেডালোব্লাষ্টোমা
" সংবেদ (sympathetic)	গ্যাংলিওনিউরোমা		নিউরোব্লাষ্টোমা
" যৌন কলা			সারকোম বর্থয়ডিস
নটোকর্ড			কর্ডোমা

উৎপাদক কলা	নিরীহ	অল্প মারাত্মক	মারাত্মক
	রক্তকলা ভ্রূণ	এ্যামিলো-ব্লাষ্টোমা	
পিটুটারি „		ক্রেনিও-ফ্যারিঞ্জিওমা	
শ্বাসনলী „			ব্র্যাঙ্কোজেনিক ক্যানসার
দেহ বর্ণ „			মারাত্মক মেলানোমা
„ ধমনী „			এ্যাঞ্জিওসারকোমা
তন্তুকলা „	নিউরোফাইব্রোমা		নিউরোফাইব্রোসারকোমা
অন্য „	গ্লায়োমা		মারাত্মক গ্লায়োমা

টিউমারের শ্রেণীবিভাগ একটা চলমান বিষয়বস্তু। আমাদের জ্ঞান যত বাড়ছে এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে শ্রেণীবিভাগেরও রদবদল ঘটছে। মূলে একটি কথা সব কিছু বুঝেই সম্ভব আরোগ্য বিধান। আরোগ্য করায়ত্ত হলে একদিন হয়ত সব বদলে যাবে।

23 বেশী হয় এমন টিউমারের গঠন ও আচরণ

মারাত্মক নয়, এমন এপিথিলিয়ামের টিউমার

এ ধরনের টিউমার দু'রকমভাবে উৎপন্ন হতে পারে। চাদরের মত ছড়িয়ে পাতা কোষগুলি থেকে উৎপন্ন হতে পারে। একে বলে প্যাপিলোমা বা সাধারণ আঁচিল। আর কিছু টিউমার সংযোগকারী কলা ছেড়ে ছেড়ে মাঝখানে রেখে টিউমার সৃষ্টি করে। একে বলে এ্যাডিনোমা। এ দুয়ের কিছুটা মিশ্রণও থাকতে পারে।

প্যাপিলোমা

নিরীহ, আঁচিলের মত উঁচু হয়ে ওঠা টিউমার খুব দেখা যায়। এগুলির বোঁটা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। যেগুলির বোঁটা থাকে, তাদের বলে পলিপ। হাতে যেমন অনেক আঙ্গুল থাকে সেইরকম আঙ্গুলের মতও এগুলির গড়ন হতে পারে। এ টিউমার কোষের মাঝে মাঝে সংযোজক কলা এ টিউমারকে ধরে রাখে ও এর গড়নটার জন্য দায়ী। নতুন গড়ে উঠছে এই রকম এপিথিলিয়াম কোষ দিয়েই এ টিউমার। যেখানটা গড়ে উঠছে সেখানে কোষ বিভাজন দেখা যায় মাইটোসিসের মাধ্যমে। যে পর্দায় বা আচ্ছদনে টিউমার ঢাকা, সে আচ্ছাদন ভাঙ্গতে বড় দেখা যায় না। তবে ভাঙ্গেনি যে, এটা বোঝা অণুবীক্ষণে দেখেও শক্ত হতে পারে। প্যাপি-লোমারও রকমফের আছে।

ষ্ট্রাটিফায়েড স্কোয়ামাসকোষ প্যাপিলোমা

এই ধরনের টিউমার চামড়ায় বা শরীরের বহির্দেশে হতে দেখা যায় যেমন জিভ, স্বরযন্ত্র, পায়ু। বাইরের যে কোষে কেরাটিন থাকে, সেই কোষের সংখ্যাধিক্য হতে থাকে। তার ফলে অতিপরিণত কেরাটিন থাকা কোষেও নিউক্লিয়াস থাকতে দেখা যায়। :এই অবস্থাকে প্যারাকেরাটোসিস বলে। কোন ভাইরাস আক্রমণে, যেমন ভেরুকা ভালগারিসেও এরকম দেখা যায়। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এই অবস্থা থেকে কোষের রূপান্তর ঘটে ক্যানসারও হতে দেখা যায়।

পরিবর্তনশীল ট্রানজিশানাল কোষে প্যাপিলোমা

এ টিউমার হয় মূত্রথলিতে। একাধিক টিউমার একসঙ্গে হতে পারে। ফুলকপির গড়নের মত কেশলী বা ভিলাস থাকে এ টিউমারে। বোঁটা ছিঁড়ে রক্তপাত খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এদের মারাত্মক বলেই ধরা হয়।

স্তম্ভ-সদৃশ কলার কোষে প্যাপিলোমা

অন্ত্র প্রভৃতি জায়গায় এই কোষ আছে বলে এই ধরনের প্যাপিলোমা দেখা যায়। ভিলাস থাকার জন্য এ প্যাপিলোমাকে এ্যাডিনোমা বলে ভুল হয়। কোষ গঠিত থলি বা সিষ্ট (cyst) নিয়ে যে প্যাপিলোমা তাকে সিষ্টিক প্যাপিলোমা বলে। এ টিউমার দেখা যায়, স্তনে, পিত্তথলিতে, শ্বাসনলীতে।

এ্যাডিনোমা

গ্রন্থীর নীরেট টিউমারকে বলে এ্যাডিনোমা। গ্রন্থীর কলিকাগুলি স্তম্ভের মত লম্বা কোষ বা চতুষ্কোণ কোষ দিয়ে তৈরি হতে পারে। অন্তর-শ্রাবী গ্রন্থীর কলিকা নাও থাকতে পারে।

যেসব এ্যাডিনোমা কোন তলের সংলগ্ন হয় তার ডাঁটা বা বোঁটা থাকে। বৃহদন্ত্রের টিউমারে এটা খুব দেখা যায়। এগুলি অজস্র সংখ্যায় মলদ্বারে পর্যন্ত থাকতে পারে। স্বাভাবিক কোষের মতই এর কোষ। তবে আকারে একটু বড় হতে পারে। কোন রকম ব্যতিক্রম চোখে পড়লেই তা ক্যানসার অর্থাৎ মারাত্মক টিউমার হয়ে উঠছে বলে মনে করা উচিত।

সিষ্টাডিনোমা বা কোষ গঠিত থলির সৃষ্ট এ্যাডিনোমাতে আঙ্গুলের অংশগুলি ঝুলে ঝুলে থাকে। ডিম্বাশয়ে এই ধরনের এ্যাডিনোমা দেখা যায়। কোন ক্ষেত্রে মিউসিন নিঃসরণ হতে পারে।

ফাইব্রো-এ্যাডিনোমা স্তনে সংযোগকারী কলা, গ্রন্থী-চতুর্পাশে থাকে। এ টিউমার গ্রন্থীর ও সংযোগকারী কলা দুয়েরই টিউমার। এ টিউমার মিশ্র টিউমার। যদি মারাত্মক হয়ে ওঠে, তা থেকে সারকোমা বা কারসি-নোমা দুই হতে পারে। এই টিউমারের হর্মোনের প্রভাব যথেষ্ট। এ জন্য মাসিক বন্ধ হলে কমে যেতে পারে।

সংযোগকারী কলায় নিরীহ টিউমার

এপিথিলিয়ামের টিউমারের তুলনায় এ টিউমারের গুরুত্ব কম। তবে, সবচেয়ে বেশী যে টিউমার হতে দেখা যায়, তা এই শ্রেণীর, অর্থাৎ জরায়ুর ফাইব্রোমা। একে মায়োমা অথবা ফাইব্রোমায়োমা বলা হয়। যে প্রত্যঙ্গ থেকে এই টিউমারের উদ্ভব হচ্ছে, সেই প্রত্যঙ্গের কোষেরই সংখ্যাবৃদ্ধিজনিত বৃদ্ধিই এ টিউমার। সেই হিসাবে পেশী থেকে—ফাইব্রোমায়োমা ; তরুণাস্থি থেকে—কণ্ড্রোমা ; ইত্যাদি। উৎপাদক কলাটার কতটা কাঠিন্য আছে, সেই অনুযায়ী এসব টিউমারের কাঠিন্যের কমবেশী হয়।

ফাইব্রোমা ঃ এ টিউমার খুব বেশী হয় না। এতে থাকে ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষ, আর তার মাঝে মাঝে কোলাজেন কলা। কোলাজেন বেশী থাকলে শক্ত বা কঠিন হয়। এ টিউমার চামড়ায়, পাকস্থলী, ডিম্বকোষ ইত্যাদি জায়গায় হতে পারে।

কোন কোন ফাইব্রোমার কিছু বিশেষত্ব আছে। এর মধ্যে একটিকে ডেসময়েড টিউমার বা প্যাজেটের ফাইব্রোমা বলে। এ টিউমারের কোন ঘের বা আচ্ছাদন থাকে না বলে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে না পারলে আবার হয়। তবে দূরে উদ্বাহিত হতে দেখা যায় না।

অনুরূপ তন্তুজাতীয় কলার আধিক্য হতে দেখা যায় যে অবস্থায়, সে অবস্থাকে ফাইব্রোমেটোসিস বলে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি পেরিটোনিয়াম আচ্ছাদনেও এরকম হতে দেখা যায়। তার ফলে মূত্রনালিকা (ureter) বা মহাশিরায় পর্যন্ত চাপ সৃষ্টি হতে পারে।

মিক্সোমা ঃ সংযোগ সাধনকারী মিউসিন ও তার মধ্যে রেটিকুলিন তন্তু এই নিয়েই মিক্সোমা। এটা দেখতে অনেকটা জেলির মত, যা হোয়ারটনই প্রথম বর্ণনা করেছিলেন। এ টিউমার চোয়ালে হতে দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের ভিতরের স্তরেও হতে দেখা যায়। কিছুটা স্বচ্ছ এই টিউমার কাটলে তার ভিতরটা চকচকে ও হাত দিলে হড়হড়ে মনে হয়। ফাইব্রোব্লাষ্ট কোষ, যারা কোলাজেন তৈরি করে, তারাই এ কোষের জনক। তবে কোলাজেন তৈরি না করে এ কোষ তার পূর্বসূরী মিউকোপলিস্যাকারাইড তৈরি করে (অর্থাৎ মিউসিন মিশ্রিত বহুশর্করা)।

অন্য সংযোগ-কলাজাত টিউমার মিক্সোমায় পরিবর্তিত হতে পারে। আবার মারাত্মক মিক্সোসারকোমায় পরিণত হতে পারে।

মায়োমা ঃ পেশী বা মাস্‌ল থেকে উৎপন্ন। দু রকমের ঃ লিওমায়োমা, তিরিশ বৎসরের উপর বয়সের মেয়েদের মধ্যে শতকরা কুড়ি জনের জরায়ুতে এ টিউমার হয়। চামড়ায়, পাকস্থলী, অন্ত্রে এ টিউমার হয়। হলে একাধিক হতে দেখা যায়। মসৃণ পেশীর কোষ, যে কোষগুলি পেঁচানো পেঁচানো হয়, তা দিয়ে এ টিউমার তৈরি। বেশ কিছু তন্তুজাত কলাও সঙ্গে থাকে। তাই একে ফাইব্রয়েড-তন্তুজ টিউমার বলা হয়। এতে পরিবর্তন হিসাবে সিস্ট বা ক্যালসিয়ামের জন্য কঠিনতা লাভ করতে পারে।

র‍্যাবডোমায়োমা, অস্থিলগ্ন কাজের পেশীতে দেখা যায়। মারাত্মক র‍্যাবডোমায়োসারকোমা শিশুদের দেখা যায়। বলা বাহুল্য এটা র‍্যাবডোমায়োমার রূপান্তর।

স্নায়ুর টিউমার

নিউরোফাইব্রোমা ঃ আগে মনে করা হত যে এই টিউমার ফাইব্রোব্লাষ্ট থেকে জন্মায়। কিন্তু মনে করা হয় যে এ টিউমার সোয়ান কোষজাত। কোন স্নায়ুসূত্রের মধ্যেই বর্তুলাকৃতি এ টিউমার হতে দেখা যায়। লম্বাটে এ কোষগুলি, মাঝে রেটিকুলিন ও কোলাজেন থাকে। স্নায়ুতন্তু এ টিউমারের মাঝখান দিয়ে চলে যায়। অনেক সময়ে মিক্সোমাতে পরিবর্তনও হতে দেখা যায় এ টিউমারের। টিউমার একাধিকও হয়। অনেকের মতে, এটি হয়ত সঠিক টিউমার না হয়ে হ্যামার্টিয়্যাল বা রূপান্তরিত অন্য টিস্যুজাত হতে পারে। এর আর এক রূপান্তরে প্লেক্সিফর্ম নিউরোমা, যাতে স্নায়ুতন্ত্রীটি পাকানো জড়ানো ইত্যাদি হতে পারে।

সোয়ানোমা ঃ এই টিউমার কোন একটি বিশেষ স্নায়ু থেকে উৎপন্ন। এ টিউমারের আচ্ছাদন থাকে। স্নায়ুসূত্রের ভিতরে এই টিউমার হয় বলে স্নায়ুটিই দেখতে অতিকায় হয়ে স্ফুরিত হয়ে ওঠে। শ্রুতির স্নায়ু বা শ্রবণ-স্নায়ুতে ভিতর ও বাহির দু'দিকেই হতে দেখা যায়। অণুবীক্ষণে লিওমায়োমার মত দেখায়। লম্বাটে ধরনের কোষ বেশ পাকানো পাকানো ভাবে সংগঠিত। নিউক্লিয়াসগুলিকে একটি বিশেষ লাইনে সংবদ্ধ হতে দেখা যায়। লিওমায়োমাতেও এই ধরনটি দেখা যায়। লিওমায়োমাকে চিহ্নিত করতে, ফসফোটাংষ্টিক এ্যাসিড—হিম্যাটটক্সিলিন রঞ্জক ব্যবহার করতে হয়। এই টিউমারকে নিউরিলেমোমাও বলা হত। এ টিউমারে কোলাজেন থাকে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে ওই কোষের নিচের স্তর (basement membrane), যা কেবল সোয়ান কোষেই থাকে, তাও দেখা যায়।

ম্যানিনজিওমা ঃ মস্তিষ্কের আচ্ছাদন ডুরার ভিতরের এ্যারাখনয়েড কোষ থেকেই এ টিউমারের জন্ম। সাধারণতঃ স্যাজিটাল সাইনাস, ইত্যাদি যে সুড়ঙ্গ পথগুলি আছে, সেগুলির কাছাকাছিই এসব টিউমারের উৎপত্তি। এ্যারাখনয়েডের এ কোষ দেখায় এপিথিলিয়াম কোষের মত। ঘোরানো-ভাবেই এর কোষ বিন্যাস। কোষের মাঝে মাঝে কিছু কিছু তন্তু দেখা যায়। কিছু শিরাধমনীও থাকে। জায়গায় জায়গায় ক্যালসিয়াম জমে শক্ত হতেও দেখা যায়। এগুলি দানার মত ও ছোট ছোট হয়।

লাইপোমা ঃ চর্বিজাতীয় কলা দিয়ে এ টিউমার তৈরি। চামড়ার তলায়, পেরিটোনিয়ামে কি শরীরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কক্ষের আচ্ছাদকেও এ টিউমার হয়ে থাকে। রং হলদে, গোল গোল লতিকা বা লোবিউল থাকে।

অস্থির রাক্ষুসে কোষ সঞ্জাত টিউমার ঃ এ টিউমারের কোষগুলি হল লম্বা গড়নের ফাইব্রোব্লাষ্ট অর্থাৎ তন্তুগঠনকারী কোষ। কিন্তু সেই সঙ্গে থাকে বহু-নিউক্লিাসবিশিষ্ট রাক্ষুসে কোষ। অস্থির অষ্টিওক্লাষ্ট বা অস্থিভঙ্গকারী কোষই এ কোষের পূর্বসুরী বলে মনে করা হয়। লম্বা হাড়, যেখান থেকে হাড় বাড়ে সেই জায়গায় এ টিউমার হতে দেখা যায়। এ টিউমার তরুণদের হয়। ভিতরে তরল পদার্থ জমা হয়ে ভিতরে সিষ্ট বা কোষ গঠিত থলি তৈরি হতে পারে। অস্থির তৈরি সুড়ঙ্গও এতে লক্ষণীয়। সিষ্ট বা থলির দেয়াল ডিমের খোলার মত পাতলা। নিরীহ হলেও স্থানীয়ভাবে মারাত্মক (locally malignant), এ টিউমারে অল্পক্ষেত্রে উদ্বহন বা মেটাষ্টেসিস হতে দেখা যায়।

কণ্ড্রোমা ঃ যে তরুণাস্থি থেকে দীর্ঘ অস্থির বৃদ্ধি হয়, তার নিরীহ টিউমারই কণ্ড্রোমা। এ টিউমার কমই হয়। তরুণাস্থির পরিণত কোষ দিয়ে তৈরি, এ টিউমার হাতে হয়ে, কুদর্শন করে তোলে।

অষ্টিয়োমা ঃ যেখানের নয়, এমন জায়গায় অস্থি তৈরি হওয়াই এই পর্যায়ের। মাথার খুলির কোন জায়গায় মাত্র একটি শক্ত (কখনো কম শক্তও হতে পারে) টিউমার।

নিরীহ টিউমারের বিশেষত্ব

আকার ঃ এ টিউমার সাধারণতঃ গোলাকৃতি। প্যাপিলোমা অর্থাৎ আঁচিল ছাড়া এই ধরনের টিউমারের নিজস্ব আচ্ছাদন থাকে। এর জন্যই গড়নটা গোল বা বাদামি হয়। তবে বৃদ্ধি শুধু একদিকেই সম্ভব, এমন হলে লম্বা বা মুগুরের মত হতে পারে।

আয়তন ঃ মারাত্মক টিউমারের চেয়ে নিরীহ টিউমার ছোটই হয়। তবে বড় যে হতে পারে না তা নয়। যেমন রয়েল কলেজে 37 কেজি ওজনের একটি নিরীহ টিউমার রাখা আছে।

ক্ষত, রক্তপাত ঃ প্রায় হয় না বললেই হয়। তবে শরীরের উপর-ভাগে হলে, ঘসা লেগে রক্তপাত বা ক্ষত হতে পারে।

বৃদ্ধির হার ঃ নিরীহ টিউমারের বৃদ্ধির হার অল্প, গতিও মন্থর। কিছুটা বৃদ্ধির পরে থেমে যায়।

ভিন্নমুখীতার পর্যায় ঃ ভ্রূণ অবস্থা থেকেই আমরা জানি বহুমুখেই যার বিবর্তন সম্ভব, এমন কোষ একটি বিশেষ কোষের রূপ গ্রহণের দিকেই বিবর্তিত হয়। যেমন, ভ্রূণ অবস্থায় যে কোষ, সেই সর্বসম্ভাবনাময় কোষ স্নায়ুকোষই হক, আর লিভারের বা চর্মকোষই হক, সবই হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই কোষই একটি লাইনে গিয়ে এক রকমের কোষই হয়ে ওঠে। মারাত্মক টিউমারে যাই হক না কেন, নিরীহ টিউমারে কোষ যে ধরনের ছিল, তার ধরনের কোন পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ বিশেষ গ্রন্থীর কোষ গ্রন্থীর কোষই থাকে।

অন্তশ্রাবী গ্রন্থীর টিউমার ঃ কোন কোন অন্তশ্রাবী টিউমার, যেমন অগ্নাশয়ের টিউমার হলে তার অতিরিক্ত ক্ষরনের জন্য বিপাকঘটিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এ্যাড্রেন্যাল গ্রন্থীর টিউমার যাকে ফিওক্রমোসাইটোমা বলে, তাতে এ্যাড্রিন্যালিন ক্ষরণ হয়।

ঠিক অনুরূপভাবে এ্যাড্রেন্যাল গ্ল্যাণ্ডের বহিরাংশের টিউমারের ফলাফল বহুবিধ।

পিটুইটারি গ্রন্থীতেও ঠিক তাই হয়। যেমন দেখা যায় প্যারাথাইরয়েড ও থাইরয়েডের টিউমারে।

নিরীহ টিউমার আয়তন বড় হলে, তার ফলাফল নানারকম হতে পারে।

কোন জায়গায় এই অবস্থানগত কারণে ক্ষতিও সম্ভব। যেমন শ্বাসনলীতে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। মূত্রনালিকায়, বৃক্ককে অবরোধজাত প্রদাহ, অন্ত্রের অবরোধ, ইত্যাদি হতে পারে।

তবে এসব টিউমার দূরে ছড়ায় না।

মারাত্মক টিউমার-ক্যানসার

মারাত্মক টিউমার যত আছে, তার মধ্যে ক্যানসার বা কারসিনোমা, যার উৎপত্তি এপিথিলিয়াম অথবা চামড়ায়, বা শ্লেষ্মিক তলভাগের বাইরের কোষে হয়। চিহ্নিতকরণের জন্য একে অপিতল বা অপিতলমের টিউমার বলতে পারি। বাইরের তলদেশ অনেক বেশী বলেই সমস্ত মারাত্মক টিউমারের মধ্যে ক্যানসারই বেশী হয়। তলদেশের কিছু কোষ আছে, যা থেকে নির্যাস বার হয়। তা থেকে উৎপত্তি হবে এ্যাডিনোকারসিনোমা বা গ্রন্থীউৎপন্নকারী ক্যানসার।

স্কোয়ামাস কোষজাত ক্যানসার

চামড়া, মুখ, অন্নবিল, মলদ্বার, জরায়ুর গলদেশ ইত্যাদি জায়গায় স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের ক্যানসার হয় কি অন্য কলা অপরায়নের ফলেও হতে পারে। এর উদাহরণ হল, ফুসফুস, পিত্তথলি, মূত্রথলি, ইত্যাদি জায়গার ক্যানসার।

খালি চোখে : দুটি ধরনের দেখা যায়।

বড়ির মত থোকা থোকা : অর্থাৎ প্যাপিলারি ক্যানসার : বাইরেটা দেখতে আঁচিলের মত। কিন্তু ভিতটা তার সীমানার বন্ধন না মেনে প্রসারিত।

ডুমো ডুমো : অর্থাৎ নোডুলার ধরনের : এ ধরনের ক্যানসারই তাড়াতাড়ি ছড়ায়। এই দুই ধরনের ক্যানসারেই মাঝখানে ঘা হয়ে যেতে দেখা যায়। একে ক্যানসারের ঘা বলে। এ ঘায়ের সীমান্তটা উঁচু, এবড়ো খেবড়ো, প্রান্তদেশ পাকানো, ধারটাও সংলগ্ন চামড়ায় লাগা লাগা, ভিতরের অংশের সঙ্গে লাগা দেখা যায়। এর তলদেশ ভঙ্গুর টিউমারের অংশ, যা থেকে সহজে রক্তপাত ঘটে।

অণুবীক্ষণে রূপ ঃ অণুবীক্ষণে কি রকম দেখায় একথা বলতে গেলে কিভাবে ক্যানসার তৈরি হয়, সেটাই বলা দরকার।

প্রস্তুতি ঃ চামড়া বা শরীরের এপিথিলিয়ামে যখন ক্যানসারের মত কোন মারাত্মক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়, তখন একটু ভিতরের দিকে যে কোষ স্তর (prickle layer) তাতেই পরিবর্তনের সূচনা হয়। এখানে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি, অর্থাৎ মাইটোসিস হয়ে কোষ বিভাজন, এক ধরনের কোষের অপরায়ন, ইত্যাদি হয়। যা দেখে মনে হয় যে, এ বুঝি ক্যানসারেরই চিত্র। যদিও সীমানা ভেঙ্গে ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত ঠিক ক্যানসার বলা ভুল হবে। এই অবস্থাকে **ক্যানসার ইন সিটু** বা **এপিথিলিয়ামের মধ্যস্থ ক্যানসার** বলা হয়।

ক্যানসার তখনই বলা যায়, যখন গ্রন্থি বা এপিথিলিয়ামের নিচের পাতলা স্বচ্ছ স্তর ভেঙ্গে যায়। ক্যানসার কোষে পরিণত হয়েছে যে কোষ তাদের আবরণ ভেঙ্গে বার হয়ে পড়াটাই ক্যানসারের লক্ষণ। এইভাবে বাধা ভেঙ্গে ছড়িয়ে যাওয়া, চামড়া থেকে পেশীতে, পেশী থেকে বাইরে, এই সবই হল ক্যানসারের উপসর্গ। এসব জায়গায় বলা যায় ক্যানসারের কোষ থাকে গোছা গোছা।

টিউমার যখন ছড়ায়, তখন যে কলাকে আক্রমণ করে, তাকে নষ্ট করে। তা তন্তুজ কলাই হক, কিম্বা অন্য কলাই হক। সঙ্গে প্রদাহ সৃষ্টিতে যে বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট থাকে অথবা ইয়োসিন গ্রাহী প্রদাহজাত শ্বেতকণিকা কোষ দেখা যায়, সেই কোষেই ভর্তি হয়ে যায়। সব ক্যানসারেই কিছুটা প্রদাহ থাকে। যে টিউমার ততটা মারাত্মক নয়, সেখানে লিম্ফোসাইট কোষ বেশী থাকে।

ক্যানসার কোষ আদিম। এজন্য তার নিজস্ব অপরায়নের একটা প্রচেষ্টা থাকে। এ জন্য স্কোয়ামাস কোষ ক্যানসারে কেরাটিন সৃষ্ট মুক্তার মত স্বচ্ছ ঘোরানো কোষ সন্নিবেশ (epithelial pearl) দেখা যায়। আবার খুব কম অপরায়ন ঘটেছে এমন কোষও দেখা যায় মারাত্মক ক্যানসারে। এখানে একটি কোষের আয়তন ও গঠন অন্য কোষের থেকে ভিন্ন। নিউক্লিয়াস গভীর রং নেয় ও অস্বাভাবিক দেখতে হয়। বিভাজন বা মাইটোসিসও ক্যানসারে লক্ষণীয়। সংযোগসাধক কলার টিউমার থেকে এ ধরনের এপিতলমের টিউমার প্রায় তফাৎ করা যায় না।

স্কোয়ামাস কোষ ক্যানসারের রকমফের

ট্রানজিশানাল কোষের বৃন্তজাত (papillary) ক্যানসার ঃ নালিকায় অথবা ফুসফুসে এই ধরনের, আলাদা আলাদা বোঁটা বা বৃন্তে থোকা হওয়া ক্যানসার দেখা যায়। এই ধরনের ক্যানসার ততটা মারাত্মক নয়। এই ধরনের ক্যানসার, যা মুখে বা শ্বাসনলীর উপরের দিকে হতে দেখা যায়, তাকে ভেরুকাস ক্যানসার বলে।

গ্রেডে বিভাজন ঃ ক্যানসার রোগীর আরোগ্য সম্ভাবনা কতটা, সেই অনুযায়ী ক্যানসারকে বিভিন্ন গ্রেডে ভাগ করা হয়। গ্রেড করা হয়, কোন টিউমারে কতভাগ কোষের অপরায়ন ঘটে পরিণত

গ্রেড I —75% ভাগ কোষ পরিণত
গ্রেড II —50-75% " " "
গ্রেড III—25-50% " " "
গ্রেড IV—25% ভাগের কম " "

সংখ্যা গুনে কোষের পরিণতি প্রায় কোন ক্ষেত্রে করা হয় না। তাই এটা মোটামুটি অল্প, মাঝারি ও যথেষ্ট পরিণত হিসাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। তবে চামড়ায় হলে গ্রেড I-এর ভবিষ্যত খুব ভাল ; কিন্তু ফুসফুসে তা নয়। এরকম ভিন্নতা আছেই।

গ্রন্থীর কোষে ক্যানসার

গ্রন্থীর এপিথিলিয়ামে যে ক্যানসার হয়, তা একেবারে উপরের নিঃসরণ-ধর্মী কোষ থেকে যেমন ক্যানসার হতে পারে, তেমনি পারে অপেক্ষাকৃত ভিতরে গ্রন্থীর এপিথিলিয়ামে। তবে এখানে বহু ভাগ হয়ে অজস্র নতুন ভাগ হওয়া কোষ, গ্রন্থীর স্বাভাবিক কলিকা বা কলি কলি হয়ে বিন্যস্ত হয়। এই কলির কোষ লম্বা, চতুষ্কোন, বহুকোনবিশিষ্ট অথবা গোল, সব রকমেরই হতে পারে। ভাল রকমের অপরায়নগত পরিণতি হলে, গ্রন্থী যেমন ছিল সেইরকম দেখতে ও কাজকর্মেও তাই হয়।

অপরায়ন কম হলে একগুচ্ছ কোষ ও তার মাঝে মাঝে যে বস্তু, তাছাড়া আর কিছু থাকে না। কোষ পরিণতি, সাধারণ অণুবীক্ষণে যতটা বোঝা যায়, তার চেয়ে বেশী বোঝা যায় ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে। পরিণতি ও

অপরায়ন কম হলেও সে ক্যানসার মারাত্মক হতে পারে। স্তনে এর সব রকম অবস্থাই দেখা যায়।

মিউসিন নিঃসারক ক্যানসার

গ্রন্থীতে তার নিজস্ব বস্তু নিঃসরণ ছাড়া মিউসিন নিঃসরণের প্রবণতাও কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়। অতিরিক্ত মিউসিনে কোষ যেন ডুবে মরে যেতে থাকে। এ ধরনটা পাকস্থলীতে দেখা যায়, স্তনের ক্যানসারে নয়।

গ্রন্থীর ক্যানসারের গ্রেড ঃ

এই শ্রেণীর ক্যানসারে তিনটি স্তরে গ্রেড বিভক্তি করা হয় ; এ গুলি হল ঃ

(1) গ্রন্থীর মধ্যে নালিকা বা টিবিউল তৈরি।

(2) কোষের গঠনে সমান হওয়া, না হওয়া সেই সঙ্গে নিউক্লিয়াসের চেহারা ও রঞ্জকগ্রাহীতা

(3) কোষে বিভাজনের সংখ্যা।
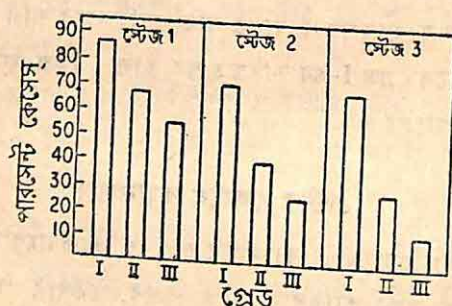
চিত্র 11

এইগুলির সঙ্গে ষ্টেজ বা পর্যায় এক সঙ্গে করে রোগীর ভবিষ্যতের একটা ধারণা করা যায়। একে TNM এই আদ্যাক্ষর অর্থাৎ টিউমার (T) নোড (N) অর্থাৎ গ্রন্থী ও মেটাষ্টেসিস (M) অর্থাৎ অতিগমন বা ছড়ানো। প্রত্যেকটির 1, 2, 3 পর্যায় অনুযায়ী ষ্টেজ করা হয়। ষ্টেজ ও গ্রেড এক করে টিউমারকে ভাগ করা হয়েছে সঙ্গের ছবিতে।

এতক্ষণ টিউমারের অণুবীক্ষণগত রূপের কোন ছবি দেয়া হয়নি। এখন সেই ছবি কয়েকটি পরিচয়সহ দেয়া হল।

এখানে একটি কথা বলে নেয়া দরকার। বিকারতত্ত্ববিদ বা প্যাথলজিষ্টের স্মৃতিতে বার বার অণুবীক্ষণে দেখে অণুবীক্ষণে দেখা ছবি, এমনভাবে স্মৃতিতে থাকা চাই, যাতে একবার চোখে দেখেই যেন রোগ নির্ণয়ের অসুবিধা না হয়। দীর্ঘদিনের অভ্যাসেই এটা আয়ত্ব করা সম্ভব।

এক ধরনের কোষ থেকে ভিন্নতর কোষে পরিণত হবার মাঝামাঝি স্তরে কিছু কোষ থাকে, তাদের transiiional বা মধ্যপথের কোষ বলতে পারি।

ট্রানজিশান কোষে টিউমার

এই টিউমার বৃক্কে, মূত্রনালিকায় মূত্রথলিকায় ইত্যাদি স্থানে হতে পারে। এ ধরনের টিউমার পরিণত বা পরিণতি হারানো কোষে তৈরি হতে পারে। অবশ্যই পরিণতি হারানো টিউমার মারাত্মক হবে

বৃক্কের ক্যানসার

সাধারণতঃ এই ক্যানসার বৃক্কের উপর বা নিচের প্রান্তে হয়; উপর প্রান্তে বেশী। মধ্যে মধ্যে রক্তপাত হবার জন্য, কিছু জায়গা রঙিন, কিছু জায়গা ফিকে এরকম দেখায়।

অণুবীক্ষণে দেখলে কোষগুলিকে স্বচ্ছ, গোছা গোছা করে সাজানো এ রকম দেখায়। এক এক সময়ে বৃক্কের ক্ষুদ্র নালিকায় গঠিত টিউমার দেখা যায় (tubule)। এড্রেনাল গ্রন্থীর কোষের মত দেখায় বলে, কেউ কেউ মনে করেন, যে এ টিউমারের উদ্ভব হয় এড্রেনাল গ্রন্থীর ভ্রূণাবস্থার অংশ থেকেই। হাইপারনেফ্রোমা নাম, যা এই টিউমারের দেয়া হয়েছিল তা বেঠিক। এ টিউমারের উৎপত্তি বৃক্ক থেকে। তবে এ্যাডিনোমা বা গ্রন্থী সদৃশ টিউমার বৃক্কে হয়ে থাকে। কোষগুলি স্বচ্ছ, এই কারণে দেখায় যে, তাদের ভিতরে গ্লাইকোজেন ও চর্বি থাকে আর অণুবীক্ষণে দেখার উপযোগী করতে গিয়ে এ বস্তুগুলি অন্য রসায়নে দ্রবীভূত হয়ে কোষ থেকে দূর হয়ে যায়। এই টিউমারের নিজস্ব লাইপোক্রোম আছে বলে কমলা রংয়ের হয় এই টিউমার। বর্তমানে অন্য নামের পরিবর্তে স্বচ্ছ কোষ ক্যানসারই (clear cell carcinoma) একে বলা হয়।

ফুসফুসের ক্যানসার

এই ক্যানসারের উৎপত্তি শ্বাসনলির উপরের দিক (bronchus) বা নিচের দিকে (bronchioles) যে কোষ, তা থেকে হতে পারে। কারো মতে মধ্যাংশে, আবার কারো মতে বহিরাংশে এ টিউমার বেশী হয়। অণুবীক্ষণে চার রকমের ক্যানসার দেখা যায়।

(1) গ্রন্থীর মত (adeno-carcinoma) এ ক্যানসার প্রান্তদেশেই বেশী হয়। মেয়েদেরই বেশী। চামড়ার যে কোষ, এই স্কোয়ামাস কোষে অপরায়ন এ টিউমারে বেশী হয়।

(2) ফুসফুস কলিকা (alveolus) কোষে ক্যানসার দেখা গিয়েছ যে ফুসফুসে এই ক্যানসার সব চেয়ে বেশী। ফুসফুসের বায়ু সঞ্চরণ কলিকার (alveolus) যে কোষ, সেই কোষ থেকেই যে এই ক্যানসারের উদ্ভব সে কথা ঠিক বলা যায় না।

অণুবীক্ষণে গ্রন্থীকলিকা দিয়েই এ টিউমার যে উৎপন্ন হচ্ছে, এটা দেখা যায় (adenocarcinoma) তবে তার মূল কোষ যে কোথাকার, তা বোঝা যায় না। তাই মনে হয় শ্বাসনলের (bronchus) গ্রন্থীকোষ থেকেই উৎপত্তি হয়ে থাকবে। তবে ফুসফুসের এ ধরনের টিউমার, অন্য কোন জায়গা, অর্থাৎ থাইরয়েড, ডিম্বকোষ, অগ্ন্যাশয়, ইত্যাদি জায়গা থেকে উঠে অধিরোপিত হয়েও হয়ে থাকতে পারে।

(3) ক্ষুদ্র কোষ বা ওট (oat) কোষজাত ক্যানসার, এ কোষ দেখলে রোগ অনেকটাই এগিয়ে গেছে বলে মনে হয়। লসিকাগ্রন্থী, শিরাধমনী পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি অধিরোপিত কোষে ভরে যায়। অণুবীক্ষণে দেখলে একসঙ্গে ঘেঁসঘেঁস ছোট ছোট কোষ, যা ক্ষারজাতের রঞ্জক (basic dye)-গ্রাহী কোষ দিয়ে তৈরি দেখা যায়। কোষগুলি গোল। নিউক্লিয়াস গভীর রং নেয়। এ কোষগুলির মাঝে মাঝে লিম্ফোসাইট কোষও থাকে। এ টিউমারে ডিপ এক্সরে বেশ কাজ করে।

অণ্ডকোষের ক্যানসার

শুক্র উৎপন্ন হয় যে নালিকায়, সেই শুক্রনালিকার ক্যানসার হয় সর্বাধিক। একে সেমিনোমা বলে। কুড়ি থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সে এটা হয়। অণুবীক্ষণে দেখলে দেখা যায় গোল গোল বড় বড় কোষ ঠাস বুনানি,

নিউক্লিয়াসের বেশী রং নেবার ক্ষমতা ও নিউক্লিয়াস প্রায় কোষ ভরে থাকে। বীর্য উৎপাদক কোষই এগুলি, যার ক্যানসারে রূপান্তর ঘটেছে। কোষ বুনানির মাঝে মাঝে অরবন্ধনী (trabeculi) থাকে যাতে লিম্ফোসাইট কোষ থাকে। এই ক্যানসার বীর্যবহননালিকায় যে লসিকা আছে, তার মাধ্যমে দূরবাহিত হয়ে ছড়ায়।

চামড়ার ক্যানসার

স্কোয়ামাস কোষের ক্যানসার বলতে যা বোঝায়, তা হয় চামড়ায়। এর কোষগুলি পরিণত। বাইরে বলে, সহজে ক্ষত হয়ে বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ছড়ায় মন্থর গতিতে। রেডিয়েশানে সাড়া দেয়। সারার পর আর খুব কুৎসিত দেখায় না।

গ্রন্থীর ক্যানসার-এ্যাডিনোকারসিনোমা হয় অপরিণত ব্লাষ্ট, অর্থাৎ উপকোষ থেকে। স্বেদগ্রন্থী, সিরাম বা রোহগ্রন্থী থেকেই এর উৎপত্তি। এ ক্যানসার দেখতে কতকটা বহুরূপী (pleomorphic) লালাগ্রন্থীর এ্যাডিনোমার মত। তবে এ টিউমার তত মারাত্মক নয়।

নিচের স্তরের (basal cell) কোষজাত টিউমার : স্থানীয়ভাবে মারাত্মক। ফরসা মানুষ দীর্ঘদিন রোদে পুড়লে এই ক্যানসার হয়। অণুবীক্ষণে দেখলে দেখা যায় যে ছোট ছোট ক্ষার জাতের রঞ্জক নেয় এমন কোষ একটু লম্বাটে গড়নের যাদের নিউক্লিয়াস খুব বেশি রঞ্জক নেয়, কোষ বিভাজন খুব দেখা গেলেও এ টিউমার তত মারাত্মক নয়। কখনো কোষগুলির মৃত্যু হয়ে, সেইখানে একটা থলির সৃষ্টি হতে পারে। কিভাবে যে এ টিউমারের উৎপত্তি হয়, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। উপরের এপিথিলিয়াম কোষ, জিব বার করার মতন করে যখন নিচের দিকে নেমে যায়, তারই নিচের স্তরের (basal) কোষ থেকে এ টিউমার ওঠে। কখনো কখনো এ ক্যানসারে চুলের গোড়া তৈরি হতেও এ জন্যই দেখা যায়। স্বেদগ্রন্থী তৈরির চেষ্টাও লক্ষণীয়। উদ্বাহিত হয়ে ক্যানসার ছড়াতে প্রায় দেখা যায় না।

সিলিণ্ড্রোমা : সিলিণ্ডার, অর্থাৎ লম্বা নলের মত দেখতে হয় বলেই এ টিউমারের এই নাম। তলার পর্দা ও কোলাজেনের সহায়তায় এই চেহারা নেয় এ টিউমার। কিছু কোষের এ্যাপোক্রিন গ্রন্থীতে পরিণতি ও

রূপান্তরণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। এ টিউমার মুখে ও মাথায়ই বেশী হয়। অনেকগুলি টিউমার মাথায় একসঙ্গে হয়ে পাগড়ীর মতও হয়ে যায়।

এমিলোব্লাষ্টোমা : দাঁতের যে চকচকে এনামেল আছে, সেখান থেকে ওঠা টিউমারকে এই নামে অভিহিত করা হয়। স্থানীয়ভাবে এই টিউমার মারাত্মক। অণুবীক্ষণে বেসের অর্থাৎ তলদেশের এপিথিলিয়ামের টিউমারের মতই দেখতে (basal cell carcinoma)।

স্বেদগ্রন্থী, লালাগ্রন্থী (salivary gland) এগুলি চামড়ারই বিশেষ গ্রন্থী। তাই এখানেই তার আলোচনা করা উচিত।

লালাগ্রন্থীর বিবিধদর্শন এ্যাডিনোমা (pleomorphic salivary adenoma) : এই টিউমার বেশীরভাগ গালের ভিতর দিকে কানের সামনে যে প্যারটিড গ্রন্থী, সেখানেই হতে দেখা যায়। এ্যাডিনোমা অর্থাৎ গ্রন্থীর টিউমারে যেমন হয়, গ্রন্থীর থলিকা (acini) ও নালিকার সঙ্গে এপিথিলিয়াম কোষের গুচ্ছ লম্বালম্বিভাবে সাজানো থাকে। যার মধ্যে মধ্যে মিক্সোমা অর্থাৎ শ্লেষ্মা জাতীয় কলায় ভর্তি থাকে। একে পূর্বে তরুণাস্থি বলেই ভাবা হত। কিন্তু এখন জানা গেছে যে গ্রন্থীর বাইরে গ্রন্থীর নিঃসরণ রস বার হয়েই এরকম দেখায়। যদি বা কখনো তরুণাস্থি দেখা যায়, তা অন্য কলার অপরায়নের জন্যই হয়। দেখে মনে হয় টিউমারের একটি আচ্ছাদন আছে, কিন্তু তা শুধু দেখতেই। সত্যকার আচ্ছাদন নয়।

বাদ দিলে এ টিউমার আবার হতে দেখা যায়। খুব কম ক্ষেত্রেই দূরবাহিত হয়ে টিউমার ছড়াতে দেখা যায়।

অন্য গ্রন্থী, যেমন অশ্রুগ্রন্থী, স্বেদগ্রন্থী ইত্যাদি জায়গায় এ ধরনের টিউমার হতে দেখা যায়।

কারসিনয়েড (আর্জেন্টিফিনোমা) : গোল গোল ছোট কোষ দিয়ে তৈরি এই টিউমার, ছোট ছোট কলিকা তৈরি করে গ্রন্থীর মত। এই টিউমার 5-হাইড্রক্সিট্রিপটামাইন তৈরি করে। রৌপ্য জাতীয় রঞ্জক গ্রহণ করে বলেই এর নাম আর্জেন্টিফিনোমা। স্থানীয়ভাবে এ টিউমার ক্ষতিসাধন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে দূরবাহিত হয়ে লিভারেও যায়।

কোরিয়ন ভ্রূণথলিকার টিউমার (Chorion epithelium)

ভ্রূণাংশজাত টিউমারের যে মারাত্মক ধরনের, তার নাম কোরিও

ক্যানসার। কোষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারানোর জন্য এ টিউমার অতীব মারাত্মক। কোরিয়নজাত এই কোষগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও বিচিত্রদর্শন হয়ে থাকে। এর মধ্যে আবার বেশ কিছু কোষ পরস্পর মিশে সংসক্ত (syncitium) হতে পারে। এই ক্যানসার সহজেই দূরবাহিত হয়। দূরবহন রক্তনালিকার মাধ্যমে হয় প্রায়ই। ছড়ায় ফুসফুসে। ছড়ানো টিউমারও কোরিয়নজাত গোনাডোট্রপিন ক্ষরণ করে। এজন্য পরীক্ষায় গর্ভের চিহ্ন প্রকাশ পায়।

এই ধরনের টিউমারের আর একটি ধরন বা রূপভেদ আছে যা মারাত্মক নয়। একে হাইডেটিডিফরম মোল বলে। এগুলি গোল গোল থলো থলো আঙ্গুরের মত দেখায় খালি চোখে। জরায়ুর ভিতরে দেয়ালে লাগানো থাকে, কিছুটা গভীর পর্যন্ত। দেয়ালের কতটা আক্রান্ত হবে, তা নির্ভর করে কোষগুলি কত বিচিত্র, তার উপরে।

সংযোগসাধক কলা ঃ সারকোমা

কারসিনোমা নামে উক্ত ক্যানসারের তুলনায় সারকোমা হয় কম। তবে এ ধরনের ক্যানসার যে কোন বয়সেই হতে পারে। কারসিনোমার ক্ষেত্রে যেমন, সেই কোষ, অর্থাৎ ক্যানসার কোষগুলি, এক জায়গায় বিন্যস্ত ও তার আশপাশে অন্য কলার অবয়ব বস্তু (stroma) থাকে, সারকোমাতে ওই ক্যানসার কোষ অবয়ব বস্তুর সঙ্গে ছিটিয়ে থাকে।

সারকোমা কারসিনোমার চেয়ে দ্রুত ছড়ায়। তাই বেশী মারাত্মক। রক্তস্রোতের মাধ্যমে ছড়ায় বেশী। এজন্য ফুসফুসে বেশী যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাদ দিতে পারলে আরোগ্য সম্ভাবনা আছে। ডিপ এক্সরে ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে কাজ করে না।

ফাইব্রোসারকোমা

তন্তুজ কলার সারকোমা ঃ তন্তুজ কলাজাত ফাইব্রোমার সঙ্গে তুলনা করলে এই সারকোমার কোষগুলি অদ্ভুত দর্শন ও নানা আকারের হয়। টিউমার যত মারাত্মক হয়, ততই তাতে এই কলার স্বাভাবিক কোলাজেন কম থাকে।

লাইপোসারকোমা ঃ এ সারকোমা চর্বিজাতীয় কলা থেকে ওঠে। তবে এর ছড়িয়ে পড়াটা ঘটে একটু দেরীতে। লাইপোরাষ্ট বিশাল আকারের

কোষ থেকে এ টিউমার হয়। তবে টিউমারে চর্বিজাতের কলার প্রাধান্য ঘটে না।

অষ্টিয়োসারকোমা ঃ অস্থিকোষ সারকোমা

এই অতীব মারাত্মক টিউমার প্রধানতঃ হতে দেখা যায় কমবয়সীদের। অস্থি জন্মায় যে অষ্টিওব্লাষ্ট কোষ থেকে, তাই এ টিউমারের জনক। যেকোন মারাত্মক টিউমারে যা হয়, কোষের আয়তন ও চেহারার মধ্যে মারাত্মক ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় এতে। বহুনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট রাক্ষুসে কোষও বেশ থাকে। এ টিউমারে পরিণত কোষ বেশী থাকলে, অল্পবিস্তর অস্থি তৈরি হতেও দেখা যায়। অস্থির পরিমাণ বেশী হলে, সে টিউমার তত মারাত্মক হয় না। এ টিউমার যখন হয়, তখন অস্থিকে ঘিরে যে আচ্ছাদন বা পেরি-অষ্টিয়াম, চাপ লেগে সেটা উঁচু হয়ে যায়। এর তলা থেকে নতুন অস্থি রক্তনালিকা ইত্যাদি তৈরি হতে থাকে। এক্সরে ছবিতে সেইজন্য স্থর্যের রশ্মির মত দেখায়।

কারসিনোমা ও সারকোমার তফাৎ

কারসিনোমা	সারকোমা
বয়স ঃ	
মধ্য ও পরিণত বয়স।	যে কোন বয়স ঃ তরুণদের বেশী
কোষ সাজানো ঃ	
সাধারণতঃ সাজানো, ষ্ট্রোমা আছে, রক্তপাত কমই হয়।	সাজানোটা এলোমেলো, রক্তপাত হয়ই।
বৃদ্ধি ঃ	
অপেক্ষাকৃত ধীরগতি।	দ্রুততর।
দূরবাহন ঃ	
লিম্ফ বা লসিকা প্রবাহন।	লসিকা প্রবাহন কমই হয়।
রক্ত প্রবাহন পরে দেখা যায়।	রক্ত প্রবাহন হয় প্রথম থেকেই।
রক্ত প্রবাহিত হয়ে যকৃত, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, অস্থি, বৃক্ককে যায়	রক্ত প্রবাহনে ফুসফুস সহজে আক্রান্ত হয়
রেডিয়েশানের প্রভাব ঃ	
রেডিয়েশানে কাজ হয়	কমই কাজ হয়

গ্লায়োমা ঃ অর্থাৎ মস্তিষ্ক বস্তুর অর্বুদ বা টিউমার। এর তিনটি স্তরভেদ ঃ 1. এ্যাসট্রোসাইটোমা 2. অলিগোডেনড্রোগ্লায়োমা 3. এপেনডাইমোমা।

এ্যাসট্রোসাইটোমা

গ্লায়োমা পর্যায়ের সব টিউমারের তুলনায় এ টিউমার হয় বেশী। এ বেশ পরিণত কোষে গঠিত টিউমার। মোটের উপর এ্যাসট্রোসাইট কোষ গঠিত এ টিউমারে মস্তিষ্ক ঝিলু থেকে বার হয় যে সূত্র, তা প্রচুর থাকে। যদিও স্থানীয়ভাবে মারাত্মক, কিন্তু মস্তিষ্কে হয় বলে মৃত্যু ঘটে। যত বেশী মারাত্মক হয়, সূত্র জাতীয় বস্তু তত কম থাকতে দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে কোষের ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য যত বেশী থাকে, ততই বিভাজনমুখী কোষও বেশী থাকে। আগে মনে করা হত যে, ভ্রূণাবস্থার স্পঞ্জিওব্লাষ্ট কোষ থেকেই এ টিউমার ওঠে। কিন্তু আজকাল মনে করা হয় যে এ্যাসট্রোসাইটই অপরিণত হয়ে উঠে বলে এ রকম দেখায়।

অলিগোডেনড্রোগ্লায়োমা

এ টিউমারের কোষগুলি চতষ্কোণ যাদের নিউক্লিয়াস গাঢ় রঞ্জক পদার্থ নেয়। কতটা মারাত্মক হবে সেটা নির্ভর করে, কত কোষ বিভাজনের অবস্থায় আছে তার উপর।

এপেনডাইমোমা

প্রচুর এপেনডাইমার কোষ, আর তার মাঝে ফাঁকা জায়গা, এ নিয়েই এ কোষের গঠন। এ টিউমার ও অলিগোডেনড্রোগ্লায়োমা, হয় অপেক্ষাকৃত কম। এ টিউমারে অস্থানে ক্যালসিয়াম জন্মানোর জন্য, এক্সরে ছবিতে ছায়া দেখা যায়।

মারাত্মক টিউমারের চরিত্র

এক কথায় বলতে গেলে আক্রমণ করার ক্ষমতাই হল টিউমার কত মারাত্মক, তার পরিচায়ক। বোঝাই যায় যে, এর জন্য যেটা আবশ্যক, সেটা হল টিউমারের চারিদিকে কোন নির্দিষ্ট ঘেরক বা আচ্ছাদন না থাকা।

ক্যানসার কথাটাও কাঁকড়ার মত দাড়া বার করে ছড়িয়ে পড়ে বলেই দেয়া হয়েছে।

ছড়ানোটা শুধু স্থানীয়ভাবেই হয় না, শরীরের বহুদূর অংশে ছড়িয়ে পড়ে, সেইখানে ঠিক একই রকমের টিউমার সৃষ্টি করে।

অণুবীক্ষণের চিত্র

অণুবীক্ষণেই ক্যানসারের নিশ্চিততম নির্ণয়ন হয়। যে কলা থেকে ক্যানসারের উদ্ভব, অণুবীক্ষণে সেই কলার রূপের কিছুটা অবশ্যই বজায় থাকে। কিন্তু নিরীহ টিউমারে এটা যতটা, মারাত্মক টিউমারে ততটা নয়। কোষের পরিণতি উল্টা দিকে গিয়ে, এতটা অপরিণত বা বিপরিণত হয়ে ওঠে যে, অনেক সময়, কেবল এরই ফলে, কোন কলা থেকে বা কোন অঙ্গ থেকে ক্যানসারের উদ্ভব, তাই যেন বোঝা যায় না। অপরিণতি কতটা, তার উপরেই ক্যানসারের পর্যায় স্থির করা যায়। অপরিণতি বা বিপরিণতির ফলেই ক্যানসারের কোষ বা কলাকে ভ্রূণাবস্থার কোষের মত দেখায়। অবশ্য ক্যানসার কোষেরও যে নিজস্ব পরিণতি নেই তা নয়। তাকে বলা হয় দ্বিপরিণতি বা বিপরিণতি dedifferentiation। অর্থাৎ এই পরিণতির একটা দ্বিচারিণী বা বিপরীত ভাব লক্ষণীয়। অর্থাৎ যে পরিণত চেহারা সেই কলার স্বাভাবিক কোষে দেখা যায়, সেটা এখানে থাকে না।

মারাত্মক টিউমার বা ক্যানসারে প্রচুর কোষ বিভাজন পর্যায়ে দেখতে পাওয়া যায়। DNA তৈরি হতে থাকার জন্য, কোষ বিভাজনের ঠিক আগে, নিউক্লিয়াস বড় ও বেশী করে রঞ্জক পদার্থ নিচ্ছে দেখা যায়। এজন্য নিউক্লিয়াসের আয়তন ও চেহারার অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। বিভাজন কোষে শুধু সংখ্যাতেই বেশী নয়; অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনও দেখা যায়। ক্রোমোসোমের সংখ্যা স্বাভাবিক 46 থেকে ভিন্ন হয়ে সংখ্যাধিক্য প্রায়ই দেখা যায়। DNA-র পরিমাণও স্বাভাবিকের বেশী দেখা যায়। কোন কোন ক্যানসারে বিশেষ ক্রমোসোমের অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। যেমন মাইলয়েড লিউকিমিয়াতে একটি বিশেষ ক্রোমোসোম জোড়া, দুটির বদলে তিনটি হয়ে যায়। সবচেয়ে ছোট তেইশ জোড়ার ক্রোমোসোমের এই ত্রিত্ব; এই বাড়তি ক্রোমোসোমকে ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোসোম বলা হয়।

কোষের চারিত্রিকতা হারানো অর্থাৎ অ্যানাপ্লেসিয়া (অন্যপ্লুত [?]) ঃ এই নামটি প্রথম ব্যবহার করেন হানসম্যান। তিনি কথাটি ব্যবহার করেন এই বলতে গিয়ে, যেথানে স্বাভাবিক কোষ ভ্রূণকোষের মত দেখতে হয়ে, অন্য কোষে পরিণত হয়েছে। টিউমারে অস্বাভাবিকতার কথা বোঝাতে এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। বৈশিষ্ট্য হারানো কোষের, যে ধরনের কলা তৈরি করার কথা, যেমন জরায়ুতে ইচ্ছামুক্ত পেশী তৈরি, অন্য অঙ্গে যেসব অভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গ তৈরি করার কথা, তার বদলে টিউমার করতে গিয়ে, অঙ্গহীন শৃঙ্খলাবিহীন মায়োমা টিউমারের সৃষ্টি করে। কোষের সম্পর্কে যখন চরিত্র হারানো এ কথাটি ব্যবহার করা হয়, তখন বোঝাতে চাওয়া হয় সেই কোষের বহুবিধ পরিণতি সম্ভাবনা।

রাক্ষুসে কোষ ঃ টিউমারে রাক্ষুসে কোষ নানা উপায়ে হতে পারে।

1. কোন কোন টিউমারে তার গঠনেরই অংশ হিসাবে এ কোষ থাকতে পারে, যেমন রাক্ষুসে কোষের টিউমার (giant cell tumour) যা অস্থিতে হয়, অষ্টিওসারকোমা হজকিন, কোরিয়নের ক্যানসার।

2. কোষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারানোর সাক্ষর হিসাবে রাক্ষুসে কোষ দেখা দেয় ঃ যেমন ফুসফুস ক্যান্সারে।

3. যে ক্যানসার বলা যায়, কষ্ট করে জন্মাচ্ছে ঃ যেমন জিভে কি ব্রঙ্কাসে (শ্বাসনলী) নালিকার মধ্যে।

4. অন্য বা বিজাতীয় বস্তুর (foreign body) উপস্থিতিজাত রাক্ষুসে কোষও দেখা যায় মৃত কলা, কোলেষ্টেরল কি কেরেটিন ইত্যাদির উপস্থিতির জন্য।

ক্যানসার কোষের বিশেষত্ব হল যে তার পরিণতি ঠিক পথে না হয়ে অন্য দিকে হতে থাকে। সেই সঙ্গে থাকে কোষ বিভাজন, নিউক্লিওলাসের বেশী রঙিন ও স্পষ্ট দেখানো, কোষের আয়তনের কমবেশী হওয়া, তার রঞ্জক গ্রহণের তারতম্য, ইত্যাদির উপরেও ক্যানসার নির্ণয়ের কাজ নির্ভর করে। শুধু কোষ দেখে সাইটোলজির সাহায্যে যে রোগ নির্ণয় করা হয়, তাতে তো মাত্র কয়েকটি কোষ দেখে রোগ নির্ণয় হয়ে যায়। ক্যানসার কতটা ছড়িয়েছে তা দেখেই ক্যানসারের অভ্রান্ত নির্ণয়ন। কিন্তু তখন তা আরোগ্যের অতীত। সেইজন্য কোষচরিত্র ইত্যাদি দেখে খুব প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণিত হলে আরোগ্যের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।

ক্যানসারের ফলাফল

ফলাফল যে খুবই মারাত্মক, তা বলাই বাহুল্য। তবু কিভাবে এই কুফল ঘটে ?

নিরীহ টিউমার যেমন চাপ সৃষ্টি করে, অথবা পথ বন্ধ করে দিয়ে একটা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। সেটা ক্যানসারও করতে পারে। যেমন অন্ত্রের, কোলনের ক্যানসার।

কলা বিশেষ বা অংশ নষ্ট করে ফেলেও ক্যানসার ক্ষতিসাধন করে। যখন দূরবাহিতও হয়, তখনও সেইসব জায়গায় প্রয়োজনীয় কলা নষ্ট করে ক্ষতি-সাধন করে। যেমন প্রষ্টেটের ক্যানসার অস্থিতে দূরবাহিত হয়ে হাড় অতি-ভঙ্গুর করে দেয়। মজ্জা নষ্ট হয়ে রক্তাল্পতা হয়।

রক্তপাতও ক্যানসার থেকে হতে দেখা যায়। বাইরে ক্যানসার থাকলে, ক্ষত সৃষ্ট হয়ে তা থেকে রক্তপাত হতে পারে। আবার শরীরের অভ্যন্তরে অদৃশ্য রক্তপাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। যেমনটা অন্ত্রের ক্যানসারে হয়।

ক্যানসারের মুখে অনেক সময় ঘা থাকে বলে, সেই ঘা বা ক্ষত সংক্রমিত হতে পারে বহুবিধ বীজাণু দ্বারা। এর ফলে বাড়তি জটিলতার সৃষ্টি হয়। বন্ধ হয়ে থাকার জন্যও সেখানে বীজাণু দূরীভূত না হতে পেরে সংক্রমণ ঘটে।

ক্যানসার, খাদ্যনালী বা অনুরূপ জায়গায় হয়ে খাদ্য পৌঁছতে না পারার জন্য রোগীর অপুষ্টি ও খাদ্যাভাবজনিত ব্যাধি হতে পারে।

একটু বেড়ে গেলে ক্যানসারে অতিরিক্ত যন্ত্রণা হতে দেখা যায়।

চেহারা শুকিয়ে যাওয়া ক্যানসারে অন্যতম লক্ষণ। সেই সঙ্গে ফ্যাকাসে অথচ রংটা পুড়ে গেছে, এরকম দেখায়। তা ছাড়া চেহারায় একটা হতাশার লক্ষণও যেন ফুটে ওঠে।

ক্যানসারে সেই রোগের অর্থাৎ ক্যানসারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা, কি অনাক্রম্যতা, থাক না থাক, অন্য রোগ সংক্রমণ হলে, তার প্রতিরোধ শক্তি রোগীর একেবারে শেষ অবস্থা না হয়ে এলে, থাকতেই দেখা যায়। তবে কিছু কিছু ক্যানসারে, যেমন লিম্ফোমা, হজকিন, ইত্যাদিতে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

ক্যানসারের সঙ্গে কিডনি বা বৃক্কের অসুস্থতা, যাকে নেফ্রোটিক সিন-

ড্রোম বলা হয়। তাও সহঅবস্থানে থাকতে দেখা যায়। এমনকি, ক্যানসারের চিকিৎসা করালে, এ অসুখও সেরে যেতে দেখা যায়। বৃক্কের অসুস্থতার চিহ্ন হিসাবে গ্লোমরুলাস মধ্যে IgG ও IgM জমা থাকতে দেখা যায়। এ জন্য অনেক সময় মনে করা হয়েছে যে টিউমারের বিশিষ্ট এন্টিজেন বস্তুই এইখানে এই চিহ্ন সৃষ্টি করেছে।

ক্যানসারের সহ-অবস্থানে উপসর্গ

ক্যানসারের সঙ্গে বেশ কিছু কিছু শারীরিক উপসর্গও দেখা যায়।

স্নায়ুজনিত উপসর্গঃ ফুসফুসের ক্যানসারে পাকস্থলী, স্তনে, ডিম্ব-কোষের ক্যানসারে স্নায়ুর একক অর্থাৎ স্নায়ন (neuroma) ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দূরবাহিত হবার আগেই এ উপসর্গ দেখা যায়। কেন বা কিভাবে এ উপসর্গ হয়, তা জানা নেই। এতে স্নায়ুতে প্রদাহের মত দেখায়।

মায়োপ্যাথি বা পেশীর দুর্বলতাঃ কোন কোন বিশেষ ক্যানসারে, যার মধ্যে স্তনের ক্যানসারও পড়ে, একে হাতপায়ের পেশীর দুর্বলতা দেখা দেয়।

চামড়ায় উপসর্গঃ এমনও হতে দেখা গেছে যে, দেহের অভ্যন্তরে কোন জায়গার ক্যানসারের প্রথম উপসর্গ দেখা দেয় বড় রকমের চর্মক্ষত হিসাবে। পাকস্থলীতে ক্যানসারের সঙ্গে বগলে, কুঁচকির কাছে কালো, আঁচিলের মত ক্ষত হয় একে এ্যাকানথোসিস নিগ্রিক্যানস (acanthosis nigricans) বলে। এ ছাড়াও ক্যানসার রোগীর কালো রং দেখা দেয়। ক্যানসারই মেলানোসাইট রঞ্জক তৈরি করে।

রক্ত জমার উপসর্গঃ ক্যানসারের ফল হিসাবে কোন ধমনী বা শিরায় রক্ত জমাট বাঁধতে দেখা যায়। এর ফলে এক ধরনের হৃৎপিণ্ডের প্রদাহও সম্ভব।

রক্তে ফিব্রিনের অল্পতাঃ প্রষ্টেটের ক্যানসারে রক্তে ফিব্রিনের অল্পতা ও তার জন্য রক্তস্রাবও হতে দেখা যায়।

হরমোন সংক্রান্ত উপসর্গঃ এ জাতীয় উপসর্গ একাধিক রূপ গ্রহণ করে। যেমন যদি অন্তক্ষরণ গ্রন্থীর টিউমার হয়, তার ফলে টিউমারজনিত বৃদ্ধিতে সেই গ্রন্থীর যে নিজস্ব হরমোন তারই আধিক্য হতে দেখা যায়। আবার অগ্নাশয় অথবা থাইরয়েডের ক্যানসারে এ ঘটতে দেখা যায়।

কখনো অন্য জায়গার ক্যানসার এক বিশেষ হরমোন তৈরি করে। যেমন ফুসফুসের ওটকোষ (oat cell) ক্যানসারে সোডিয়াম কমে যেতে পারে। আবার হাইডেটিডিফরম মোল নামের টিউমারে থায়রয়েড গ্রন্থীর হর্মোন বেড়ে যেতে পারে। কোন বিশেষ টিউমার এ রকম অন্য গ্রন্থীর উপর যে প্রভাব বিস্তার করছে, এর কার্যপদ্ধতি একটু জটিল। বিশেষ কোন একটি মধ্যবর্তী বস্তুর মাধ্যমে হয়ত এই কার্য সংঘটিত হচ্ছে। তবে যেসব ক্যানসারে **ACTH** বা ওই ধরনের হরমোন নিষ্কাষিত হয়, সে ক্যানসারে ভবিষ্যত খুব খারাপ। যে ক্যানসারে কোষ-বৈচিত্র্য যত বেশী, সে ক্যানসারে বিভিন্ন হরমোন নিঃসরণের ক্ষমতাও তত বেশী থাকে।

ফুসফুসের টিউমারে অস্থি ও বিভিন্ন সন্ধিতে বেদনা, হাতের আঙ্গুলের মাথাগুলি মুগুরের মত ফুলে থাকা, ক্লোম বা ব্রঙ্কাসের শাখা-প্রশাখার প্রদাহ-স্ফীতি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। একে অষ্টিও-আরথোপ্যাথি বলা হয়।

মারাত্মক নয় ও মারাত্মক এই দু'রকমের টিউমারে অনেক ভিন্নতা আছে। সেই ভিন্নতা নিচে একটি সারণির মাধ্যমে দেয়া হল।

এই আলোচনার মধ্যেই আরো কিছু কিছু টিউমারের উল্লেখ করা হল।

নিরীহ	মারাত্মক
1. বৃদ্ধি	
(ক) ধীরগতিতে	(ক) দ্রুত গতিতে
(খ) বৃদ্ধিটা আক্রমণাত্মক নয়	(খ) বৃদ্ধি আক্রমণাত্মক
(গ) বৃদ্ধি যতই হক শেষে থামে।	(গ) মৃত্যু ছাড়া বৃদ্ধির শেষ নেই।
2. দূরবাহিত হয় না।	দূরবাহিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।
3. পরিমাপ	
সাধারণতঃ ছোট।	সাধারণতঃ বড়।
4. অণুবীক্ষণগত রূপ	
(ক) কোষগুলি পরিণত।	(ক) কোষগুলি অপরিণত।
(খ) বহিরকাঠামো সুগঠিত।	(খ) বহিরকাঠামো অগঠিত। রক্তপাত হয়।

নিরীহ	মারাত্মক
(গ) কোষ একরকমের। কোষের বিভাজন দেখা যায় না।	(গ) কোষ বিভিন্নরূপ। কোষ বিভাজন যথেষ্ট দেখা যায়।
5. মৃত্যুর সম্ভাবনা সাধারণতঃ মৃত্যু হয় না। হলে হতে পারে কোন গুরুত্বপূর্ণ মর্ম-স্থলে চাপ পড়ার জন্য।	চিকিৎসায় সেরে না গেলে মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুর কারণ কিছুটা চাপের জন্য। বেশীটাই শরীরে ক্রিয়া সৃষ্টি করে মৃত্যু হয়। অনেক সময় রক্তপাতের ফলে মৃত্যু হয়। মৃত্যু অন্যরোগ সংক্রমণে খাদ্যাভাবে, অর্থাৎ আহার গ্রহণ করতে না পারার জন্য হতে পারে।

এই আলোচনার মধ্যেই আরো কিছু কিছু টিউমারের উল্লেখ করা হল।

টেরাটোমা

এই নামে বোঝায় এমনই ধরনের টিউমার, যাতে সেই জায়গার নিজস্ব, কলা, বদলে অন্য ও বিবিধ কলায় পরিণত হতে দেখা যায় এই টেরাটোমায়। শরীরের অন্য জায়গায় হতে দেখা গেলেও, এ টিউমার প্রধানতঃ অণ্ডকোষ বা ডিম্বাশয়, অর্থাৎ যৌন গ্রন্থীতে দেখা যায় হতে।

ডিম্বাশয়ের টেরাটোমা

সাধারণতঃ এ টিউমার মারাত্মক হয় না। তরুণী অথবা মধ্যবয়স্কাদেরই এ টিউমার হতে দেখা যায়। কোষে গঠিত থলি হিসাবে এ টিউমার আত্ম-প্রকাশ করে। তবে এই থলি বা দেয়ালের মধ্যে দাঁত, চুল, অস্থি, তরুণাস্থি, সবই পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণে দেখা যায় যে দেয়ালটি স্কোয়ামাস এপি-

থিলিয়াম দিয়ে তৈরি। সেই কারণেই ভুল করে এর নাম ডারময়েড সিষ্ট দেয়া হয়েছে। কখনো কখনো কেবল একটি মাত্র কলা দিয়ে এ টিউমার তৈরি হতে দেখা যায়। যেমন শুধু থাইরয়েড দিয়ে গষ্টিত এ টিউমারকে বলে ষ্ট্রুমা (struma)।

অণ্ডাশয়ের টেরাটোমা

তরুণ ও মধ্যবয়স্কদেরই এ টিউমার হয়। এ টিউমারের অধিকাংশই মারাত্মক। তবে খুব পরিণত কোষ দিয়ে গঠিত হলে, তা অতটা মারাত্মক হয় না। যেগুলি মারাত্মক নয় সেগুলি একটু ঠাস গড়নের হয়। অণুবীক্ষণে দেখলে বিভিন্ন কোষ, যেমন অন্ত্র, শ্বাসনলী, তরুণাস্থি, ইত্যাদি নানাবিধ কোষ দেখতে পাওয়া যায়।

মারাত্মক হলে তাতে অপরিণত কোষ সমষ্টি দেখা যায় অণুবীক্ষণে। তা ছাড়াও এক ধরনের টেরাটেমা আছে, যা ডিম্বকোষের কোরিও ক্যানসারের মত কোষ দিয়ে গড়া। এ টিউমার খুবই মারাত্মক।

টেরাটোমার উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক প্রচুর। কোনো মতে, একটি যমজ শিশু না হয়ে উঠতে পারা ভ্রূণই টেরাটোমা হয়। আবার অনেকের মতে ভ্রূণ অবস্থায় যে সর্ববিধ সম্ভাবনাময় কোষ (totepotent) থেকে যায়, তাদেরই বিভিন্ন দিকের পরিণতিই টেরাটোমার কারণ।

নেফ্রোব্লাষ্টোমা ঃ উইল্‌ম টিউমার

অতি শৈশবেই এ টিউমার পেটের ভিতর খুব বড় আকারে দেখা দেয়। এ টিউমার অতি মারাত্মক। লসিকা, রক্তস্রোত, সব পথেই দ্রুত দূরবাহিত হতে পারে। লালচে এই টিউমার বৃক্ক বা কিডনিটা একপাশে ঠেলে তার পুরোটাই দখল করে নেয়।

এ টিউমারে এপিথিলিয়াম ও সংযোগকারি কলা দু' ধরনের কলা থাকে। এপিথিলিয়াম গ্লোমেরিউলাস বা পুঞ্জিকা সৃজন, পুরোপুরি না করলেও, তার একটা চেষ্টা দেখা যায়। এগুলি দেখে অণুবীক্ষণে চেনা সম্ভব। এ ছাড়াও পেশী, অস্থি ইত্যাদি দেখা যায়, যা সংযোগকারী কলা থেকে উৎপন্ন। তবে এ টিউমারের পরিণতি কম।

বৃক্কের ভ্রূণাবস্থার কলাকোষ থেকেই যে এ টিউমারে উদ্ভব, এ কথা

অনেকে মানতে চান না, এই টিউমারে পেশীর জন্য। তবে আবার তার উত্তরে বলা হয়, যে ভ্রূণাবস্থার বহুসম্ভাবনাময় কোষে কোন কোন কোষ তো সংযোগকারক কলায় পরিণত হতে পারে।

সাধারণত এ টিউমারের সঙ্গে অন্য প্রত্যঙ্গের পরিণতিগত ত্রুটি দেখা যায়। যেমন বহিঃকর্ণের ত্রুটি দেখা যায়, অথবা কসেরুর নিচের দিক খোলা (spina bifida) দেখা যায়।

নিউরোব্লাষ্টোমা

এ্যাডরেনাল গ্রন্থী, যাকে অধিবৃক্ক গ্রন্থীও বলা হয়, তারই অভ্যন্তর ভাগ থেকে এ টিউমার ওঠে। সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু থেকেও ওঠে। শৈশবে পেটের ভিতরে একটা বড় গোছের টিউমার হিসাবে হতে দেখা দেয়। এ টিউমার বেশ তাড়াতাড়িই দূরবাহিত হয়। কাছে থাকার জন্য যকৃত সবচেয়ে আগে আক্রান্ত হয়ে, তবেই ধরা পড়তে পারে। দূরবাহন রক্তের সাহায্যে বেশী হয়। হয়ে খুলি হাড়ে চলে যায়।

অণুবীক্ষণে দেখলে ঃ ছোট, গোল রঞ্জক বেশী নেয় এমন ঠাসা কোষের সমাবেশ দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত পরিণত হলে কোষের থেকে সূতোর মত দেখা যায়। এগুলি স্নায়ুতন্ত্রী আর কি।

স্নায়ুগ্রন্থী বা গ্যাংলিয়নের আধিক্যও কোন কোন টিউমারে থাকে। তবে এ ধরনটা কমই হয়। একে গ্যাংলিও-নিউরোমা বলে। এখানে বড় স্নায়ুর সোয়ান কোষ দেখা যায়। এ কোষ পরিণত বলে এর মারাত্মক ভাবটা কম।

মেডালোব্লাষ্টোমা

মস্তিষ্কের চতুর্থ নিলয় অর্থাৎ ফোর্থ ভেণ্ট্রিকেল অঞ্চলে এ টিউমার প্রধানতঃ শিশুদের হয়। তবে এ টিউমার মারাত্মক হলেও এর দূরবাহন মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মধ্যেই হয়। অণুবীক্ষণে ছোট ছোট, গোল, অতিরঞ্জিত কোষাবলী, যা নিউরোব্লাষ্টোমা কোষের মত দেখতে, তাই দেখা যায়। এগুলি হয়ত ভ্রূণাবস্থার নিউরোব্লাষ্ট কোষ, যার একাধিক সম্ভাবনা আছে, সেই সম্ভাবনার পথেই মেডালোব্লাষ্টোমা।

রেটিনোব্লাস্টোমা

অক্ষিপটের এ টিউমার জন্মগত। অর্থাৎ বংশাণুক্রমণ সঞ্জাত। তবে দেখা যায় পিতা বা মাতা সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও অনুক্রমণ ঘটে। ক্রোমোসোমের D পর্যায়ের একটি ক্রোমোসোমের বড় হাত দুটির একটির ত্রুটি থেকে এ টিউমারের উৎপত্তি। এই শিশুদের বুদ্ধির স্বল্পতাও দেখা যায়। অতি দ্রুত অপরেশান করে বাদ না দিলে তাড়াতাড়ি দূরবাহিত হয়ে এ টিউমার ছড়িয়ে যায়।

অণুবীক্ষণে গোল, ছোট, অতি রঞ্জিত কোষ মালার মত করে সাজানো দেখা যায়।

হ্যামার্টোমা

1904 সালে অলব্রেখট এই নামটি দেন, টিউমার নয়, অথচ একাধিক তৈরি কতকটা এলোমেলোভাবে তৈরি কলাসমষ্টিকে। যেমন ফুসফুসের মধ্যে থাকবার কথা নয়, অথচ যদি খানিকটা তরুণাস্থি থাকে, তাকে অবশ্যই এই নামে অভিহিত করতে হয়। এই যে তরুণাস্থি বা অনুরূপ কলা একটি জায়গায় অকারণে রয়েছে, এর চারি দিকে যে কোন আচ্ছাদন থাকে, তাও নয়। তবু আবার অতিবৃদ্ধির বদলে, কৈশোরের পর বৃদ্ধি থেমে যায়। এগুলি জন্ম থেকেই থাকে। তবে শরীরের ভিতরে হলে ধরা পড়ে না।

হিম্যাঞ্জিওমা

এও আসল টিউমার নয়। কোন জায়গায় অকারণ রক্তনালিকা, তা সে ধমনী, শিরা বা লসিকা যাই হক, হতে পারে। চামড়ার উপর হলে লাল, নীল দেখায়।

সবচেয়ে বেশী দেখা যায় লাল জড়ুল চামড়ায়। এগুলি চ্যাপটা না হলে হয়ত চামড়া থেকে একটু উঁচুও হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে চাপ দিলে রক্ত খালি হয়ে গিয়ে সাদা হয়ে যায়। আবার চাপ সরিয়ে নিলে লাল।

অণুবীক্ষণে দেখলে, কোন আচ্ছাদন ছাড়া, এলোমেলো বিভিন্ন আকারের ও বিবিধমুখী রক্তনালিকা দেখা যায়। কোন জায়গায় এগুলি এক জায়গায় মিশে বড় নালিকা সৃষ্টি করে যা গহ্বরসদৃশ (cavernous)।

এই টিউমার তন্তুজাতীয় কলায় পরিবর্তিত হয়ে সেরেও যায়। কারো শরীরে এ টিউমার বহুল পরিমাণে হতে দেখা যায়। টিউমার দেহের ভিতরে বা বাইরে রক্তপাত হতেও দেখা যায়।

হিম্যানজিওসারকোমা

এই টিউমার মারাত্মক। এর অন্য একটি নাম হল হিম্যানজিওএণ্ডো-থিলিওমা। এ টিউমার অনেক সময় সাধারণ হিম্যানজিওমা হিসাবে উঠে, তারপর মারাত্মক রূপ নেয়। আর কখনো সুরু থেকে, বহু কোষের বিভাজন নিয়েই সুরু হয়ে জানিয়ে দেয় যে তা মারাত্মক। তবে শ্রেণী নির্ণয় করতে হলে, লক্ষ্য করতে হবে যে রক্তনালিকা তৈরি করার ক্ষমতাসম্পন্ন কোষ আছে কি না। এই কোষগুলি রেটিকুলিনের উপযুক্ত অর্থাৎ রৌপ্যজাতীয় রঞ্জক গ্রহণ করে।

গ্লোম্যানজিওমা ঃ গ্লোমাস টিউমার

এ টিউমার মারাত্মক নয়। তবে হাতে ও পায়ে হয় ও যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক। ধমনী যেখানে শিরায় পরিণত হচ্ছে, তাকেই গ্লোমাস বলে। এখানে পেশী, স্নায়ু সবই থাকে। স্নায়ুর অবস্থানের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক।

লিফ্যাঞ্জিওমা

এও একরকমের টিউমার, যা ওঠে লসিকানালিকা থেকে। গলায় এ টিউমার জলভরা থলির মত হয়। একে বলা হয় সিষ্টিক হাইগ্রোমা।

মেলানোটিক হ্যামারটোমা

কালো রংয়ের ছুলির মত দেখতে তাকেই মেলানোটিক হ্যামারটোমা অথবা মেলানোমা বলা হয়েছে। এ টিউমারের মূল কোষ হল মেলানোসিল অর্থাৎ শরীরের কাল রং তৈরির কোষ। মেলানিন তৈরি করতে পারে, এই রকম মেলানোসাইট কোষ বেশ কিছু সংখ্যায় চামড়ার নিম্নতম স্তরে থাকে। যারা ফর্সা তাদের, তথাকথিত DOPA প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এর অবস্থিতির প্রমাণ হয়। এমন মানুষ প্রায় নেই বললেই হয়, যার শরীরে এক-আধটি অন্ততঃ ছুলি বা মেলানোমা নেই।

চামড়ার উপর ও নিচের স্তরের সংযোগস্থলে এই ধরনের নিভাস বা রুজিমা দেখা যায়। এগুলি চ্যাপটা হয় ও বেশ রং. থাকে। যদি নিচের স্তর পর্যন্ত এ কোষগুলি চলে যায়, তাকে আক্রমণাত্মক বলে মনে করা হয়।

কিছুদিন থাকতে থাকতে, এ নিভাস বা রুজিমার রঙিন কোষগুলি ভিতরের দিকে নেমে গিয়ে জমা হতে দেখা যায়। সেখানে কোষগুলি একটু লম্বাটে হতে পারে বটে, তবে তার মানেই মারাত্মক হয়ে ওঠা নয়।

চামড়ার সংযোগস্থলের যে রুজিমা বা নিভাস সেগুলি অনেক সময়ে বড় হতে থাকে। এইজন্য এগুলি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। বাড়তে থাকলে সাবধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মারাত্মক মেলানোমা

মেলানোসাইট কোষ থেকেই এ টিউমার ওঠে। অবশ্য মেলানোটিক হ্যামারটোমা, যা বহুকাল নিরীহ থেকে হঠাৎ মারাত্মক হয়ে ওঠে। এটা যে কত ক্ষেত্রে হয়, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে 10%, কেউ 40%। এই পরিবর্তনের সময়ে, আরো কালো ও বড় হয়ে উঠতে দেখা যায়।

কেউ বলে হরমোন, কারো মতে রৌদ্রের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি, এ টিউমারের উত্তেজক। শরীরের কোন কোন জায়গায় যেমন জিভে মেলানোমা সুরু থেকেই মারাত্মক। অক্ষিচ্ছদেও তাই। মেলানোমার এত রকম বৈচিত্র্য আছে যে, তার একটা শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন। তা করা হয়েছে এই রকম।

(1) লেন্টিগো ধরনের: একটি তিল থেকে এর উৎপত্তি। তবে এর ফলাফল তত খারাপ হয় না।

(2) চ্যাপটা ধরনের: কালো চ্যাপটা জটুল থেকে এর উৎপত্তি। আক্রমণাত্মক, তবে তাতে একটু দেরী লাগে।

(3) ডুমো ডুমো ধরনের: এর ফল খারাপ।

এছাড়া চামড়ার (1) উপরে (2) ভিতরের আচ্ছাদন (basement membrane) (3) তাও ভেদ করেছে (4) ডারমিস স্তরে গেছে কি না (5) তারও নিচে চর্বি স্তরে গেল কি না, এর উপরে টাইপ অনুযায়ী কত মারাত্মক তা বোঝা হয়। দূরবাহনটা হয় অন্ত্রে, হৃৎপিণ্ডে, প্লীহাতে। DOPA কার্যক্রম অনুসারী নির্ণয়পন্থা ফলাফল নির্ধারণে সাহায্য করে।

নীল জড়ুল

এই মেলানোমা চামড়ার উপরের স্তর থেকে অনেকটা নিচে থাকে বলে নীলাভ দেখায়। একে মারাত্মক হয়ে উঠতে প্রায়ই দেখা যায় না। হাত, পা, মুখ, এগুলিই প্রধান জায়গা, যেখানে এ টিউমার বেশী হয়।

কোরয়েডের মেলানোমা

চোখের ভিতরের এই মেলানোমা অনেক সময়েই মারাত্মক হয়ে ওঠে। অণুবীক্ষণে দেখলে লম্বাটে ধরনের কোষ, যার মধ্যে প্রচুর মেলানিন রঞ্জক আছে, সেই কোষের তৈরি এই মেলানোমা। এ টিউমারকে বলা হয় ঘুমন্ত ক্যানসার। তাই দেখা দেবা মাত্র সাবধান হতে হয়। তবে ধরা পড়া মাত্র বাদ দিয়ে দিলে ফলাফল ভালই।

তরুণাস্থির হ্যামারটোমা

অস্থির বাইরে যেখানে থাকার কথা নয়, এমন জায়গায় তরুণাস্থি দেখা যায়। সাধারণতঃ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এ তরুণাস্থি অস্থিতে পরিণত হয়।

নিউরোফাইব্রোমেটোসিস

স্নায়ুকলাজাত, বহু জায়গায় একই সঙ্গে হওয়া এই হ্যামারটোমা এক জায়গায় হওয়া নিউরোফাইব্রোমার মতই রূপ অণুবীক্ষণে দেখা যায়। বহু স্নায়ুনালিকা দিয়ে গড়া হতে দেখা যায়, এ টিউমার। এর বংশানুক্রমণও দেখা যায়।

টিউবারাস স্কেল্‌রোসিস বা এপিলয়

এতে মস্তিষ্কে বা রেটিনাতে স্নায়ুর গ্লিয়া জাতীয় কলার বিভিন্ন জায়গায় টিউমারকে এই নামে অভিহিত করা হয়। বংশমত এই ব্যাধিতে বৃক্ক, ফুসফুস ইত্যাদি স্থানে টিউমারের মত হতে দেখা যায়।

কর্ডোমা

ভ্রূণাবস্থায় নটোকর্ড থেকেই মেরুদণ্ডের উদ্ভব হয়। কোন জায়গায় নটোকর্ডের অংশবিশেষ হয়ত থেকে গেছে, তা থেকে কর্ডোমার উদ্ভব হয়।

নিতম্বের কাছাকাছি জায়গায় এ টিউমার দেখা যায়। অণুবীক্ষণে জেলির মত কলার মাঝে মাঝে বেলুনের মত ফাঁকা জায়গা দেখা যায়।

এ্যাডাম্যান্টিনোমা ঃ এ্যমিলোব্লাষ্টোমা

চোয়ালের এই টিউমার, স্থানীয়ভাবে মারাত্মক। যে কলা থেকে দাঁতের এনামেলের উদ্ভব, তা থেকেই এ টিউমার ওঠে। তবে এনামেল তৈরি না হয়ে, ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ বা সিষ্ট (cyst) থাকে।

ক্যানসারের ছড়ানো

বিভিন্নভাবে ক্যানসার ছড়ায়। তার মধ্যে সোজাসুজি ছড়াতে পারে, লসিকা, শিরা বা ধমনী দিয়ে দূরবাহিত হয়ে ছড়াতে পারে, অথবা যেখানে ক্যানসার সেখান থেকে ক্যানসার কোষ ঝরে পড়া বীজের মত অন্য জায়গায় গিয়েও ক্যানসার উৎপন্ন করে সেইখানে।

সোজাসুজি ছড়ানো ঃ ক্যানসার তার অব্যবহিত যোগে যে প্রত্যঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের অংশ রয়েছে তাতে ছড়ায়। ছড়ানোর পথ হিসাবে, যেখানে বাধা কম, সেই পথ দিয়ে ছড়ায়। যেমন পেশীর সংযোগ আস্তরির (আস্তরণ) (fascia) মধ্যে দিয়ে, সে আস্তরণ যেখানে অবধি গেছে সেই-খানে তবে খুব কাছে বা প্রায় লেগে থাকলেও তরুণাস্থিতে কি তার ভিতর দিয়ে টিউমার সহজে ছড়ায় না।

ক্যানসার টিস্যু বাধা যে মানে না, এর একটা বড় উদাহরণ হল স্তনের ক্যানসার। স্তনের ক্যানসার কোলাজেন দিয়ে গড়া, এক একটি ঘর অনায়াসে অতিক্রম করে স্তনেরই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। আবার মারাত্মক মেলানোমা চামড়ার নিচের স্তর থেকে উঠে, উপর ও নিচে সবদিকেই ছড়াতে থাকে।

হাত দিয়ে পরীক্ষার সময়ে কি রোগের ইতিহাস নিতে গিয়ে স্থানীয়-ভাবে কত তাড়াতাড়ি ছড়াচ্ছে সেটা লক্ষ্য করলেই ক্যানসার কতটা মারাত্মক তা বোঝা যায়।

লসিকা মাধ্যমে ছড়ানো ঃ ক্যানসার দূরবাহন ও ছড়ানো লসিকার মাধ্যমে অনেকটাই হয়ে থাকে। লসিকা নালিকায় শুধু বাহিত হওয়াই নয়, এই নালিকায় বিভাজন হয়ে ক্যানসার কোষের বংশবৃদ্ধিও হয়ে থাকে।

এর ফলে কোন নালিকা অবরুদ্ধ হয়ে ক্যানসার কোষ বিপরীত দিকেও ছড়ায়। ফুসফুসে এই সব নালিকা বন্ধ হবার ফলে কোন সময়ে এক্স-রে ছবিতে টিউবারকুলোসিস বলে ভুলও হতে পারে।

শিরা আক্রান্ত হওয়া ঃ ক্যানসার বিশেষ করে ফুসফুসের ক্যানসারে শিরা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এর মানে কিছু কোষ শিরার রক্তস্রোতে অন্য জায়গায় ছড়ালো কেবল এই কিন্তু নয়। শিরা আক্রান্ত হওয়া মানে শিরা প্রাচীরে তারপর হয়ত শিরার পথটা পর্যন্ত ক্যানসার কোষ বিভাজনের ফলে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। কিডনি বা বৃক্কের স্বচ্ছ-কোষ ক্যানসারেও শিরা আক্রান্ত হয়।

ধমনী আক্রান্ত হওয়া ঃ ধমনী প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা অবশ্যই আক্রমণে বাধা সৃষ্টি করে। তবে ফুসফুসে কখনো এ ঘটতে দেখা যায়।

ছোট ছোট শিরা ধমনী কিন্তু সহজেই আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে এটা হয় সারকোমাতে, এইজন্য সারকোমা এত মারাত্মক।

প্লুরা বা পেরিটোনিয়ামের মত জায়গায় আক্রমণ সহজ। তার ফল হিসাবে এ আক্রমণ শরীরের বাইরে পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

উদ্বাহন, মেটাষ্টেসিস

লসিকার মাধ্যমে ঃ মারাত্মক টিউমার যেগুলি, তাদের কোষ লসিকা-গ্রন্থীর মধ্যের যে সাইনাস, বা খোলা জায়গা আছে, তারই প্রান্তে জায়গা নেয়। এইখানেই কোষ বিভাজন হয়ে, লসিকাগ্রন্থীটির নিজস্ব কলা বদলে গিয়ে সেটি ক্যানসারে পরিণত হয়। তারপর আবার এই লসিকাগ্রন্থী থেকে অন্য জায়গার লসিকাগ্রন্থীতে ছড়ায়। ক্যানসার বা কারসিনোমাতে, পর পর ঠিক এই জিনিস হয়ে, দেহের এক জায়গা থেকে অন্য অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

সাধারণতঃ লসিকা একটি বিশেষ দিকে পরিবাহিত হয়। সেইদিকে পর পর যে লসিকাগ্রন্থী ও দেহাংশ বা প্রত্যঙ্গ আছে, সেই সব জায়গায় এক এক করে ছড়িয়ে যেতে থাকে। কিন্তু লসিকা নালিকা বন্ধ হয়ে গেলে আর পরিবাহন স্বাভাবিক দিকে হতে পারে না। তখন ক্যানসার কোষ উল্টো পথে পরিবাহিত হয়ে, অন্য স্থানে ছড়ায়। এর উদাহরণ দেয়া যায়, যখন

গলার লসিকাগ্রন্থীতে দূরবাহন ঘটে পাকস্থলীর ক্যানসারে। এই লসিকা-গ্রন্থীকে ফিরকোর (virchow) নামে ফিরকোর গ্রন্থী বলা হয়।

রক্তের মাধ্যমেঃ রক্ত চলাচলের মাধ্যমেও ক্যানসারের দূরবাহন হতে থাকে। এটা ক্যানসারের প্রাথমিক অবস্থায় ততটা হয় না, যতটা হয় শেষের দিকে। রক্তের মাধ্যমে দূরবাহন হবার ব্যাপারে প্রথমে ছোট ছোট ধমনী শিরায় ক্যানসার কোষ প্রবেশ করে। তারপর অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে যায়। তবে রক্ত চলাচলের মাধ্যমে কারসিনোমার চেয়ে সারকোমাই বেশী ছড়ায়।

ফুসফুসে দূরবাহিত হয়ে অনেক জায়গার ক্যানসারই আসে। তেমনি যকৃতের পোর্টাল শিরার কাছাকাছি জায়গার টিউমার বাহিত হয় যকৃতে।

স্তনের, কি বৃক্ককের ক্যানসার, শুধু যে ফুসফুস কি অস্থিতেই দূরবাহিত হয়, তা নয়। অন্য জায়গায় বাহিত হতে হয়ত কম দেখা যায়। সে সম্পর্কে মনে করা হয় যে, লক্ষ্য করা যায় না, এমন ক্ষুদ্রাকারে বাহিত হয়। সেই-জন্য আগে জানা যায় না। এমনকি খুবই ছোট ছোট আকারে কোন জায়গায় থাকার জন্য, দ্রুততায় করা পোষ্ট মর্টেমে অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী ব্যবচ্ছেদে, পর্যন্ত হয়ত লক্ষ্য করা হয় না।

রক্তের মধ্যে দিয়ে সংবহন যে একটু কমই হয়, এটা বোঝা যায় এই থেকে যে পেশীর রক্ত সরবরাহ খুব বেশী হলেও, পেশীতে টিউমার সংবাহন কমই দেখা যায়। সেদিক থেকে আবার যকৃত এমন জায়গা, যেখানে প্রায় সব জায়গার ক্যানসারের পরবর্তী পরিবাহিত ক্যানসারের স্ফীতিগুলি (metastatic nodules) লক্ষ্য করা যায়।

আবার রক্তের মাধ্যমে বাহিত ক্যানসারও যকৃতে খুবই আসে। তার পরই হল ফুসফুসের স্থান। এখানে স্তন, থাইরয়েড, বৃক্ক, এ সব জায়গার ক্যানসার বাহিত হয়। তার পরের স্থানটি হল অস্থিরই। বিশেষ জাতের ক্যানসার, যেমন স্কোয়ামাস কোষ ক্যানসার অস্থিতে দূরবাহিত হয়।

দূরবাহিত টিউমার একটি মাত্র না হয়ে হয় একাধিক। প্রত্যেকটি প্রাথমিকটিরই অণুবীক্ষণীক প্রতিচ্ছবি।

দেহের ভিতরকক্ষ বা সিলোম মাধ্যমে দূরবাহন

দেহের ভিতরকক্ষে যদি কোন টিউমার হয়, তার ফলে সেখানে একটা

প্রদাহস্ফীতি দেখা দেয়। এই প্রদাহস্ফীতির জন্য সেখানে জলীয় বস্তু জমা হতে পারে। টিউমার থেকে ঝরে পড়া কোষ, এই জলীয় বস্তুর মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় বাহিত হতে পারে। সে কোষগুলি আবার কোন জায়গায় আটকালে, বিভাজনের ফলে বংশবৃদ্ধি করে নিতে পারে। এগুলি অজস্র বীজের মত হয়ে উঠতে পারে। এই ধরনের প্রতিবহনের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ হল, পাকস্থলীর ক্যানসারের ডিম্বকোষে ছড়ানো। একে ক্রুকেনবার্গ টিউমার বলে। এ দূরবাহন উভয় দিকেই হয়। ফুসফুসের ক্যানসার, অথবা স্তনের ক্যানসার, ফুসফুসের আচ্ছাদন মাধ্যমে বাহিত হতে পারে। অনুরূপভাবে মস্তিষ্কের টিউমার মেরুদণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় দূরবাহিত হতে পারে সুসুম্না রসের মধ্যে দিয়ে। বৃক্কের নল (ureter) গবীনীর মধ্যে দিয়েও বৃক্কের নিজস্ব টিউমার, মূত্রথলিকা বা অন্য জায়গাতে বাহিত হতে পারে। অস্ত্রপচারের সময়েও ক্যানসারের কোষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বাহিত হয়ে যেতে পারে।

মারাত্মক টিউমারের স্তরবিভাগ (staging)

ক্যানসারে কেউ আক্রান্ত হলে, তার ভবিষ্যত নির্ধারণের জন্যই এই স্তরবিভাগ দরকার।

স্তনের ক্যানসারের স্তরবিভাগ :

স্তর I—টিউমার শুধু স্তনের মধ্যে কি সংলগ্ন চামড়ায় সীমাবদ্ধ।

স্তর II—টিউমার বগলের (শুধু সেইদিককার) লসিকাগ্রন্থীতে গেলেও, টিউমার ও লসিকা গ্রন্থীগুলিকে নাড়ানো যায় (কোন কিছুতে লেগে নেই)।

স্তর III—বুকের চামড়া ও টিউমার পরস্পর লেগে গেছে (আলাদা করে নাড়ানো যায় না)। অক্ষক (clavicle) বা কণ্ঠার হাড় সংলগ্ন লসিকাগ্রন্থীতেও টিউমার ছড়িয়েছে। (গ্রন্থী শক্ত ও বড়)

স্তর IV—উপরোক্ত স্তরের চেয়ে বেশী গেছে।

পায়ুর ক্যানসারে ডিউকের স্তর :

স্তর A—পায়ুর দেয়ালের পেশী অবধি মাত্র টিউমার।

স্তর B—পায়ুর আশপাশে গেলেও লসিকাগ্রন্থীতে যায়নি।

স্তর C—লসিকাগ্রন্থী পর্যন্ত গিয়েছে।

ভালভাবে অপারেশানের পর বাঁচা

স্তর A—80-90% বাঁচে পাঁচ বছর।

স্তর B—60-70% বাঁচে পাঁচ বছর।

স্তর C—25%-এর কম পাঁচ বছর বাঁচে।

এই যে স্তরবিভাগ, অর্থাৎ টিউমারে ষ্টেজ ও গ্রেড নির্ণয়-এর উপরেই টিউমারে যে আক্রান্ত, তারও ভবিষ্যত নির্ভর করে। তবে ষ্টেজের সঙ্গে গ্রেডকে, যা অণুবীক্ষণে কতটা মারাত্মক, যা কোষের চারিত্রিকতা হারানো, না হারানোর উপরে প্রধানতঃ করা হয়, একসঙ্গে করে দেখতে হবে। তাছাড়া আরো বেশ কয়েকটি দিকও আছে। যেমন: বিশেষ টিউমারের দ্রুত আক্রমণশীলতা ও হননক্ষমতা, রোগীর প্রতিরোধ-ক্ষমতা ইত্যাদি। রোগীর প্রতিরোধ ক্ষমতা আবার নির্ভর করে, সেই বিশেষ টিউমারের বিরুদ্ধে রোগী কতটা প্রতিরোধমূলক অনাক্রম্যতা (immunity) সৃষ্টি করতে পারল। এছাড়া টিউমারের নিজস্ব মারাত্মকতা কতখানি, তাও একটা বড় ব্যাপার রোগীর ভবিষ্যত নির্ধারণে।

বর্তমানে টিউমারের TNM শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এখানে, T মানে টিউমার; N মানে নোড অর্থাৎ গ্রন্থী; আর M মানে মেটাষ্টেসিস, অর্থাৎ দূরবাহন। এগুলি আবার 0, 1, 2, 3 এই চার ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন $T_1N_0M_0$, অর্থাৎ সবে টিউমার দেখা গেছে, আর কিছু নেই। আবার $T_3N_3M_3$, অর্থাৎ সবগুলি আছে খুব মারাত্মকভাবে। উপযুক্ত মাপজোকের সঙ্গে এই শ্রেণীবিভাগ ও অস্ত্রপচার, রেডিয়েশান ও কেমো-থেরাপি চিকিৎসা, সারা বিশ্বে একই পর্যায়মানে নিয়ে আসা হয়েছে।

ঘুমন্ত ক্যানসার: কোন ক্যানসার হয়ত অপারেশান করে বাদ দেয়া হল। তার পর দেখা গেল যে, পাঁচ-সাত বছর আর কোন উপসর্গ নেই। পাঁচ বছর ভাল থাকাকেই পাঁচ বছরের আরোগ্য বলে। অনেক সময় দেখা যায়, দশ পনেরো বছর পরে, সেই ক্যানসারই দূরবাহিত হয়ে শরীরের অন্য জায়গায় দেখা দিল। এই ঘুমন্ত ক্যানসার পঁয়ত্রিশ বছর পরে হতেও দেখা গেছে।

ক্যানসার ও সার্জারি

প্রায় স্মরণাতীত কাল থেকে, ক্যানসারের চিকিৎসায় সার্জারির প্রয়োগ

চলে আসছে। তার কারণ হল, মনে করা হয় যে ক্যানসার একটি জায়গায় উঠে সেই জায়গাতেই দীর্ঘদিন সীমাবদ্ধ থাকে। কাজেই টিউমারটা বাদ দিলে তা চিরকালের মত দূরীভূত হল। তাছাড়া, ক্যানসার লসিকা ও পরবর্তী স্তরে রক্তের মধ্যে দিয়ে ছড়ায়, তাই মূল ক্যানসার, কাছের লসিকা-গ্রন্থী, রক্তনালিকা বাদ দিয়ে দিলে আর ক্যানসার ছড়ায় না। লসিকাগ্রন্থী ও নালিকাগুলিতে জমে থাকা কোষগুলি অবধি বাদ দিতে হয় বলে অপারেশানটা একটু বড় রকমেরই হয়। এর উদাহরণ হল স্তনের ক্যানসার।

যখন দেখা যায়, ক্যানসার খুব দূর দূর জায়গাতে পৌঁছে গেছে, কি অস্থিতে পৌঁছেছে, তখন তা সার্জারির বাইরে বলা যায়। তা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রাথমিক ও মূল ক্যানসারটা বাদ দিলে, অন্য জায়গার ছড়ানো ক্যানসার, একেবারে না সারলেও, তার বৃদ্ধির হার কমে যায়।

কোন টিউমার কতটা দ্রুত ছড়াবে, এটা কিছু বোঝা যায় অণুবীক্ষণ পরীক্ষায়। এজন্য সার্জারির আগে, ক্যানসারের অংশের টুকরো সামান্য একটু কেটে পরীক্ষা করা হয়।

24

ক্যানসার ঃ কার্য-কারণ

ক্যানসারের কারণ যেমন এক রহস্য তেমনি তা নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। তবে প্রধানতঃ এই গবেষণা প্রাণীদেহে ক্যানসার উৎপাদনের কাজেই লিপ্ত। এখানে প্রাণীদেহে ক্যানসার উৎপন্ন করে জৈবরাসায়ণিক ও অন্য গবেষণা করা সম্ভব।

টিউমারের কারণ সম্পর্কে 1875 সালে কনহাইম বলেছিলেন যে ভ্রূণা-বস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছে, এমন কিছু ঘুমন্ত কোষ, পরে পরিণত জীবনে টিউমার হয়ে ওঠে। এই থিয়োরিকে বিশ্রামরত কোষ থিয়োরি (cell rest theory) বলে। সব টিউমার এই থিয়োরি প্রয়োগ করে বোঝা নাই যাক, ভ্রূণজাতীয় কলায় তৈরি টিউমার ও শিশুদের টিউমার এ থিয়োরি দিয়ে বোঝা যায়।

বর্তমানকালে আবার মনে করা হচ্ছে যে একটি বিশেষ ক্লোন বা কোষের কলোনি বা আবাস থেকেই টিউমারের উদ্ভব। ক্লোন শব্দটিকে বার্নেট যে ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন, তার জন্য এই কথাটি ব্যবহার করা ভাল। সব টিউমার একই ক্লোন থেকে জন্মায় কি না, এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ, মালটিপ্ল মাইলোমা ও দীর্ঘকালীন লিউকিমিয়া নিয়ে। তাঁরা বলতে চেয়েছেন, B লিম্ফোসাইট কোষ থেকে এদের উদ্ভব যদি, তাহলে সে কোষ কেন বিশেষ ধরনের প্রতিষেধ-ধর্মী গ্লোবিউলিন নিঃসরণ করে না কেন ? টিউমারে তো এ ধরনের পরিবর্তন হতেই পারে।

এই সম্পর্কে লিয়ন হাইপোথিসিসের কথা মনে রাখতে হবে। এতে বলা হয়েছে যে দুটি X ক্রোমোসোম এর একটি, সময়বিশেষে নিষ্ক্রিয়তা অর্জন করতে পারে। অনুরূপভাবে, অতিবৃদ্ধি যখন কোন জায়গার কোষগুলির হতে থাকে, তখন সব কোষই মারাত্মক হয়ে ওঠে না, তা হয় কতকগুলি। এরাই আবার বাড়তে বাড়তে অন্য কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজনকে ছাপিয়ে যায়।

ক্যানসার উৎপাদক বস্তু বাইরের ঃ রাসায়নিক

যেগুলির কথা প্রথমে বোঝা গিয়েছিল, সেগুলি ছিল ; কয়লার কালি,

আলকাতরা, খনিজ তেল। বহুদিন থেকে জানা যে, যারা চিমনি পরিষ্কার করে তাদের অণ্ডকোষের ক্যানসার হয়। 1775 খ্রীষ্টাব্দে পার্শিভ্যাল পট প্রথম এটা দেখান। বিভিন্ন উত্তাপে কয়লা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভগ্নাংশ হিসাবে বহু বস্তু পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে কোন কোনটি ক্যানসার উৎপাদক।

এইভাবে এই ধরনের মিথাইল কোলান্থ্রিন, 3-5-বেঞ্জান্থ্রিসিন, ইত্যাদি বস্তু, যা মারাত্মক রকম ও অতিদ্রুত ক্যানসার উৎপাদন করতে পারে, এমন বহু জিনিস তৈরি হবার ফলে, সেসব বস্তুর সাহায্যে পরীক্ষামূলকভাবে অন্য প্রাণী, যেমন ইঁদুর ইত্যাদিতে ক্যানসার তৈরি করে গবেষণার কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

বিবিধ রাসায়নিক বস্তু যে বিভিন্ন জায়গায় ক্যানসার করে দেয় এও দেখা গেছে। যেমন আর্সেনিক থেকে চামড়ার ক্যানসার, নিকেল খনিতে ও আলকাতরা নিয়ে কাজ হয় যেখানে, তাদের ফুসফুসে ক্যানসার, এইসব হতে দেখা গেছে।

মিথাইলকোল্যানথ্রিন, বেনজিন বা ঈথারে দ্রবীভূত করে ইঁদুরের চামড়ায় লাগালে, এমনকি একবারের লাগানোতেই ক্যানসার হতে দেখা গেছে।

পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কিত যা

এদের ইংরাজিতে আমরা বলি Physical। এর মধ্যে পড়ে আয়নিত করতে পারে যেসব রশ্মি। এর মধ্যে এক্স-রে, গামা-রে বা রশ্মি, বেগুনি-পারের আলোকরশ্মি এগুলি আসে। রৌদ্রে যে বেগুনিপার রশ্মি আছে তার প্রভাবে সাদা চামড়ার লোকেদের চামড়ায় ক্যানসার হতে দেখা যায়। তবে যাদের চামড়ায় মেলানিন থাকার জন্য কালো, তাদের কিছুটা কম হতে দেখা যায়।

উত্তাপ বার বার লাগতে থাকলে সেখানে ক্যানসার হবার পরিবেশ সৃষ্ট হয়। তবে এই রকম পদার্থের যেসব গুণ আছে, যে বিকিরণ উত্তাপ, ইত্যাদির ক্যানসার সৃষ্টি করতে অনেক সময় লেগে যায়। সময়টা দশ থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত হতে পারে।

পরীক্ষামূলক ক্যানসার : বিভিন্ন প্রাণীর ক্যানসার হওয়া না হওয়াতে অনেক তফাৎ থাকে। যেমন বিশেষ প্রজাতীর ইঁদুরে, স্তনের, ফুসফুসের কি

লসিকাগ্রন্থীর ক্যানসার স্বাভাবিকভাবেই হয়। যেমন CH-প্রজাতীতে স্তনের ক্যানসার বেশী হয় কিন্তু লিউকিমিয়া কম হয়। আবার AK ইঁদুরের লিউকিমিয়াই বেশী হয়। বিশেষ বিশেষ জন্তুতে ক্যানসার উৎপন্ন করে, এমন জিনিসেও অনেক জন্তুতে ক্যানসার করা যায় না। যেমন কুকুরের দেহে আলকাৎরার ক্যানসার করা যায়নি।

পলিসাইক্লিক হাইড্রোকারবন : জাপানের ইয়ামাগাওয়া ও ইচিকাওয়া বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে খরগোসের কানে আলকাৎরা লাগিয়ে ক্যানসার তৈরি করলেন। তার পর থেকে দেখা হতে লাগল, আলকাৎরার কোন অংশটি ক্যানসারকারক। নিচের ছবিতে দেখানো বস্তুগুলি সবই ক্যানসার করতে পারে কম কি বেশী। এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হল 9 : 10 DiMethyl 1 : 2 Benzanthrocine এবং Methylcholanthrene যেখানে লাগানো হল সেখানে স্কোয়ামাস কোষ ক্যানসার হয়।

রং তৈরির কাজে আলফা কি বিটা নেপথিল এ্যামাইন, বেনজিডিন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এগুলি সবই ক্যানসার উৎপাদক কি উদ্দীপক। রবার ফ্যাকটারিতে যারা কাজ করে, তাদের মূত্রথলিতে ক্যানসার হতে দেখা যায়। তার কারণ রবারটা যাতে খারাপ না হয়, তার জন্য বিটা ন্যাপথিল-এ্যামাইন ব্যবহার করা হয়।

ন্যাপথাল এমাইন প্রয়োগে কুকুরের মূত্রথলি বা মূত্রাশয়ের হওয়া ক্যানসার নিরোধ করা যায় স্যাকারো-ল্যাকটোনে। কিছু কীটনাশক আছে, যা ক্যানসার উৎপাদক ; যেমন 2-এ্যাসিটো-ফ্লুরিন। তবে এ জেনে এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রকৃতিজাত ক্যানসারকারক

প্রকৃতিজাত খাদ্যে এমন অনেক কিছুই আছে যা ক্যানসার করে। এগুলিকে দুটি ভাগে প্রধানতঃ ভাগ করা যায়।

এ্যাফ্লাটক্সিন : এ্যাসপারজিলাস ফ্লেভাস বলে যে ছত্রক আছে, তারই বিষ এই বস্তুটি। চিনাবাদামে এই ছত্রক থাকতে পারে। এতে লিভারে ক্যানসার হয়। মানুষের যকৃতে এই বস্তু ভেঙ্গে যা তৈরি হয়, সেই আধভাঙ্গা

বস্তুও ক্যানসার উৎপাদক। আফ্রিকা ও এশিয়ার কোন কোন দেশে যে যকৃতের ক্যানসার বেশী, তার কারণও এই এ্যাফ্লাটক্সিন।

সাইকেসিন : সুদূর প্রাচ্যে তাল জাতের এক ধরনের গাছে এই বস্তু থাকে। এতেও যকৃতের ক্যানসার করে।

এই বস্তুদুটির সঙ্গে নাইট্রোসামাইন বলে একটি বস্তুর মিল আছে। যাতে DNA-র বিপাকক্রিয়া ব্যহত হয়ে থাকে। দেখা গেছে নাইট্রোসামাইন অনেক খাদ্য, পানীয় এমনকি সিগারেটের ধোঁয়াতেও থাকে। ক্যানসার উৎপাদক অন্য বস্তুর সঙ্গে সহযোগিতায় এ বস্তু ক্যানসার করে।

ক্যানসার ও অনাক্রম্যতা

বস্তু-প্রতিবস্তুর দিক থেকে ক্যানসার ও শরীরের যে কলা বা অঙ্গে ক্যানসার হয়েছে এই দুয়ের মধ্যে বেশ একটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সেদিক থেকে এটা স্বাভাবিক যে, ক্যানসার প্রতিবস্তু সৃজনের মাধ্যমে অনাক্রম্যতামূলক রোগ-প্রতিরোধ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। ক্যানসারে মূল টিস্যুতে বস্তুর ইতরবিশেষ হয় দুটি উপায়ে : 1. আছে, এমন বস্তুর বিলোপে ও 2. নতুন বস্তুর উদ্ভবে।

বস্তু বিলোপ : ক্যানসার কলা কতকটা ভ্রূণকলার মত হয়ে যায় বলে তার পরিণতিমূলক ভিন্নতা লোপ পেতে থাকে। কিন্তু তার অধিরোপন বস্তুর (transplantation antigen) বৈশিষ্ট্য ঠিক বজায় থাকে।

নব-বস্তুর উদ্ভব : নব বস্তু, বিশেষ করে, নতুন অধিরোপন বস্তু টিউমারে দেখা দেয়। এর একটা কারণও থাকে। মনে করা যেতে পারে, টিউমার যদিও রোগগ্রস্থের দেহকলা থেকেই ওঠে, তবু সামগ্রিকভাবে টিউমারকে একটি অধিরোপিত পরজীবী হিসাবে ধরা উচিত। যেমন কোন কোন টিউমার আছে, যা ভাইরাসসঞ্জাত। সেখানে বিশেষ বস্তুটি ভাইরাসের জন্য। কেন না দেখা গেছে, রাসায়নিক বস্তুর দ্বারা উদ্ভূত ক্যানসারে এই অধিরোপন বস্তু অনেক কম পরিমাণেই থাকে। বিকিরণ উদ্ভূত টিউমারেও তাই।

তবে আশ্রয়দাতার শরীরে কোন টিউমার, প্রতিবস্তু সৃষ্টি করবে কি না করবে, সেটা বলা শক্ত ও তা নির্ভর করে টিউমারগ্রস্থর দেহকলা কি রকম ব্যবহার করবে তার উপর।

টিউমারে অনাক্রম্যতাজনিত প্রতিরোধঃ দেখা গেছে যে যখন টিউমার হয়, রক্তরসে ইমিউনোগ্লোবিউলিন বাড়ে, আবার এও দেখা গেছে যে যদি ইমিউনোগ্লোবিউলিন যথেষ্ট বেশী হতে থাকে সেটা আক্রান্তের পক্ষে কল্যাণকর। প্রাণীদের মধ্যে দেখা গেছে, যদি দুটি প্রাণীর জিনগত বৈষম্য থাকে, তাহলে এক প্রাণীর দেহের টিউমার, অন্য প্রাণীতে অধিরোপন করলে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে, অর্থাৎ টিউমার থাকবে না।

দেখা গেছে যে, অনাক্রম্যতার দিক থেকে সহনশীল, অর্থাৎ কোন বস্তু শরীরের সংস্পর্শে এলেই তার বিরুদ্ধে তৈরি করবে না, এ রকম সহনশীল অবস্থা থাকে সদ্যজাত মুষিক শাবকে। তাদের ভাইরাসজাত টিউমার সহজেই হয়। তা থেকে বোঝা যায় টিউমার অনাক্রম্যতা না থাকার জন্যই এটা হয়।

অনাক্রম্যতার মাধ্যমে প্রতিরোধের চেষ্টাও যে শরীর করছে, এটা দেখা যায়, তত মারাত্মক নয়, এমন টিউমারকে ঘিরে প্রচুর লিম্ফোসাইট কোষের উপস্থিতি।

কোন কোন টিউমারে শরীরস্থ ইমিউনোগ্লোবিউলিন বাড়তেও দেখা যায় প্রতিরোধ চেষ্টার কারণেই। যে টিউমারে ইমিউনোগ্লোবিউলিন বাড়ে, সে টিউমার রোগীর দিক থেকে ভাল। তবে রোগীর শরীরে কতটা প্রতিবস্তু, তাই হিসাব করে টিউমারের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে না।

প্রতিরোধের যে অংশ কোষভিত্তিক, তাতে টিউমার-প্রতিরোধ অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। এখনও পর্যন্ত প্রতিরোধ শক্তি ও অনাক্রম্যতায় ক্যানসার সেরে যাবে, এ আশা দুরাশা। তবে জিনগত বিরোধ থাকলে, দেহ সে টিউমারকে রাখে না। তবে সেটা অধিরোপিত টিউমারে সম্ভব হলেও, যে টিউমার দেহের নিজস্ব টিউমার, তাতেও এ হবার কথা নয়।

অনুক্রমণ ও ক্যানসারঃ ক্যানসার বংশগত কি না, এ প্রশ্ন বহুদিনের। তবু এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও মিলেছে বলে মনে করা হয় না। বেশীরভাগ টিউমারেই দেখা গেছে বংশগত অনুক্রমণের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। তবে কিছু টিউমার আছে যেমন পলিপ বা আঁচিল, পরিবার বিশেষে এর আধিক্য দেখা যায়। এখানে চর্মের উপরের পলিপের চেয়ে অন্ত্রের পলিপের কথাই বলা যায়।

একরকম দেখতে যমজদের মধ্যে একজনের ক্যানসার হতে দেখা গেলে অন্যজনেরও যে ক্যানসার হতেই হবে, এমন কোন নিশ্চয়তাও নেই।

অন্য রোগ ও ক্যানসার : দীর্ঘদিন ধরে শরীরের কোন জায়গায় যদি কোন কিছুর আঘাত লাগতে থাকে, সে আঘাত হয়ত এত সামান্য, যা ধর্তব্যই নয়, সেরকম আঘাত থেকেও ক্রমে ক্রমে দীর্ঘদিন পরে ক্যানসার হয়। দীর্ঘদিন পাকস্থলীর আলসারে যারা ভুগছে, তাদের সেই জায়গায় ক্যানসার হতে দেখা গেছে। যাদের পিত্তাশয়ে পাথুরী আছে ও দীর্ঘকাল ধরে অপারেশান করানো হয়নি, তাদের পিত্তাশয়ে ক্যানসার হতে দেখা যায়।

যকৃতে যাদের সিরোসিস আছে, তাদের অনেকেরই যকৃতে ক্যানসার হতে দেখা গেছে। আফ্রিকান জাতীদের মধ্যে এজন্য যকৃতের ক্যানসার বেশী হতে দেখা যায়। গলগণ্ড, আয়োডিন কম থাকার জন্য গলগণ্ড যেসব দেশে দেখা যায়, যেমন সুইট্জারল্যাণ্ডে থাইরয়েডের ক্যানসার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। এগুলিকে বিপাকজনিত, নাকি দীর্ঘদিন মৃদু আঘাত বা উত্তেজনার জন্য সেটা বলা শক্ত।

হরমোন ও টিউমার

বিভিন্ন হরমোনের সঙ্গে টিউমার কি ক্যানসারের সম্পর্ক জটিল। জটিল এই কারণে যে কোন কোন হরমোন ক্যানসার চিকিৎসায় লাগে, আবার কোন কোন হরমোন অতিমাত্রায় দিয়ে ক্যানসার উৎপাদনও করা যায়। অনেক আগে থেকেই জানা ছিল যে ডিম্বকোষ বাদ দেয়া ইঁদুরের স্তনে ক্যানসার হয় না। 1932 সালে লাকাসান (Lacassagne) দেখান যে বেশী পরিমাণে ইস্ট্রোজেন হর্মোন প্রয়োগ করে ইঁদুরের স্তনে ক্যানসার হয়।

অবশ্য ইঁদুরের স্তনের ক্যানসারের জন্য মাতৃদুগ্ধের মধ্যে দিয়ে বাহিত ভাইরাসেরও যে দায়িত্ব আছে এটা দেখান 1936-এ বিট্নার। এর নাম দেয়া হয় মিল্ক ফ্যাকটার। তবে আবার এও দেখা গেল যে, শুধু মাত্র ভাইরাস নয়, সেই সঙ্গে ভিতরের হর্মোনের প্রভাব না থাকলে, যে ইঁদুরে স্তনের ক্যানসার প্রায় হয় না, যাদের নেই তাদের বিট্নারের মিল্ক ফ্যাকটার ওয়ালা দুধ খাইয়েও ক্যানসার করা যায় না।

বেশী পরিমাণে ইস্ট্রোজেন দিলে ইঁদুরের জরায়ুর অভ্যন্তরের এণ্ডোমেট্রিয়াম

অতি বহুলায়িত বা সংখ্যায়িত (hyper plastic) হয়ে ওঠে। তাছাড়া এই হর্মোনে অণ্ডকোষের মধ্যের কোষ (interstitial cells) বহুলায়িত হয়ে ওঠে।

পিটুটারি গ্রন্থীর হর্মোনে ডিম্বকোষের ক্যানসার হতে দেখা গেছে, ডিম্বকে প্রভাবিত করে এমন হর্মোনের মাধ্যমে। পিটুটারি গ্রন্থীর থায়রয়েড উত্তেজক হর্মোন আছে। যদি পরীক্ষারত ইঁদুরে, কম আয়োডিন ও থায়োইউরাসিল দেয়া হয়, তার ফলে হরমোনের আধিক্য হয়ে, থায়রয়েডের ক্যানসারও হতে দেখা যায়।

মাসিক বন্ধ হবার পর যে সব মহিলাদের ইষ্ট্রোজেন দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়, তাদের এই হর্মোনের প্রভাবে জরায়ুর এণ্ডোমিট্রিয়ামে ক্যানসার হতে দেখা যায়। অণ্ডকোষের উত্তেজক হর্মোন প্রয়োগে (এ্যাণ্ড্রোজেন) যকৃতে ক্যানসার হতে দেখা গেছে। এমন ক্যানসারও আছে যা হর্মোন নির্ভর। যেমন, প্রষ্টেটের ক্যানসার এ্যাণ্ড্রোজেন নির্ভর ও অণ্ডকোষ বাদ দিলে কমে যায়।

স্তনের ক্যানসারের বেশ কিছু (30%) ইষ্ট্রোজেন হর্মোন নির্ভর। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে ডিম্বকোষ বাদ দিলে স্তনের ক্যানসারের উপশম হতে দেখা যায়। এই জন্যই মাসিক বন্ধ হবার আগের বয়সে স্তনের ক্যানসারে বেশী মৃত্যু হতে দেখা যায়। স্তনের ক্যানসার অপারেশানেও সাবধানতামূলক অপারেশানে ডিম্বকোষ এমনকি পিটুটারি পর্যন্ত বাদ দেয়া হয়েছে।

থাইরয়েড উত্তেজক একটি হর্মোনও পিটুটারি গ্রন্থীতে তৈরি হয়। এরই অতিরিক্ত তৈরি হওয়া অনেক ক্ষেত্রে থাইরয়েডের ক্যানসারের জন্য দায়ী ; বলে অনেকে মনে করেন।

ভাইরাস ও টিউমার

কিছু ভাইরাস আছে, যা টিউমার উৎপাদন করে। এর মধ্যে DNA ভাইরাস ও RNA ভাইরাস দুই আছে। প্রথম ভাইরাস উৎপাদিত ক্যানসার বা টিউমার ছিল মুরগীর লিউকিমিয়া। 1908 খ্রীষ্টাব্দে এলারম্যান ও ব্যাঙ্গ আবিষ্কার করেন। এর পর বার হয় মুরগীর সারকোমা (রুস 1911) ও তারপর সোপ 1932 সালে খরগোসের প্যাপিলোমা আবিষ্কার করলেন।

1934 ও 1936 সালে ব্যাঙের ভাইরাস জাত ক্যানসার বিটনারের আবিষ্কার দুধের বিশেষ ভাইরাস (মিল্ক ফ্যাকটার) বার হয়ে গেল।

তারপর থেকে অনেকগুলি ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের তালিকা দেয়া হল নিচে ঃ

DNA ভাইরাস ঃ	
প্যাপো ভাইরাস ঃ	সোপ প্যাপিলোমা
	বিভিন্ন আঁচিল ও শ্বাসনলীর প্যাপিলোমা
	পলিওমা ভাইরাস
এ্যাডিনো ভাইরাস ঃ	হ্যামষ্টারে পরীক্ষামূলক টিউমার
হারপিস ভাইরাস ঃ	ব্যাঙের কিডনীতে ক্যানসার
	বানরে (পেচক বানর) লিম্ফোমা
	মানুষে হার্পিস
বসন্ত ভাইরাস ঃ	মোলাস্কাম কন্টাজিওসাম
RNA ভাইরাস ঃ	
অনকো ভাইরাস ঃ	পাখীদের, ইঁদুর, বিড়াল ও মানুষের লিম্ফোমা
	লিউকিমিয়া
	রুস সারকোমা
	বিটনার বর্ণিত মিল্ক ফ্যাকটার

এই সব থেকে ভাইরাসই ক্যানসারের কারণ এ কথাটা বলা যত সহজ হবার কথা, তা কিন্তু হল না। কার্যকারণ শৃঙ্খলের মধ্যে এ যেন একটি দানা বা পর্ব। কিন্তু পূর্ণ ছবিটা কি, আমরা আজও জানি না।

ক্যানসারের DNA ভাইরাস

যে ভাইরাসের আক্রমণ হল, কোন উপায়েই আর তা উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। তার কারণ এই DNA কোষের জিনে জিনোমের সঙ্গে মিশে যায়। মিশে গিয়ে সংবাদবাহী অর্থাৎ m RNA সঙ্গে মিশে ভাইরাসের প্রোটিন তৈরি করতে থাকে। একেই টিউমারের নিজস্ব এ্যান্টিজেন বলে। তবে ফাজের ক্ষেত্রে যেমন, ফাজ বংশবৃদ্ধি করতে গিয়ে কোষগুলোকে যেমন মেরে

ফেলে, এ ক্ষেত্রে তা হয় না। এটা হয় X-Ray দিয়ে টিউমারকে আঘাত করলে।

ক্যানসারের RNA ভাইরাস

এগুলির অনুসূত্রে মাত্র একটি খি বা উপসূত্র থাকে। এই RNA প্রোভাইরাস DNA হয়ে যায়। এইটি আশ্রয়দাতার শরীরের কোষে DNA-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এইভাবেই প্রোটিন তৈরিকে অন্য পথে চালিত করে। তাতেই টিউমারের বৃদ্ধি ঘটে। এই ভাইরাসও সোজাসুজি কোষের কোন ক্ষতি করে না ফাজের মত। অনেক সময় ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে কণিকা দেখা যায়। এদের A চিহ্নিত কণা, A particles বলা হয়। কোষের বাইরে B ও C কণা পাওয়া যায়। এর স্পষ্ট এ্যান্টিজেনের বিশিষ্টতা থাকে।

মানুষের ক্ষেত্রে বারকিট টিউমার ভাইরাসজাত মনে করেন অনেকে।

প্রাক্-ক্যানসার অবস্থা: পুরোপুরি ক্যানসার হয়ে গেছে এমন অবস্থায় আসার আগেই যদি চিকিৎসা করা যেত, তাহলে ক্যানসার নিরঙ্কুশ ভাবে আরোগ্য করা যেত, এটা ঠিক। এর উপর নির্ভর করেই পরীক্ষামূলক ক্যানসার ইঁদুর বা অন্য প্রাণীর চামড়ায় মিথাইলকোল্যানথ্রিন ও ক্রোটন তেল প্রয়োগ করা হয়। দেখা গেছে এতে ক্যানসার হয় ও তার আগে কোষ ঘন ঘন বিভাজন ও বিচিত্র ও বহুবিধ দর্শন হয়ে ওঠে। অণুবীক্ষণে যাকে ক্যানসার ইন সিটু বলা হয়, তাই হবার মাধ্যমে, শেষ পর্যন্ত ক্যানসার হয়ে দাঁড়ায়। স্তনের প্যাজেট ব্যাধি, ইত্যাদি ক্যানসার-ইন-সিটু পর্যায়ের।

ঝরাকোষ পরীক্ষা: (Exfoliative Cytology)

এক্সফোলিয়েটিভ সাইটোলজি (Exfoliative cytology) অর্থাৎ কিনা যেখানে কোন টিউমার হচ্ছে, বা হয়েছে, সেখান থেকে যেসব কোষ স্বাভাবিক নিয়য় অনুযায়ী খসে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে স্বাভাবিক কোষ যেমন থাকবে তেমনিই ক্যানসার কোষও থাকবে। এমনকি এই কোষ বেশী পরিমাণে ঝরিয়ে নেবার জন্য ধারহীন স্প্যাচুলা, কি ব্রাশের মত জিনিস ব্যবহার করা হয়। এর মুখে যে কোষগুলো লেগে রইল, তা কাঁচের স্লাইডে

লাগিয়ে, তা ইথার-এ্যালকোহলে ফিক্স (লাগিয়ে) করে, রঞ্জন করে দেখা হয়, ক্যানসার কোষ আছে কি না।

এই বিশেষ পরীক্ষা প্যাপেনিকলু, (Papaniscaleau) রুথ গ্রাহাম ও পরবর্তী বহু বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে আজ একটি বিশেষ বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে। যৌন ও জরায়ু মুখ থেকে নেয়া কোষ পরীক্ষা করে, প্যাপেনিকলু কোষের অস্বাভাবিকতাকে বলেন যে এ নিউক্লিয়াসের অস্বাভাবিকতা, অর্থাৎ ডিসকেরিওসিস। এতে নিউক্লিয়াস বড় হয়ে যায়। তার গঠন হয় নানা-রকম ও অস্বাভাবিক। রঞ্জন পদার্থ বেশী নেয়। নিউক্লিওলাসও বড় বড় হয়ে যায়। এই পরিবর্তগুলি ক্যানসার-ইন-সিটুতে সুরু হয়ে ক্রমে বাড়তে থাকে। তবে ক্যানসার বলে বোঝা, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। এই অভিজ্ঞতা ও তার পরবর্তী সাফল্য অসাফল্যের উপর নির্ভর ও ভিত্তি করে রোগীকে বিভিন্ন সেন্টারে তাদের ধারণা অনুযায়ী চিকিৎসা দেয়া হয়। একটি পুরো টিম, যার মধ্যে সাইটোলজিষ্ট, অর্থাৎ কোষবিজ্ঞানী, সার্জেন, রেডিওলজিষ্ট, কেমোথেরাপিষ্ট ও অন্য টেকনিসিয়ানদেরও থাকা উচিত। কারণ, অভিজ্ঞতা অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যাপারে প্রত্যেকের কিছু বক্তব্য থাকতে পারে।

টিউমারের কেন ; কোথা ; কখন

প্রাণী মাত্রেরই টিউমার হতে দেখা যায়। এমনকি গাছেরও। তথাকথিত ক্রাউন গল টিউমার, যা ফাইটোমোনাস টিউমিফেসিয়েন্স বীজাণুর আক্রমণেই এই টিউমার হয়। আলকাৎরার সংস্পর্শে ছত্রকের দেহেও টিউমার হতে দেখা যায়।

অন্য প্রাণীর মধ্যে, ড্রসোফিলা মক্ষিকারও টিউমার হয়। তাছাড়া কুকুর, পাখী, ঘোড়া, গরু, সব প্রাণীরই টিউমার হয়।

মানুষের টিউমার

বয়স ঃ টিউমার, বিশেষ করে ক্যানসার একটু পরিণত বয়সেই হয়। তবে কিছু টিউমার, যেমন লিউকিমিয়া, ইত্যাদি শিশুদেরও হয়। কাউড্রির মতে, টিউমারে কোন সীমা নেই, এরকম কোষ বৃদ্ধি ও বিভাজন বার্ধক্যে যেমন কোষ বৃদ্ধি কি বিভাজন হয়, এ যেন ঠিক তার বিপরীত। ইংল্যাণ্ডে

এক সমীক্ষা, যা এক লক্ষের বেশী সংখ্যার মানুষে করা হয়, তাতে দেখা গেছে, ক্যানসার আক্রান্তদের বয়সের মধ্যসংখ্যা 55। এই সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন ওঠে। ক্যানসারের আক্রান্তের সংখ্যা কি বাড়ছে? এর উত্তর দেয়া শক্ত। তবে এ কথা হয়ত বলা চলে, যে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি হয়েছে বলে, বার্ধক্যের রোগ ক্যানসারেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। তবে আবার এও ঠিক, অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশে ক্যানসার হবার বয়স অপেক্ষাকৃত কম।

স্ত্রী পুরুষ ভেদ ঃ স্ত্রী পুরুষ ভেদে ইন্দ্রিয় ভেদ যা থাকে, তার ইতর বিশেষের ও সেইসব ইন্দ্রিয়ের বিশেষ ক্যানসারের কথা বাদ দিলে দেখা যায় যে পুরুষদের ক্যানসার বেশী হয়। তবে কিছু কিছু জায়গা, স্ত্রী অঙ্গ বাদ দিয়েও আছে, যেমন থাইরয়েড কি পিত্তকোষে ক্যানসার মেয়েদের বেশী হয়। মেয়েদের স্তনের ক্যানসারে মৃত্যুর হার সব চেয়ে বেশী।

সামাজিক ভেদ ঃ থাকার কথা নয়। তবু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সেহেতু বিশেষ মানুষকে বিশেষ পেশায় যেতে হয়, সেই অনুযায়ী বিশেষ অঙ্গে ক্যানসারও বেশী হয়।

বিশেষ বিশেষ জায়গার টিউমার

চামড়ার ক্যানসার ঃ সূর্যের একটি নিক রশ্মি দিনের পর দিন চামড়ায় লেগে ক্যানসার হতে পারে। উত্তাপেও তাই হতে পারে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, কাঁকড়ি ক্যানসার। কাঠকয়লার আগুন আছে, এরকম মাটির হাঁড়ি, শীতের হাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্য কাশ্মীরের লোকে, পেটের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে বেড়ায়। তাদেরই এই ক্যানসার হতে দেখা যায়। আঁকাবাঁকা অর্থাৎ ভেরিকোজ শিরাজাত যা বহুদিন থাকতে থাকতে সেখানের চামড়ায় ক্যানসার হতে দেখা যায়।

পুরুষ লিঙ্গমুণ্ডের ক্যানসার ঃ দেখা গেছে, মুসলমান কি ইহুদিদের লিঙ্গমুণ্ডের ক্যানগার প্রায় হয় না। ত্বকচ্ছেদই এর কারণ। লিঙ্গমুণ্ডের স্নেহসারজাতীয় ক্ষরণ ক্যানসার উৎপাদক বস্তু বলে জানা গেছে।

ওষ্ঠাধরের ক্যানসার ঃ পাইপের ধূমপানে অভ্যস্ত যারা, তাদেরই এ ক্যানসার হতে দেখা যায়। পাইপের উত্তাপই এর কারণ, তাম্রকুট বা অন্য

কিছু এর সম্পর্কিত নয়। তবে রৌদ্রের এতে উত্তেজক হিসাবে কাজ থাকতে পারে।

মুখের ক্যানসার : যারা পান সুপারি চর্বনে অভ্যস্ত, তাদের এ ক্যানসার বেশী হয়। লাগছে এমন দাঁত, দেখা গেছে জিবের কি গালের ভিতরদিকে ক্যানসারের জন্য দায়ী।

অন্নবিলের ক্যানসার : কোন কোন জায়গায়, আফ্রিকার দক্ষিণাংশে এই ক্যানসার বেশী হতে দেখা যায়। মদ্যপান ও ধূমপানের সঙ্গে এ ক্যানসার সম্পর্কিত।

পাকস্থলীর ক্যানসার : এর আধিক্য জাপানে। রক্ত যাদের A গ্রুপের, তাদের এই ক্যানসার বেশী হতে দেখা যায়। পারনিসাস রক্তাল্পতা যাদের থাকে, তাদের এই ক্যানসার হতে দেখা গেছে।

বৃহদন্ত্রের ক্যানসার : এ ক্যানসার ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের বেশী হয়। এর কারণ বেশী পরিমাণ তন্তু আছে এমন খাদ্য না খাওয়া। কোলনের বা বৃহদন্ত্রের ক্ষত প্রদাহ যাদের হয়, তাদের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বেশী। তাছাড়া এর পিছনে জিন সংক্রান্ত যোগাযোগও থাকে।

ফুসফুসের ক্যানসার : ব্রিটনে, বিশেষ করে স্কটল্যাণ্ডে এ রোগের প্রাদুর্ভাব। তবে ধূমপানের সঙ্গে এ রোগ সম্পর্কিত, এ সন্দেহাতীত। নিকেল খনিতে যারা কর্মরত, তাদের এ রোগের আধিক্যের কারণ হয়ত নিকেলের খনিজাত অবস্থায়, তার সঙ্গে বিকিরণধর্মী বস্তুর উপস্থিতিই এর জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। ফুসফুসের মধ্যে কণিকাবস্তু প্রবিষ্ট (phemocoinosis) হয় যেসব পেশায়, তাদেরও ফুসফুসের ক্যানসার বেশী হয়। তবে প্রদাহসৃজন করে, এমন রোগ যেরকম টিউবারকুলোসিস, নিমোনিয়া ইত্যাদি রোগে কিন্তু ক্যানসার সম্ভাবনা মোটেই বাড়ে না।

যকৃতের ক্যানসার : যকৃতের পূর্বতন কোন রোগের সঙ্গেই ক্যানসার সম্পর্কিত নয়। তবে লিভারে ফ্লুক বলে কথিত ট্রিমাটোড ক্রিমি, পিত্ত-নালিকায় অবরোধ সৃষ্টি করে থাকে। তাদের মধ্যে যকৃতের ক্যানসার বেশী।

স্তনের ক্যানসার : আমেরিকা, ক্যানাডা ও পশ্চিম ইউরোপে এই রোগের প্রাদুর্ভাব। তারপর ক্রমশঃ পূর্ব ইউরোপ, রাশিয়া, মধ্য এশিয়ায় কমে এসে, চীন, জাপানে খুবই কম। যেমন কমই কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের

মধ্যে। সন্তান না হওয়া ও স্তন্যপান কম, বা না করাও স্তনের ক্যানসারের অন্যতম কারণ। স্তনগ্রন্থীর রূপান্তরণকে ক্যানসারের পূর্বাবস্থা বলে মনে করা যেতে পারে।

জরায়ুর ক্যানসার : এ ক্যানসার ইহুদিদের মধ্যে খুবই কম। ইহুদি পুরুষদের ত্বকচ্ছেদই এর কারণ বলে মনে হয়। জরায়ু মুখের ক্যানসার, জরায়ু শরীরে ক্যানসারের তুলনায় অনেক বেশী।

অন্য ক্যানসারে, মূত্রথলির ক্যানসার ও ধূমপানের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। থাইরয়েডে ক্যানসার ও গলগণ্ডের মধ্যেও একটা সম্পর্ক আছে। অস্থির সারকোমা ও প্যাজেট ব্যাধির মধ্যে সম্পর্ক আছে। রেডিও এ্যাক-টিভ ক্যালসিয়াম, কি স্ট্রনসিয়াম অস্থিতে জমে থেকে, পরে অস্থিতে সার-কোমার কারক হতে পারে।

ক্যানসারের সাধারণ দিক

ক্যানসারের আলোচনার শেষ নেই ; এখানে সংক্ষেপে এর কতকগুলি দিক নিয়ে আলোচনা করছি। ক্যানসার বলতে বোঝায় কোন বাধাবন্ধ নেই এমনভাবে কোষ বিভাজন হয়ে সেই টিউমার বা ক্যানসারের সীমাহীন বৃদ্ধি। মনে করা হয়, এই বৃদ্ধির উদ্দীপনাটা শুধু এপিথিলিয়াম কোষ থেকে যে আসে তা নয়। এপিথিলিয়াম ও সংযোগকারী কলার যেখানে যোগসূত্র, সেখান থেকে আসে। এটা ভ্রূণাবস্থার বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনীয়। তবে আবার এও মনে করা হয় যে, ক্যানসারের কোষের সঙ্গে ভ্রূণাবস্থার কোষের পার্থক্য আছে। ভ্রূণ কোষের সর্ববিধ সম্ভাবনাই আছে, সে জায়গায় ক্যানসার কোষের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ। তবে ক্যানসার কোষের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে।

চেহারা : অদ্ভুতদর্শন ও একটি কোষ অন্যটির থেকে ভিন্ন, এই হল বিশেষত্ব।

রাসায়নিক বৈচিত্র্য : DNA-র মধ্যে পরিমাণগত ও গুণগত পরি-বর্তন লক্ষিত হয়। ভাইরাস DNA নিউক্লিয়াসে এসে কি করে, তা আলোচিত হয়েছে। RNAও বৃদ্ধি পাওয়া কলার মত বেশী। কোন কোন অনুর্ঘটক, যেমন B গ্লুকুরনিডেজ কোন কোন ক্যানসারে বেশী।

অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ক্যানসার কোষ গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে।

কোষের প্রাচীরে ঃ প্রাচীরের চলাচল বা সচলতা বেশী দেখা যায়। প্রোটিয়েজ অনুঘটক বৃদ্ধি পায়। টিউমার-বিরোধী প্রতিবস্তুও থাকলে এখানে বেশী থাকে।

ক্যানসারের ব্যবহার ঃ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয় পড়েই ক্যানসার তার দূরবাহনের সাহায্যে এত প্রাণঘাতী ও মারাত্মক হয়ে ওঠে। কোন কোন টিউমার আছে, যেমন যকৃতের হেপাটোমাতে, একটি বিশেষ প্রোটিন, যা ভ্রূণের রক্তরসে থাকে, সেই আলফা ফিটোপ্রোটিন বৃদ্ধি পায়। ক্যানসারের বিভিন্ন কোষকে ল্যাবরেটারিতে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সব কোষ অবশ্য এভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারা যায়নি। তবে কিছু কোষ, যেমন He La কোষ দীর্ঘদিন ধরে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ল্যাবরেটারিতে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

উপসংহার

ক্যানসারের সকল কিছুই এমন গভীর রহস্যের অন্ধকারে ঘেরা ও তার ভেদ্যতা এত সুদূর পরাহত বলে মনে হয়, যে এই থেকেই মনে হয়, যে বুঝি ক্যানসার রহস্য ভেদ হলে, জীববিদ্যার সকল রহস্যের সমাধানই সহজসাধ্য হয়ে যাবে।

ক্যানসার চিকিৎসার ব্যাপারেও এখন পর্যন্ত যেন কেমন একটা নেতি-বাচকতা থেকে গেছে। হয় সে জায়গাটি ক্যানসার শুদ্ধ চেঁচে পুঁছে বাদ দিতে হবে, আর নয়ত কোষ ও কলা ধ্বংসকারী রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ করতে হবে। এদিক থেকে সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় হল নিরোধ। অথচ কি থেকে যে ক্যানসার হচ্ছে, তা এত বিচিত্র ও রহস্যময়, যে সেইজন্য কোন সত্যিকার নিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রায় অসম্ভব। তবে বিভিন্ন ক্যানসারের কথা ভেবে কিছু কিছু সাবধানতা নেয়া যেতে পারে। যেমন ফুসফুসের ক্যানসারের সাবধানতা হিসাবে ধূমপান না করা।

ক্যানসার সম্পর্কে জ্ঞান ও এ বিষয়ে জনসাধারণের সজাগ ভাবও অনেক ক্ষেত্রে ক্যানসারকে নিরোধ করতে পারে। যেমন মেয়েদের স্তন ও জরায়ু মুখের ক্যানসার, নিয়মিত পরীক্ষায় নিরোধ সম্ভব।

ক্যানসার নিরোধের জন্য নানা পরীক্ষাও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্যাপেনিকলুর কোষ তাত্ত্বিক পরীক্ষা তার মধ্যে আজ সর্বজনের জ্ঞাত হয়ে উঠেছে। তবু আজও ক্যানসার আমরা কতটুকুই বা জানতে পেরেছি এই মনে হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডের সম্ভাব্য সূচিপত্র

[1] বার বডি

[ক] ক্রোমাটিড

[2] ক্লিয়ার সেল ক্যানসার (বৃক্কক)

[3] চোখে—রেটিনোব্লাষ্টোমা

[4] কর্ডোমা

[5] এ্যাষ্ট্রোসাইটোমা

[6] এপিথিলিয়ামের পার্ল (মুক্তার মত)

[7] গ্রন্থি থেকে কি ধরনের টিউমার হয়

[8] তথাকথিত এ্যাসফ নোডিউল

[9] এ্যাডিনোমা

[10] অস্থিতে—অষ্টিওকারসিনোমা

[11] বসন্ত ভাইরাস
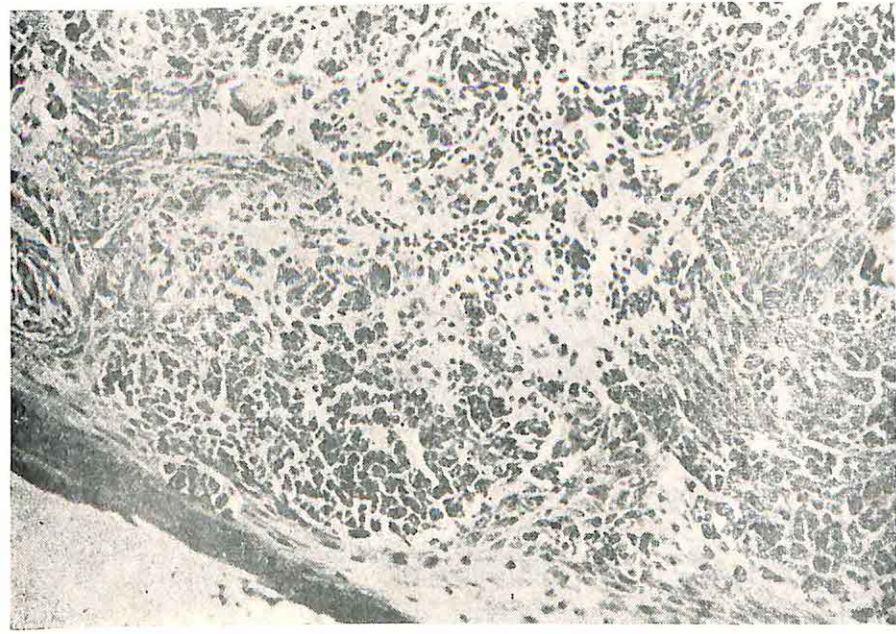
[12] মেলানোমা
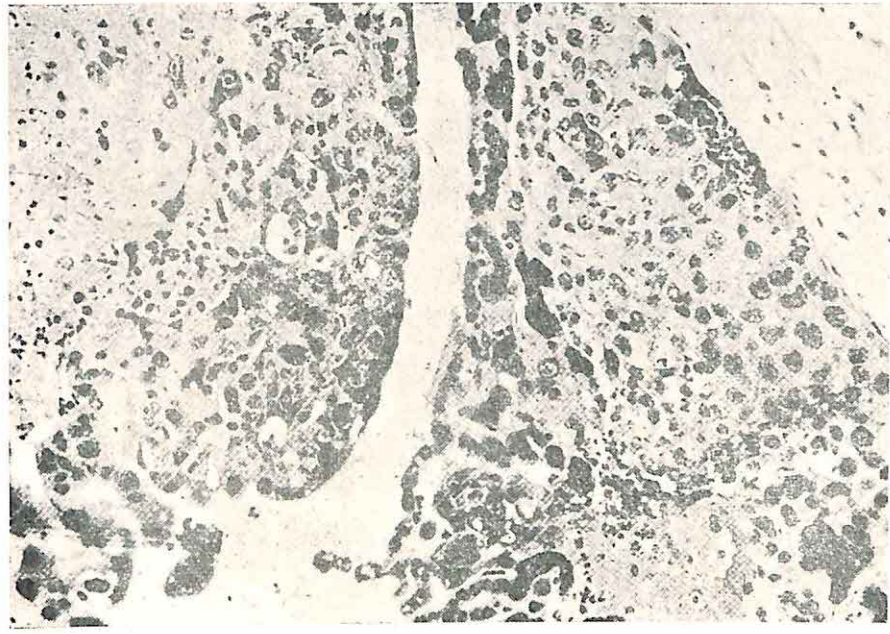
[13] কোরিও কারসিনোমা
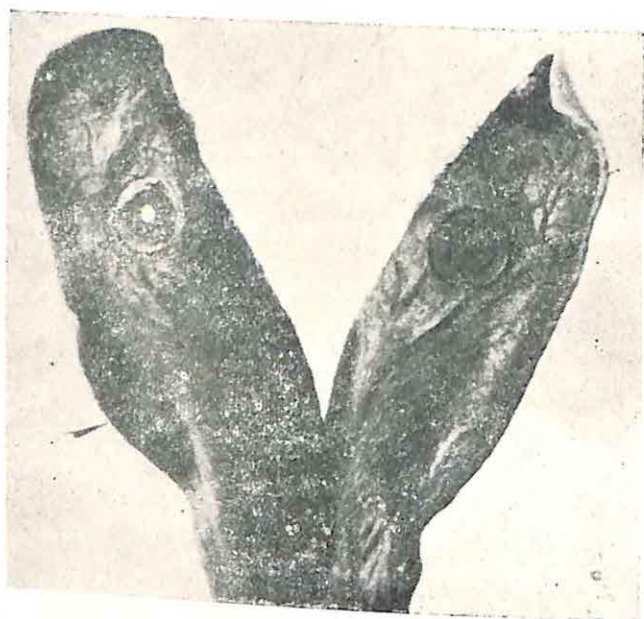
[14] খরগোসের কানে দেখার ঘর

[15] ফাইব্রোব্লাষ্টোমা

[16] স্যালভারি এ্যাডিনোমা

[17] ফাইব্রোএ্যাডিনোমা
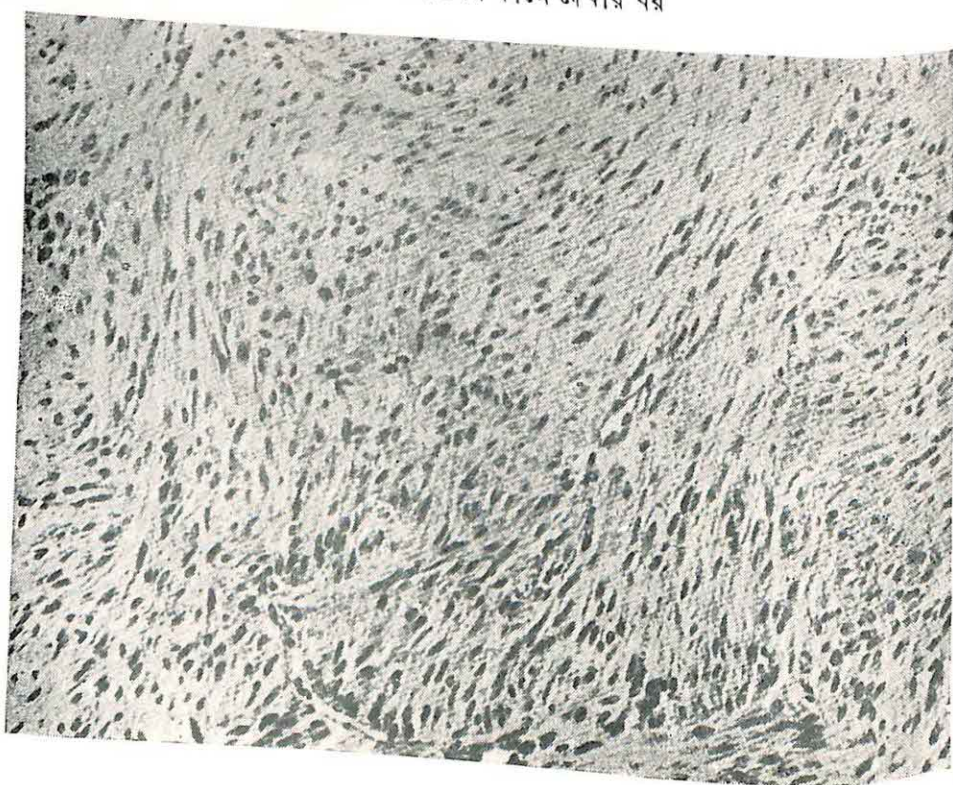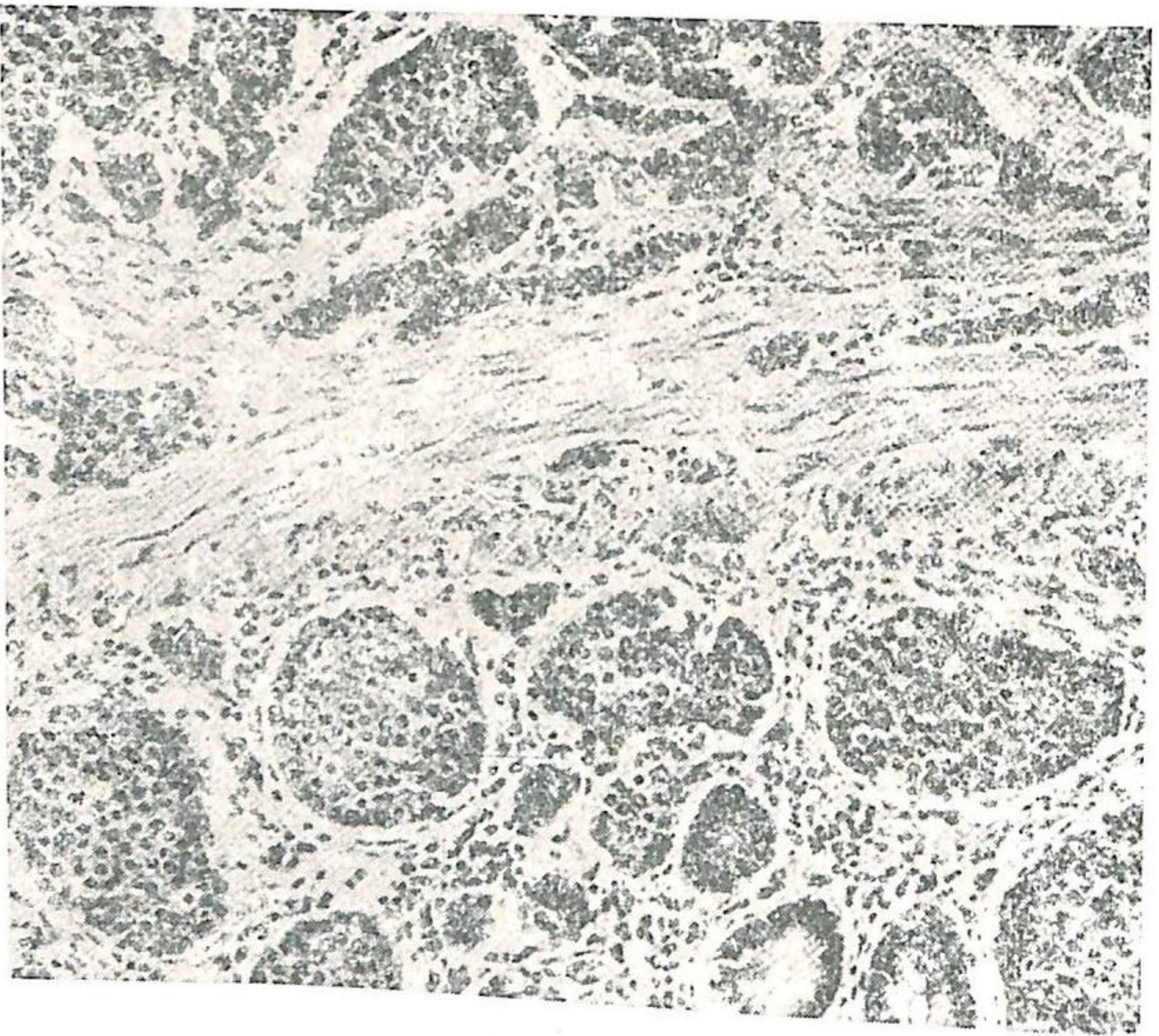
[18] বৃহদন্ত্রের কারসিয়েড
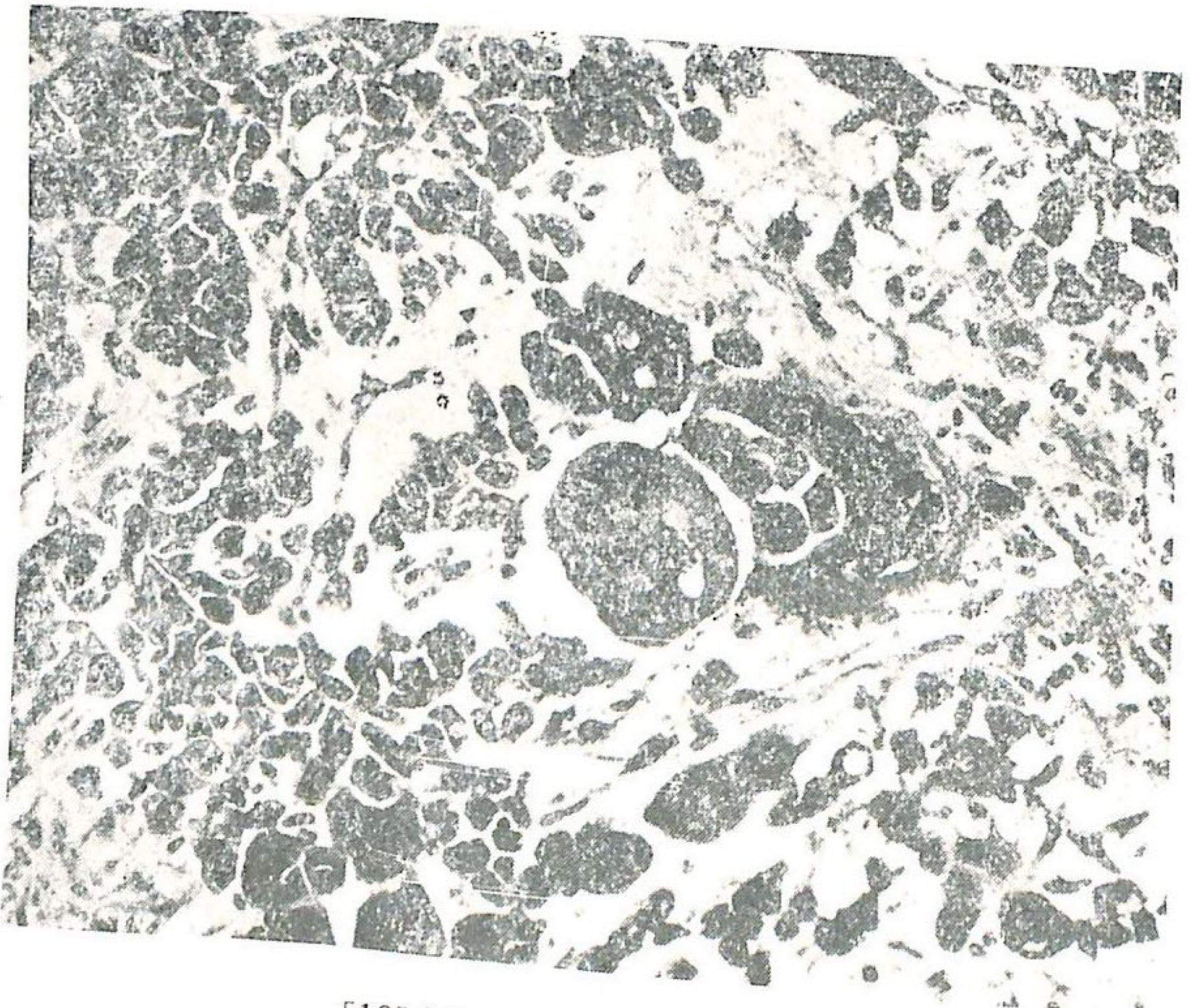
[19] টিউমারে এ্যানাপ্লাষ্টিক রূপান্তর
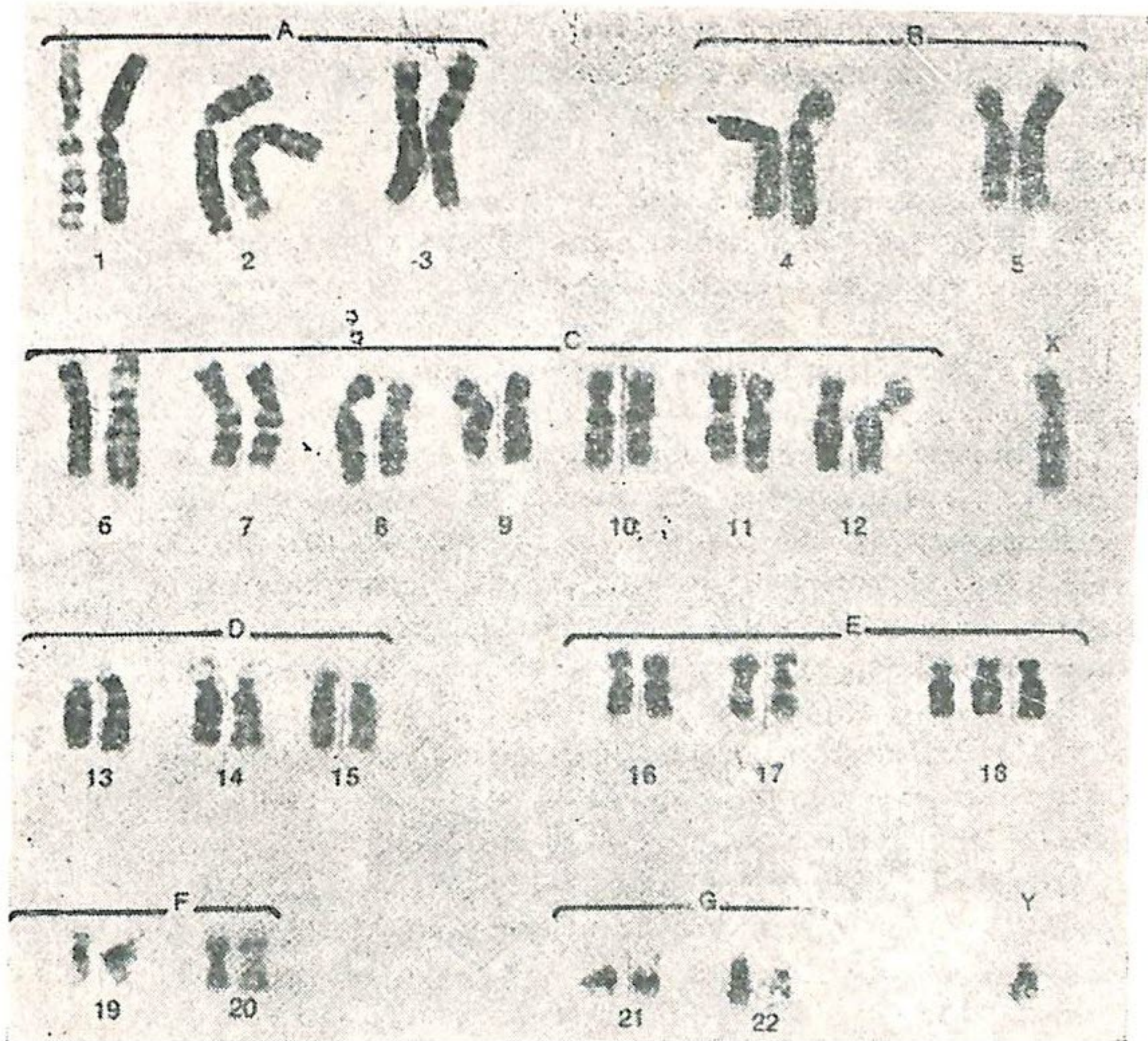
[20] ক্রোমোসোম কেরিওটাইপ 18নং তিনটি
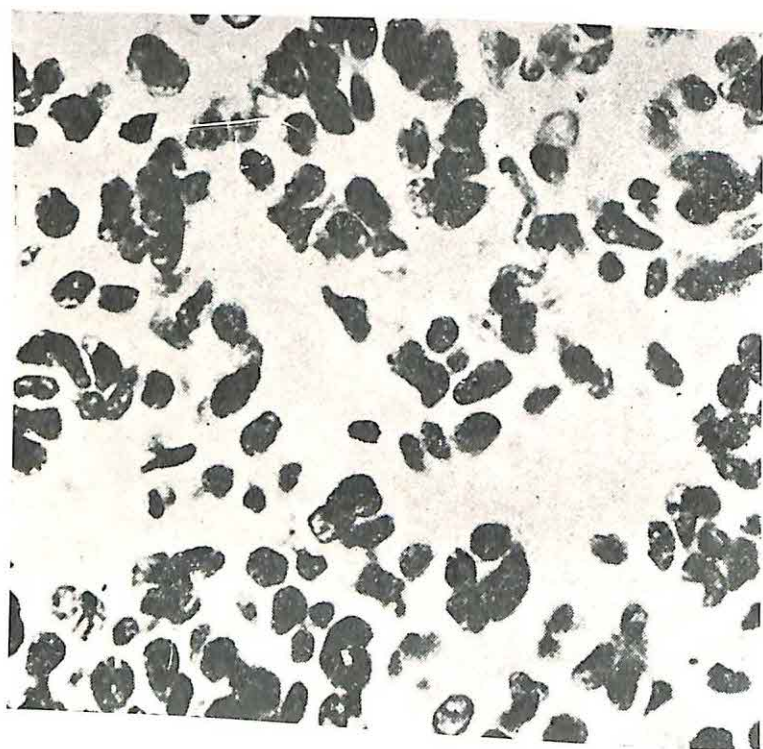
[21] ওট সেল ক্যানসার
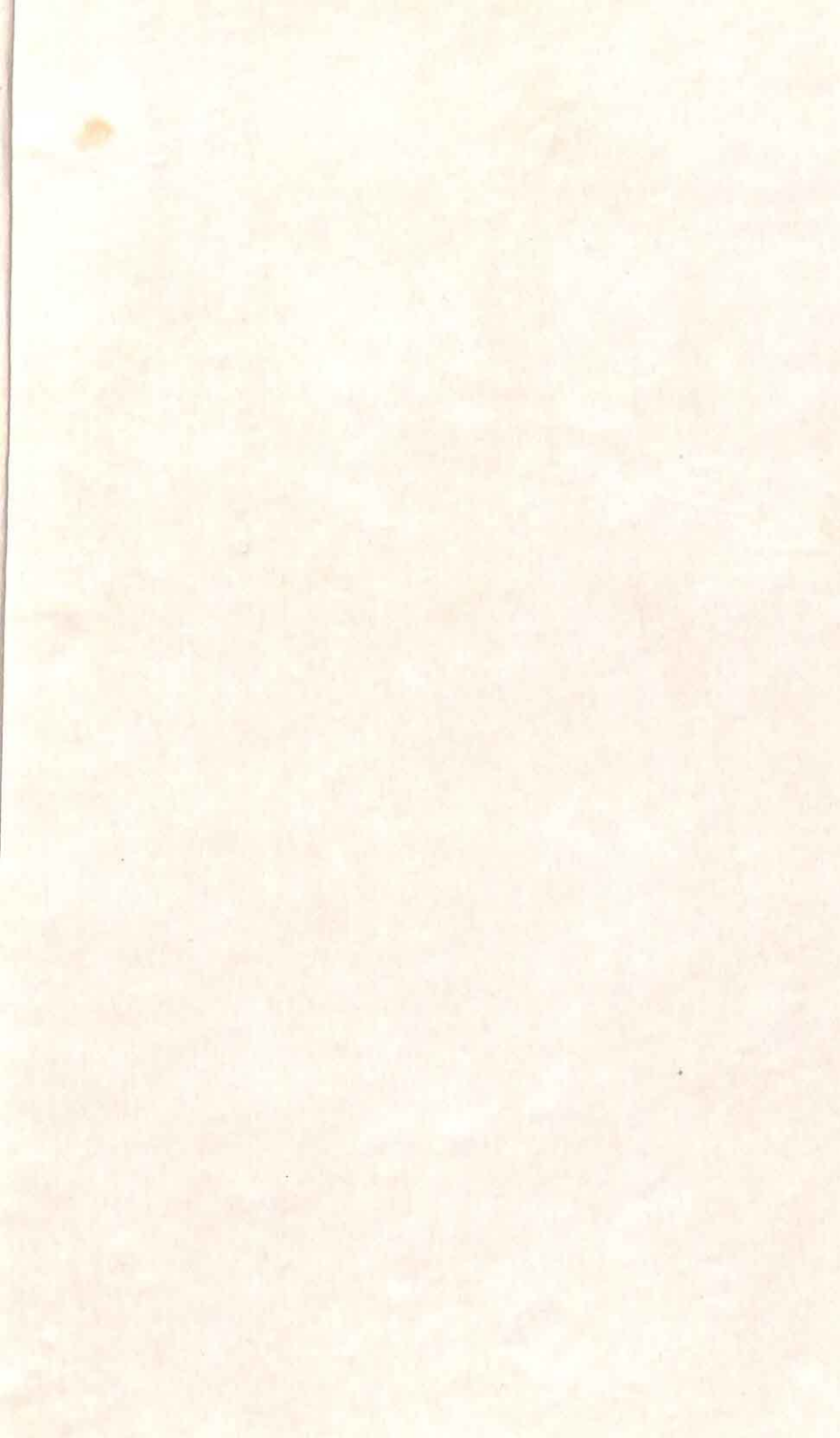
চিকিৎসা শাস্ত্রের বই বাংলা ভাষায় খুবই কম। তাছাড়া বিকারের শারীরবৃত্তির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে লেখা বই আছে কি না জানা নেই।

কোষই যেহেতু শরীরের গাঠনিক একক, তাই কোষের অনুবীক্ষণীক বুঝলে তবেই শরীরের বিকারের সম্যক ধারণা হয়।

তাই এ গ্রন্থে কোষ বিভাজনের বিকার থেকে সুরু করে, প্রদাহতত্ত্ব, ক্ষত ও তার আরোগ্য, শরীরের রোগ ক্ষমতা ও তার হ্রাস, টিউবারকুলোসিস, সিফিলিস, টিউমার, ক্যানসার ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

এ বইখানি প্রথম খণ্ড। অনুরূপ আরো এতগুলি অধ্যায়ে আর একটি খণ্ডে বইটি সম্পূর্ণ হবে।

পঁচিশ টাকা